সাহিত্য-সংস্কৃতি-সময়

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বাক্‌-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো
কলকাতা - ৯

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

প্রকাশক—স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর—শ্রীবিভূতিভূষণ রায়
বিদ্যাসাগর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৫।ই, কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শিল্পী—কানাই পাল

চার টাকা

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

সহৃদয়েষু—

কলিকাতা

২৫শে বৈশাখ ১৩৬৯

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

গোড়ার কথা

১৯৪৫ থেকে '৬০, মোটামুটি এই পনেরো বছরে সাহিত্য ও সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতি এবং সমস্যা সম্বন্ধে যে-সমস্ত প্রবন্ধ আমি নানা পত্র-পত্রিকায় লিখি, তার বেশীর ভাগই এই সংগ্রহে গ্রথিত হল। সাহিত্যের তত্ত্ব ও বস্তু সম্বন্ধে এবং সাহিত্য-ভিত্তিক সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সমষ্টি হলেও, রচনাগুলির মধ্যে যেমন চিন্তা ও মনন-ভঙ্গীতে একটা পারম্পর্য লক্ষ্য করা যাবে, তেমনি এমন কিছু-কিছু প্রসঙ্গ প্রবন্ধগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে, বাংলা ভাষার আসরে যার কথা এর আগে উপস্থাপিত হয় নি। এই শেষোক্ত দিকটির জন্যে কিছু নিজস্বতার দাবী হয়ত প্রবন্ধগুলি করতে পারে।

তবে বিভিন্ন সময়ের লেখা একত্র গ্রন্থিবদ্ধ করার প্রধান অসুবিধা যা, তার কথাটাও ভুলে গেলে চলবে না। সময়ে গতির সঙ্গে মানুষের দৃষ্টি, চিন্তা এবং ভাষায় স্বাভাবিক নিয়মেই আসে অনেক পরিবর্তন। ফলে পাশাপাশি রেখে পড়লে, বিভিন্ন সময়ের লেখার মধ্যে কখনো চোখে পড়ে পুনরুক্তির, কখনো স্ব-বিরোধিতার দৃষ্টান্ত। কখনো বা গুরুতর কালাতিক্রমণের ঘটনা মনকে পীড়িত করে। যতখানি যত্ন ও শ্রম স্বীকার করলে, এই সব ত্রুটি শুধরে দেওয়া সম্ভব, কর্মব্যস্ত জীবনে তার অবকাশ কম বলে, সহৃদয় পাঠকের মার্জনার ভরসাতেই সেগুলো যথাযথ রেখে দেওয়া হল। প্রসঙ্গত বলে রাখি, অনুরূপা দেবী সম্পর্কীয় প্রবন্ধটি যখন লেখা হয়, তখন তিনি জীবিতা ছিলেন, ছিলেন ইন্দিরা দেবীও।

১৯৪৩-৪৪ সালে আমার প্রথম সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ সংগ্রহ 'শতাব্দী ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয় এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করব, বইখানি প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বিনয়কুমার সরকার, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিত জনের প্রশংসা লাভে ধন্য হয়। তখন আমি ছিলাম তরুণ বয়স্ক, সাহিত্য-যাত্রায় অগ্রগামীদের এই সস্নেহ পৃষ্ঠপোষকতা সেদিন যে সহায়তা দিয়েছে, তার মূল্য বলে বোঝাতে পারব না। দ্বিতীয় প্রবন্ধ-পুস্তক দীর্ঘ দিন পরে আজ যখন প্রকাশিত হচ্ছে, তখন তাঁরা কেউ

পৃথিবীতে নেই এবং মজা এই যে আমি নিজেই প্রবীণের তালিকাভুক্ত হয়ে, এখন নবীন সাহিত্য-ব্রতীদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়েছি। স্বভাবতই আগের বই ও এ বইয়ে দৃষ্টি, চিন্তা ও মনন-ভঙ্গীতে প্রভূত বৈষম্য দেখতে পাওয়া যাবে, যা লেখকের মানসিক বিবর্তনের সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যেও যুগ-বিবর্তনের নির্দেশক।

আগেই বলেছি, প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকার মধ্যে নতুন জীবন, বসুধারা, শনিবারের চিঠি, সপ্তর্ষি, উত্তরসূরী, একক, সাহিত্যের খবর, আন্তর্জাতিক, বেতার জগৎ প্রভৃতির নাম মনে আসছে। আসছে যুগান্তর সাময়িকীর নাম। দু-চারটি আছে সভা-সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতার অনুলেখন, কয়েকটি আছে মূল ইংরেজ রচনার লেখক-কৃত অনুবাদ। প্রবন্ধগুলির রচনা, প্রকাশনা ও সংগ্রহ প্রসঙ্গে যাঁদের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়, তাঁদের মধ্যে নারায়ণ চৌধুরী, রথীন রায়, পারুল ঘোষ, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, অরুণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ জীবনের সকল ক্ষেত্রে জয়ী হন, আন্তরিকভাবে এই কামনা করি। বেঙ্গল পাবলিশার্সের অন্যতম সত্ত্বাধিকারী বন্ধু শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তাঁর সুযোগ্য পুত্র স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায় এবং সাহিত্যানুজ রাণা বসুর অকৃপণ সহায়তাই বইটির ত্বরিত মুদ্রণ ও পরিপাটি অঙ্গ-সজ্জার মধ্যে মূর্ত হয়েছে। তাঁদেরও আমার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই।

যুগান্তর সম্পাদকীয় বিভাগ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সূচী

সাহিত্যের আত্মা

সাধারণ ভাবে ভাষায় যা-কিছু লেখা হয়, তাকেই বলা হয় সাহিত্য। সে হিসাবে সাহিত্যও সাহিত্য, আবার ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতিও সাহিত্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সাহিত্য বলতে বোঝায় বিশেষ এক শ্রেণীর রচনাকেই, যে-কোন রকম রচনাকে নয়। তাহলে সাহিত্য ও অ-সাহিত্যের মধ্যে তফাৎ কোথায়? সাহিত্য জন্মায় মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আশ্রয় করে, তা দেয় মানুষের হৃদয়ানুভূতিকে প্রকাশের ভাষা। আর অ-সাহিত্য ব্যাখ্যা করে কোন বিষয়কে—মানুষের হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে, তার সুখ-দুঃখের সঙ্গে, যার কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ সাহিত্য হল ভাবাত্মক রচনা, আর অ-সাহিত্য হল বিষয়াত্মক রচনা। এই অনুসারে, কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প, ভাবাত্মক প্রবন্ধ নিবন্ধ, এ-সবই হল সাহিত্য। অন্য শ্রেণীর রচনা অভিহিত হয় তাদের নিজ নিজ বিষয়গত নাম অনুসারে—যথা, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ব্যাকরণ ইত্যাদি। নির্দিষ্ট অর্থে এগুলি সাহিত্য নয়, পুরোপুরি অ-সাহিত্য।

কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প, হৃদয়াবেগমূলক প্রবন্ধ···মোটামুটি এই পাঁচ শ্রেণীতে সাহিত্যকে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রাচীন কালে রস বিচারকরা এই পাঁচ শ্রেণীকেই বলতেন 'কাব্য'। অর্থাৎ যে জাতীয় রচনাবলীকে আজ আমরা 'সাহিত্য' বলি, তার সবই সেদিন কাব্য নামে অভিহিত হত। তারপর সমুদয় কাব্যের তাঁরা শ্রেণী বিভাগ করতেন—শ্রব্য কাব্য (কবিতা), দৃশ্যকাব্য (নাটক), গদ্য কাব্য (উপন্যাস), গাথা বা কথাকাব্য (গল্প ও উপকথা), চম্পূ কাব্য (গদ্য-পদ্যে মিশ্রিত কাব্য)···এই রকম বিভিন্ন নামে। এই পুরাতন শ্রেণী বিভাগের চেয়ে এখনকার শ্রেণী বিভাগে রচনার জাতি ও প্রকৃতি বোঝা সহজ হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যাবতীয় সাহিত্য পদবাচ্য রচনাকেই কাব্য আখ্যা দিয়াছিলেন প্রাচীনেরা, তার বিশেষ একটা কারণ ছিল। নাটক, উপন্যাস, গল্প ও কবিতার মধ্যে আকার এবং প্রকারে পার্থক্য যাই থাক, তাদের উদ্ভব একই জায়গা থেকে—সেটা হল লেখকের মন। আর তাদের লক্ষ্যও

একই—তা হল পাঠকের চিত্তে আবেগ সঞ্চার করা। অর্থাৎ এক হৃদয়ের অনুভূতি বহু হৃদয়ে ব্যাপ্ত করাই সাহিত্যের কাজ—সে সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, যে শ্রেণীরই রচনা হক না কেন। এই যে অনুভূতির আদান প্রদান, প্রকৃত পক্ষে এটা কাব্যের কাজ। তাই এই সমধর্মিতার দিকে নজর রেখেই সকল রকম রচনাকে তাঁরা কাব্য আখ্যা দিয়েছিলেন।

তাহলে সাহিত্যের লক্ষণ কি? আগেই বলেছি, সাহিত্য জন্মায় মানুষের বিচিত্র সুখ-দুঃখ ও আশা-নিরাশার মৃত্তিকা থেকে, এক কথায় তাঁর হৃদয়াবেগ থেকে। একজনের হৃদয় দিয়ে অনুভব করা এই সব দুঃখ-সুখ ও কামনা-কল্পনার মধ্যে তারপর বহুজন আপন মনের মিল খুঁজে পান এবং সেই ভাবেই হয় লেখকের দৃষ্টি, চিন্তা ও অনুভূতির সঙ্গে পাঠকের হৃদয়ের মিতালী। এই কাজটি কি ভাবে হয়? সংসারে অনেক আনন্দ-বেদনার ঘটনা লোকে চোখের ওপর ঘটতে দেখে। সংবাদপত্রে অনেক ভালো-মন্দ বিষয়ের বিবরণ লোকে পড়ে। কিন্তু তাতে ত কৈ একটা গল্প বা কবিতা পড়ার, কিংবা একটি নাট্যাভিনয় দেখার অনুভূতি আসে না! তাহলেই বুঝতে হবে, সাহিত্যে জীবনের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার সঙ্গেই আরো কিছু থাকে, যার গুণে পাঠকের চিত্ত আবিষ্ট হয়। সেই যে আরো কিছু, সেটা হল রস—তাই হল যে-কোন রকম সাহিত্য রচনার প্রাণ। এই রসের অনুরঞ্জনে অভিষিক্ত করে লেখক তাঁর বস্তু পরিবেষণ করেন বলেই, পাঠকও তাতে রসার্দ্র হন। যে রচনায় রসের অভাব আছে, তা কখনোই পাঠককে সার্থকরূপে আকর্ষণ করতে পারে না।

অলঙ্কার শাস্ত্রমতে রস ন-টি। আদি, করুণ, রৌদ্র, শান্ত, বীভৎস, অদ্ভুত তার মধ্যে প্রধান। যাতে হৃদয়ে প্রেমভাব জাগে, তা হল আদি রস। যাতে জাগে করুণা বা ব্যথা, তা করুণ রস। রৌদ্র রস জাগায় ক্রোধ, শান্ত রস আনে স্নিগ্ধতাপূর্ণ চিত্তপ্রসাদ, বীভৎস রস উদ্দীপ্ত করে ঘৃণা, আর অদ্ভুত রসে আসে বিস্ময়বোধ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, এক-একটি বিশেষ শ্রেণীর আবেগ সৃষ্টি করাই হল রসের কাজ। এই আবেগ আসে কোথা থেকে এবং কেমন করে? ধরা যাক একটা বেদনার ব্যাপার। লেখক দেখালেন কোন দরিদ্র বিধবার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর দৃশ্য এবং সেই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অভাগিনী মায়ের দুর্দশা চিত্রিত করলেন তাঁর গল্পে বা নাটকে। পাঠক সেই একটিমাত্র

কাহিনী আশ্রয় করে চলে এলেন এমন এক জায়গায়, যেখানে সেই একজনের দুঃখের গণ্ডী ছাড়িয়ে তাঁর চিত্তে জাগল অনুরূপ অবস্থায় পতিত শত শত জনের দুঃখের অনুভূতি। মানুষের এই অসীম দুঃখের মূল কোথায়, তাঁর চিত্ত তখন খুঁজতে লাগল তার জবাব। এই যে বিশেষ একটি ভাবকে আশ্রয় করে নির্বিশেষে একটি অনুভূতিতে পৌছানো, এরি নাম রসাবেশ। এই রস লেখকই নিহিত রাখেন তাঁর রচনায়, তাই তা এত সহজে পাঠকের চিত্তে জন্মাতে পারে। ঠিক এই ভাবেই পাঠক এক-একটি রচনা থেকে পান এক-এক রকম আবেগ—এক-একটি অনুভূতি তাঁর মধ্যে জীবন্ত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ পাঠককে প্রত্যেকটি রসই দেয় তার নিজ নিজ ধর্মানুযায়ী এক-এক রকম উপলব্ধির প্রেরণা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোন-না-কোন ভাবের ওপরই রসের স্থিতি। দয়া, মায়া, ভক্তি, প্রেম, রোষ, অভিমান, ঘৃণা এইগুলি হল মানুষের এক-একটি ভাব। সংসাবেব নানা ঘটনা, ন৷না উপলক্ষ, নানা অবস্থা, আমাদের এই ভাবগুলি জাগিয়ে তোলে। অনেক সময় একটি ভাবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আরো একটি বা দুটি ভাব। যেমন একজন অত্যাচারিত ব্যক্তিকে দেখে যখন জাগে দয়া, তখনই অত্যাচারীর ওপর জাগে ক্রোধ—যেমন একজন নিঃসঙ্গ ব্যক্তিকে কাছে পেয়ে আসে সমবেদনা, সেই সমবেদনা থেকে তারপর জন্মায় প্রেম। এই যে নানা ভাবের মিশ্রণ, এর মধ্যে একটা ভাবই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে মূল ভাব বা প্রধান ভাব, বাকীগুলো আপনা থেকেই হয়ে পড়ে গৌণ, তাদের বলে সঞ্চারী ভাব। এই মূল ও সঞ্চারী ভাবগুলি একসঙ্গে জড়িয়েই আস্তে আস্তে মনে জাগে একটা আবেশ বা আবেগ। তখন যে ঘটনা, যে ব্যাপার, অথবা যে কারণ থেকে আদিতে ভাবের জন্ম হয়েছিল, তা ছাড়িয়ে মন আরোহণ করে একটা সার্বজনীন অনুভূতির স্তরে। সেই অনুভূতিকে বলে ধ্বনি। লেখক সেই অনুভূতি পরিবেষণ করেন তাঁর রচনায়, পাঠক আহরণ করেন তা তাঁর রচনা থেকে। এই যে ভাব থেকে রসে উন্নীত হওয়া, এটা সম্ভব হয় একটি মাত্র জিনিষের প্রভাবে, যাকে বলা হয় কল্পনা। কল্পনাই করে রসের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। জড় বিষয়-বস্তুকে তা-ই করে সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত। তাই যে ভাবের ওপর কল্পনার রশ্মিপাত হয় না, অর্থাৎ যে বিষয়, ঘটনা বা অবস্থা কল্পনার সাহায্যে জন্মান্তরে উপনীত হয় না, তা হয়ে পড়ে

স্থূল বক্তব্য বা বিবরণ। যেমন সংবাদপত্রের ঘটনা। তা স্থান পায় না সাহিত্যের গণ্ডীতে।

এই যে রসাত্মকতা…এ-ই হল প্রকৃত সাহিত্যের লক্ষণ। কিন্তু সাহিত্য নামে আমরা যা-কিছু রচনা দেখি ও পড়ি, তাতেই অবশ্য এই রসাত্মকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক গল্প-উপন্যাস ও নাটক লেখা হয়, যাতে জানবার কথা, বোঝবার ও ভাববার কথা থাকে প্রচুর পরিমাণে। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম অনেক কিছুর প্রসঙ্গই আলোচিত হয়, যার মধ্যে রসের চেয়ে বস্তুর প্রাধান্য বেশী দেখা যায়, অনুভূতির চেয়ে বিচার-বিশ্লেষণই বড হয়ে ওঠে। কবিতাতেও আবেগ, অনুভূতির সঙ্গেই, অথবা তার পরিবর্তে থাকে অনেক তত্ত্ববিচার বা মত প্রচার। সেগুলিকে সাহিত্য বলা যাবে কিনা? খাঁটি খাঁটি আলঙ্কারিক মতে এগুলো বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়—মিশ্র সাহিত্য, কারণ এতে একই সঙ্গে সাহিত্য ও অ-সাহিত্যের আদর্শ এসে মিশেছে। কাজেই রসাদর্শ অনুযায়ী বিচার করলে, একমাত্র লিরিক কবিতাকেই খাঁটি সাহিত্য বলা যেতে পারে। কিন্তু সকল কালের সাহিত্যেই দেখা যায় নানা চিন্তা, তত্ত্ব, তথ্য, মত ও আদর্শের ব্যাখ্যান, নিছক রসের বেসাতী করেন নি কোন বড় লেখকই। কাজেই মিশ্র সাহিত্যকেই বলতে হবে সাহিত্য, বিশুদ্ধ সাহিত্য হয়ও কম, হলেও লাভ আছে কিনা সন্দেহের বিষয়!

এ থেকেই কথা ওঠে, সাহিত্যের প্রয়োজন কি? যাঁরা বিশুদ্ধ সাহিত্যের সমর্থক, তাঁরা বলেন, সাহিত্য মানুষকে দেয় বাস্তব ছাড়িয়ে রসলোকে উন্নীত হওয়ার প্রেরণা। সংসারে দুঃখ-ব্যথা, গ্লানি, পাপ-তাপ, অনেক কিছু আছে, জীবনকে তা পদে পদে আঘাত করছে। তা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ কিছুক্ষণের জন্যেও নির্মল ভাবে আনন্দ পাবে, এ জন্যেই সাহিত্য। সুতরাং বিশুদ্ধ শিল্প-সৃষ্টিই হল সাহিত্যের আদর্শ—তা-ই মানুষকে দেয় ভাবের ঐশ্বর্য, বড় হয়ে ওঠার প্রেরণা। এই যে মতবাদ, এরই নাম idealism বা আদর্শবাদ। বাস্তববাদীরা বলেন, জীবনকে এড়িয়ে কল্পিত রসলোকে উধাও হওয়া বাস্তবকে ফাঁকি দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। এই জীবনকে আশ্রয় করেই সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে—এর ভালো-মন্দ, সব দিক উদ্‌ঘাটিত করে দেখাতে হবে…তবেই জীবনকে বড় করে, সুন্দর করে গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা আসবে। সৃষ্টিতে শুধু পঙ্কজই সত্য নয়, পাঁকও সত্য এবং বহু জীবন পাঁকে হাবুডুবু খাচ্ছে,

তাদের উদ্ধার করে, সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে স্থাপিত করার প্রেরণা দেবেন সাহিত্যিক, এই হল এঁদের মত। কাজেই সাহিত্যে কি স্থান পাবে, আর কি পাবে না, সে কথা ওঠে না। দু-দলে মতদ্বৈধ যাই থাক, জীবনের জন্যেই যে সাহিত্য, এ কথা দু-দলই স্বীকার করেন। শিল্পের জন্যেই শিল্প, এ কথা আজ আর বলেন না কেউ।

কেউ কেউ বলেন, প্রকৃত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যা, তা কোন বিশেষ কালের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়—মানুষের সামাজিক অবস্থার, তার রাজনীতি ও চিন্তা-চর্চার ধারা যুগে যুগে যতই বদলাক, তার আবেগ, অনুভূতি ও আনন্দ-বেদনার স্বরূপ চিরদিনই এক। যেহেতু সাহিত্য জন্মায় মানুষের এই মনোধর্ম অবলম্বন করে, সেই হেতু তার কোন সেকাল একাল নেই, তার আবেদন চিরন্তন। বিশ্বের বিখ্যাত ক্লাসিক্স ও প্রাচীন কালের কাব্য-নাটকাদি তার প্রমাণ। অনেকে এ কথার প্রতিবাদ করেন, তাঁরা বলেন মানুষের মন বাস্তব অবস্থার ওপর নির্ভরশীল—বাস্তব সংস্থিতি যতই পরিবর্তিত হয়, ততই মনের ধারাও বদলাতে থাকে, সেই অনুসারে তার আবেগ অনুরাগও বদলাতে থাকে। বর্তমান সমাজব্যবস্থা যদি আমূল পালটে যায়, তাহলে এর আবহাওয়ায় জন্মেছে যে-সব সংস্কার ও অনুভূতি, তা অর্থহীন হয়ে যাবে। তার ওপর প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যও সেদিন মিথ্যা হয়ে যাবে। কাজেই সাহিত্যে চিরন্তন বলে কোন জিনিষ নেই। সব সাহিত্যই—তার বিষয় যা-ই হক না কেন—জন্মায় সমসাময়িক কালের ঐতিহ্য ও জীবনাদর্শ আশ্রয় করে। সেকাল অতীত হলে, তার রং তাই আপনা থেকেই ম্লান হয়ে যায়। তবু যে মানুষ অতীত সাহিত্যকে এতটা মর্যাদা দেয়, তার একটা কারণ অভ্যস্ত পক্ষপাত, আর একট কারণ, সেই সব সাহিত্যের শিল্প-কৌশল, যা প্রয়োজন-অপ্রয়োজন নিরপেক্ষ ভাবে মানুষকে অভিভূত করে। বাস্তববাদী অর্থাৎ প্রয়োজন-বাদীরা এই কলা-কৌশলের কোন মূল্য স্বীকার করেন না।

সংক্ষেপে এইটুকু বলা যেতে পারে যে রস হল সাহিত্যের প্রাণ, আর ভাষা ও বিন্যাস-রীতি হল তার দেহ। এ দুইয়ের সুসঙ্গত মিশ্রণেই হয় উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি। অনেক লেখক থাকেন, যাঁরা সাহিত্যে প্রাণ-বস্তুটির ওপর দেন সমধিক মনোযোগ, আঙ্গিকটাকে করেন উপেক্ষা। আবার এমন লেখক অনেক আছেন, যাঁরা শাব্দিক ও আলঙ্কারিক কারুকার্যের ওপর দেন

অত্যধিক নজর এবং রসসৃষ্টির কাজটা অনিবার্য কারণেই ফাঁকে পড়ে। এ দুই জাতের মধ্যে প্রথম জাতের রচনা তার বস্তুগৌরবে সম্মানিত হলেও, জনপ্রিয় কম হয়। পক্ষান্তরে অন্তঃসারশূন্য হলেও, দ্বিতীয় জাতের রচনা তার দৈহিক কারুকর্মের জৌলুষে সমসাময়িক কালে যথেষ্ট করতালি পায়, যদিও কালের বিচারে তা স্থায়ী হয় না। সেই রচনাই দীর্ঘজীবী হয়, যাতে দেহ ও আত্মা দুইয়ের সুষ্ঠু সমাবেশ হয়। প্রাচীন ও আধুনিক সকল কালের বিখ্যাত এবং অবিস্মরণীয় রচনা যা, তাতেই বিশেষ এই গুণটির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

বিশ্বসাহিত্যের পটভূমি

॥ ১ ॥

একালীন সাহিত্য-স্রষ্টাদের কারো কারো সুপণ্ডিত বলে খ্যাতি আছে। লক্ষ্য করে দেখেছি, তাঁদের অনেকেরই পড়াশোনা সমসাময়িক কালের কথা-সাহিত্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ এবং তার মাধ্যম ইংরেজী অনুবাদ। অর্থাৎ প্রধানত ইংরেজী এবং ইংরেজীর মারফৎ ফরাসী ইটালীয়ান জার্মাণ চেক নরওয়েজীয় ও রুশ গল্প-উপন্যাস এবং নাটকই তাঁদের প্রধান সম্বল। অনুবাদের আশ্রয়ে কবিতার জ্ঞান খুব স্পষ্ট হয় না। তাই ওদিকটা তাঁদের ঝাপ্সা। আর দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস রাজনীতি অর্থনীতি সমাজতত্ত্ব, এ-সব তাঁরা পরীক্ষা পাশের জন্যে যতটুকু দরকার, শুধু ততটুকুই অনুশীলন করেছেন।

বলা দরকার যে নাটক উপন্যাস ও গল্প পড়াকে আমি পড়া হিসাবে অকুলীন এবং সেই কারণেই নাক-সিঁটকানোর যোগ্য বলে অভিহিত করছি না। আর ইংরেজী অনুবাদ সম্বন্ধেও আমার কোন শুচিবায় নেই। কারণ অনেকের মতো আমারও ইংরেজীর ওপরই একমাত্র ভরসা। আমি বলছি, প্রকৃত পাণ্ডিত্যের কথা এবং সেটা একটু স্বতন্ত্র ধরণের জিনিষ। সে জায়গায় আধুনিক বাঙালীর কৃতিত্বের অংশটা খুব লক্ষণীয় নয়। অন্তত বিগত শতাব্দীর ইতিবৃত্ত আমার মতে উজ্জ্বলতর ছিল।

ধরা যাক সাধারণ শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে অধ্যাপক উকিল উঁচু-চাকুরে ডাক্তার সাংবাদিক প্রভৃতির কথা। এঁদের ভেতর বেদ উপনিষদ তন্ত্র ষড়দর্শন রামায়ণ মহাভারত ভাগবত ও পুরাণাদির জ্ঞান কি সচরাচর দেখতে পাওয়া যাবে? মনু পরাশর কৌটিল্য বাৎসায়ন ভরত পাণিনি প্রভৃতির সঙ্গে হক, আর ভাস কালিদাস ভবভূতি শূদ্রক শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের সঙ্গে হক, এদের কি চলনসই রকম পরিচয়ও সব সময় দেখতে পাব? বৌদ্ধ জৈন ও মানবত বা লোকায়ত দর্শনের কথা, সন্ত-সাধকদের রচনার কথা এবং লোক-সংস্কৃতির কথা আর না হয় না-ই তুললাম।

বলা বাহুল্য, এসবই ইংরেজী অনুবাদে সুলভ্য। এমন কি, বেশীর ভাগের মোটামুটি বাংলা অনুবাদও পাওয়া যায়। এই জিনিষগুলি যে অনুধাবন ও

অনুশীলনের যোগ্য এবং এ-সবের জ্ঞান ভিন্ন যে একজন ভারতবাসী সত্যিকার শিক্ষিত ব্যক্তি বলে গণ্য হতে পারেন না, এ কথাটাই আমাদের চেতনার মধ্যে নেই। আর সেটাই হয়েছে আমাদের সত্যিকার দুর্ভাগ্য।

অবশ্য এ দুর্ভাগ্য শুধু আমাদের নয়। ইউরোপের অবস্থাও একই। 'ইউরোপীয়ত্বের ভিত্তি' নামক প্রবন্ধে রাসেল বলেছেন, হোমারের মহাকাব্য দুটি পড়েন নি, এস্কিলাস সফোক্লিস ইউরিপিডিস ও এরিষ্টোফেনিসের নাটকগুলি পড়েন নি, প্লেটো এরিষ্টটলের বার্তা জানেন না, এমন লোক আজ আগের চেয়ে ঢের বেশী বেড়েছে। ভার্জিল ওভিড জুভেনাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, প্লিনি, লিভি, ট্যাসিটাস ও সিসেরোর সঙ্গে বিন্দুমাত্র মোলাকাৎ হয় নি, এমন লোকও কিলবিল করছেন চতুর্দিকে। গ্রীকো-রোমক সংস্কৃতির মতো বাইবেল ও খৃষ্টীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধেও এঁরা সমান অনবহিত। দান্তে সেক্সপীয়ার বেকন র‍্যাব্‌লে মিল্টন মলেয়ারকে না চেনাটাও যেন ক্রমেই যুগ-লক্ষণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ডারউইন হার্বার্ট স্পেন্সার কাণ্ট হেগেল মার্কস, এঁদের কথা আর না-ই বললাম।

আসলে এগুলো যে শিক্ষণীয়, এ বোধই হারিয়েছেন ইউরোপের মানুষরাও। তাঁরা দেখছেন, বিমানবিদ্যা, খনি বিজ্ঞান, উচ্চ গণিত, কূটনীতি, এ সবে জ্ঞান লাভ করলেই পদ ও অর্থ মেলে এবং পদ ও অর্থই যখন সব, তখন পুরানো মতে যাকে পদার্থ বলে, তার আর দরকার কি? অর্থাৎ একালীন জীবন-দর্শনের বহির্মুখী বস্তুসর্বস্বতার বিপাকেই পুরানো বিদ্যার দরজায় তালা পড়েছে এবং তা হয়েছে নিন্দা ও উপহাসের বস্তু। একেবারে আজকের সঙ্গে যা সংশ্লিষ্ট এবং যা জৈব অস্তিত্বের পক্ষে লাভজনক, একমাত্র তাকেই আজ মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে।

তাই চলতি বাজারের বিজ্ঞান ও রাজনীতি বিষয়ক হাল্কা বই-পুঁথি এবং নভেল নাটক গল্প ভ্রমণ কাহিনী, এ-সবই চলেছে সারা দুনিয়ায় সাহিত্য নামে। ভাষার ভাণ্ডারে এর বাইরে যা রইল, তা বহুজনের মতে মাষ্টার-পণ্ডিতের অনুশীলনের বস্তু। সেই কারণেই সত্যিকার আধুনিক ও সংস্কৃতিমানের পক্ষে তা ছোঁয়াও অপরাধ স্বরূপ! মনের গঠনটা এই রকম একপেশে হয়েছে বলে, সব দেশেই আজ নিরর্থ বাকসর্বস্বতা ও অধিকতর নিরর্থ ভঙ্গিপ্রাধান্য পাণ্ডিত্যের জায়গা দখল করে নিচ্ছে।

॥ ২ ॥

সরস্বতীকে এই পঙ্ক থেকে উদ্ধার করতে হলে, প্রচলিত শিক্ষার কাঠামোটাই ফের নূতন করে ঢেলে সাজাতে হবে। এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের, এক জাতি ও ধর্মের সঙ্গে আর এক জাতি ও ধর্মের আত্মিক সম্বন্ধটি খুঁজে বের করার জন্যে গোটা মানব-সংস্কৃতিকেই যাতে আলোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখা যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। তা করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় তুলনামূলক সাহিত্যানুশীলনের ভিতর দিয়ে একটি সর্বমানবিক বোধে পৌছানো। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতিতে যুগ-পর্যায়ে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য সঞ্চিত হয়েছে, তার দ্রুত তালিকা এই রচনার গোড়াতেই দেওয়া হয়েছে। এখন এই দুটি ধারার মধ্যে সমন্বয় কি ভাবে করা যেতে পারে, কোন কোন বিভাগকে কি-কি ধারায় তুলনার আলোয় তুলে ধরতে হবে, সেটাই বিচার্য।

ধরুন গ্রীক মহাকাব্য দুটির সঙ্গে আমাদের রামায়ণ মহাভারতের এবং গ্রীক নাট্য সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের তুলনায় সমালোচনা করে দেখা যেতে পারে। ল্যাটিন গদ্যলেখকদের সঙ্গে দণ্ডী ও বাণভট্টের গদ্য রচনার তুলনা করা যেতে পারে। খৃষ্টান মরমিয়াদের রচনার সঙ্গে সুফী, আলোয়ার ও বৈষ্ণবদের তুলনা হতে পারে। ভারতীয় স্মৃতি ও নীতিশাস্ত্রগুলির সঙ্গে চৈনিক আরব্য ও খৃষ্টীয় নীতিশাস্ত্রের তুলনা হতে পারে। হতে পারে ইউরোপের ত্রুবাদুর সঙ্গীত ও মধ্যযুগীয় ব্যালাড সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের মঙ্গলকাব্য ও লোক-গাথার তুলনা। ভলটেয়ার গ্যেটে টলষ্টয়ের সঙ্গে মাইকেল বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক রচনার তুলনা হতে পারে। এই ভাবে হতে পারে আরো অনেক কিছুর সঙ্গে অনেক কিছুর তুলনায় আলোচনা।

কিন্তু এজন্যে চাই দুটি জিনিষ। প্রথমত চাই সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা। দ্বিতীয়ত চাই বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে একটা ধারাবাহিক জ্ঞান। পৃথিবীর কোন কোন দেশ সর্বাগ্রে সভ্যতার আলো পেয়েছিল, তখন তাঁদের সমাজ কেমন ছিল, কোন ধর্ম অনুসরণ করতেন তাঁরা, সে সময় তাঁদের মনন চিন্তনের বৈশিষ্ট্য কি রকম ছিল, এর পরের ধাপে কোন কোন দেশ উঠল, সভ্যতার ধারাকে তাঁরা কোন পথে প্রসারিত করলেন, তা

জানতে হবে ভালো করে। তবেই দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে আদান-প্রদানের সূত্র ধরে মানুষের সভ্যতা কত জটিল হয়েছে, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মননশীলতায় কত রকম রূপান্তর হয়েছে, তার নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যাবে।

দর্শন ধর্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র লোক-গাথা কাব্য নাটক কথাসাহিত্য, এক কথায় সব কিছু নিয়ে যে সাহিত্য বস্তু, তারই মধ্যে মানব সভ্যতার এই প্রবহমান মানসিকতাটি নিহিত আছে। আদিযুগ থেকে মধ্যযুগে এবং সেখান থেকে আধুনিক যুগে মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের আর কোন বাস্তব সাক্ষী নেই। কিন্তু এই বিশাল বিশ্বসাহিত্যের কতটা একটা মানুষ এক জীবনে পড়ে শেষ করতে পারেন? বলা নিষ্প্রয়োজন যে লক্ষ ভাগের এক ভাগও না। কাজেই জগৎ জীবন মানুষ ও মানব সভ্যতার সমগ্র পরিচয় চেষ্টা করলেও লাভ করা যায় না। তবু উপায় আছে এবং সেই সংক্ষিপ্ত ও সুলভ্য উপায়ের সাহায্যেই তুলনামূলক বিশ্বসাহিত্যের চর্চা করতে হবে। কি সেই উপায় বলছি।

হিন্দু বৌদ্ধ পারসী চীনা খৃষ্টান ইহুদী মুসলীম, সকল ধর্মের প্রামাণ্য শাস্ত্র-গ্রন্থই সুলভে ও সংক্ষিপ্ত অনুবাদে সহজপ্রাপ্য।

পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন মহাকাব্য, পুরাণ নাটক ও কাব্যকাহিনীর আংশিক মূলানুসরণসহ সহজ পুনর্লিখন প্রাপ্তব্য।

দুনিয়ার বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক দার্শনিক ও ইতিহাসকারদের জীবন এবং কর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি তথ্যসমৃদ্ধ বই অনেক আছে। প্রত্যেকের বিখ্যাত রচনাও চেষ্টা করলে অনুবাদে পাওয়া যায় বেশীর ভাগই।

এই তিন উপায়েই বিশ্ব ও বিশ্বসংস্কৃতি সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য লাভ করতে হবে। চিরকালই মানুষকে তাই করতে হয়েছে। আসলে পাণ্ডিত্য জিনিষটারই আবাদ কমেছে এবং তার ফলে উত্তরোত্তর এ সম্বন্ধে একটা অশ্রদ্ধাকে কতকটা ইচ্ছা করেই যেন আবহাওয়ায় ব্যাপ্ত করা হচ্ছে। এর প্রতিকার হতে পারে, 'সার্বভৌম গ্রন্থমালা' নাম দিয়ে কেউ যদি এক শত বইয়ে বিশ্বসাহিত্য পরিবেষণের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ রকম উদ্যোগী প্রকাশক সজ্জনকে আমি বিনা দক্ষিণায় সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু সম্ভবত একমাত্র আমি নিজেই এ রকম উদ্যোগী প্রকাশক হতে পারতাম, যদি সম্বল থাকত। যাঁরা তুলনামূলক বিশ্বসাহিত্য পড়াচ্ছেন, তাঁরা কি মনে করেন এ সম্বন্ধে?

তুলনায় সাহিত্য-বিচার

॥ ১ ॥

ভারতবর্ষে সবসুদ্ধ বারো-তেরোটি ভাষা, আর প্রত্যেক ভাষাতেই রচিত হয়েছে প্রচুর কবিতা গান, গল্প, উপন্যাস ও গদ্য নিবন্ধ। কিন্তু এক ভাষাভাষী মানুষরা অন্য ভাষার সাহিত্য সম্পদের খবর অল্পই রাখেন। বলা যেতে পারে, ভারতবর্ষের জাতি-গোষ্ঠীরা একে অন্যের অন্তরঙ্গ পরিচয় এই জন্যেই সংগ্রহ করতে পারেন না।

এই দুরবস্থা হত না, যদি সমস্ত শিক্ষিত মানুষ বোঝেন, এমন একটি ভাষায় এই সব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি অনূদিত হত। দুশো বৎসরব্যাপী ইংরেজ শাসনে ইংরেজীই হয়েছে ভারতের সেই সাধারণ ভাষা, তাই ইংরেজী অনুবাদের কথাই আমার মনে হচ্ছে। দুঃখের বিষয় ইংরেজ শাসকরা এ কাজের প্রয়োজন কোনদিন অনুভব করেননি। আমরা ভারতবাসীরা কেউ কেউ করলেও, তার জন্যে যে ব্যয় ও শ্রম প্রয়োজন ছিল, তা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না।

আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে। এ কাজ করার সুযোগও এসেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজী হঠিয়ে তার জায়গায় হিন্দীকে কায়েম করার জন্যেই কর্তৃপক্ষকে বিশেষ সচেষ্ট দেখা যাচ্ছে। হিন্দী যাঁদের মাতৃভাষা, তাঁরাই শাসন কর্তৃত্বে সর্বাধিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তাই সমগ্র ভাবে দেশ কল্যাণ অপেক্ষা আত্মকল্যাণের বুদ্ধিটাই তাঁদের প্রবল হয়েছে। এর ফলে পারস্পরিক অপরিচয় আমাদের অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। বরং বেড়েছে তিক্ততার পরিমাণ। ইংরেজীর সত্যিই কোন প্রয়োজন আছে কি না এবং হিন্দী কোনদিন তার স্থান নেওয়ার যোগ্য হবে কিনা, সে বিচার এখানে অনাবশ্যক। তবে সাহিত্য ও সমাজ-কল্যাণের দিক থেকে সর্বভারতের মন জানাজানির যে প্রয়োজন আছে, আর সে প্রয়োজন যে ইংরেজী অনুবাদেই বেশী সিদ্ধ হবে, এটা স্বীকার না করে উপায় নেই। কেন সেই কথাই বলছি।

মানুষের অবস্থা ও আবেষ্টনীর পার্থক্য থেকে জন্মায় তার রুচি ও চিন্তার, আদর্শ ও সংস্কারের পার্থক্য। এ কথা যেমন ঠিক, তেমনি এ কথাও ঠিক যে

দেশ-কালাতীত একটি সর্বমানবিক একাত্মবোধও আছে প্রতি মানুষের মনে। সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় তার এই দুটো রূপই। এক হিসাবে প্রত্যেক সাহিত্য তাই জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব, আর এক হিসাবে সার্বভৌম মনুষ্যত্বেরও প্রতিবিম্ব। এর প্রথম দিকটা উদ্বুদ্ধ করে দেশের মানুষকে, দ্বিতীয় দিকটা যুক্ত করে এক দেশের মানুষকে সব দেশের মানুষের সঙ্গে।

এর ফলেই কালিদাসের শকুন্তলা পড়ে উচ্ছ্বসিত হন গ্যেটে। উপনিষদ পড়ে সান্ত্বনা খুঁজে পান সোপেনহাউয়ার। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়ে ফিট-জেরাল্ড পান নতুন রসের সন্ধান। হোমার ভার্জিল ও মিল্টন পড়ে অনুপ্রাণিত হন মাইকেল মধুসূদন। মলেয়ার ও শেরিডন পড়ে সমাজ সমস্যার ব্যাঙ্গাত্মক রূপায়নে ব্রতী হন দীনবন্ধু। স্কট থেকে বঙ্কিম খুঁজে পান পৌরুষ-প্রদীপ্ত জাতীয় জীবনের আদর্শ। সেক্সপীয়রের নাট্যপ্রতিভা প্রভাবিত করে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালকে। শেলী ওয়ার্ডসওয়ার্থ কীটস নাড়া দেন রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনাকে।

এই ভাবেই এক দেশ ও জাতির মানস-কল্পনা ও ভাব-দৃষ্টি অনুপ্রবিষ্ট হয় অন্যদেশ ও জাতির মনে এবং তা সৃষ্টির মধ্যে রূপায়িত হয়। বিশ্বসাহিত্যের শ্রীক্ষেত্রে উপনীত হয়ে, দেশ-কালাতীত মনুষ্যত্বের এই পরিচিতি সংগ্রহ করতে পারার প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন জাতীয়তার দিক থেকেও, আন্তর্জাতিকতার দিক থেকেও। কিন্তু এ পথে লক্ষ্য করার মতো কাজ কমই হয়েছে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে। তার কারণ যাই হক, বিষয়টা সৌভাগ্য-জনক নয়।

॥ ২ ॥

সম্প্রতি আমাদের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাবে সাহিত্য পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। বলা বাহুল্য সংবাদটি আশাপ্রদ। হয়ত যে পাঠ্যতালিকা প্রণীত হয়েছে এজন্যে এবং যে ধারায় পঠন-পাঠন চলছে, তাতে প্রত্যাশিত কাজ বেশী হবে না। বিশ্বসংস্কৃতির অবারিত আকাশে আমাদের দৃষ্টিও বেশী দূর প্রসারিত হবে না। তবু উদ্যমটি স্বাগত করার যোগ্য।

আমি মনে করি, প্রাচীন গ্রীকো-রোমক সাহিত্য, মধ্যযুগীয় ইটালীয়ান, ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্য, বাইবেল এবং খ্রীষ্টীয় গির্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বই-

কেতাব মোটামুটি পড়া না থাকলে, আধুনিক ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, রুশ ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান সাহিত্যের পূর্ণ পরিচয় লাভ কোন ইউরোপীয়ানের পক্ষেও সম্ভব নয়। দান্তে, সেক্সপীয়ার, সারভান্তিস, র‍্যাবলে হন, মিল্টন, মলেয়ার, রাসিন হন, আর গ্যেটে, সিলার, শেলী, বাইরন, ভ্যালেরী, ভার্লেন, বদলেয়ার হন, কেউই ত সর্ব-ইউরোপীয় মননশীলতা থেকে বিছিন্ন নন। কিন্তু তাঁদের অধ্যয়ন কতটুকু হয়, এই রকম ব্যাপক পটভূমি সামনে রেখে?

ঠিক এই ভাবেই আমি মনে করি, বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র, ষড়দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবির সঙ্গে এবং বৌদ্ধ, জৈন ও বৈষ্ণব-বাউল, সন্ত-সহজিয়াদের সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় না থাকলে, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের সম্যক মর্ম গ্রহণও সম্ভব নয় কোন ভারতবাসীর পক্ষে। কারণ মাইকেল, বঙ্কিম, নবীন হন, ভারতী, ভেল্লেথোল, প্রেমচন্দ্র, রাধানাথ, উপেন্দ্র ভঞ্জ হন, আর গালিব, হালি, একবাল হন, কেউই সামগ্রিক ভারতীয় জীবন-চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন নন। তা নন রবীন্দ্রনাথও। অথচ এই রকম ব্যাপক পটভূমিতে রেখে সাহিত্যানুশীলন কোনদিন হয় না। তাই সবাই সাহিত্য সম্বন্ধে লাভ করেন এক-একটা খণ্ড পরিচিতি, অখণ্ড বিশ্ববোধ গড়ে না কোন প্রাজ্ঞ পাঠকেরও।

এখন প্রশ্ন, ইউরোপীয়ানের জন্যে ইউরোপীয় এবং ভারতবাসীর জন্যে ভারতীয় সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচিতিই যথেষ্ট, না এ দুইয়ের মধ্যেও অন্তরঙ্গ আদান-প্রদানের প্রয়োজন আছে? বলা বাহুল্য, তা-ও প্রয়োজন এবং সে প্রয়োজন বেশী ছাড়া কম নয়। ইউরোপের গ্রীকো-রোমক ও খৃষ্টান সভ্যতা এবং প্রাচ্যের আর্য দ্রাবিড় মুঙ্গল ইহুদী ও ঐস্লামিক সভ্যতা, এই ত মোট সভ্যতা মানুষের। এর কোনটাই অপরটা থেকে ষোল-আনা স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে পারেনি। বাণিজ্য, সাম্রাজ্য ও ধর্ম বিস্তার, নানা পথ ধরে সুদূর অতীত থেকেই পরস্পরের আনাগোনা হয়েছে পরস্পরের দেশে এবং তা ভেঙেছে গড়েছে অলক্ষ্যেই মানুষের সংস্কৃতিকে।

তাই গ্রীক ও আর্য মননশীলতায় যেমন আশ্চর্য মিল দেখা যায়, তেমনি যায় বৌদ্ধ ও খৃষ্টান মননশীলতায়। ইসলামের সুফীদের সঙ্গে হিন্দু বৈদান্তিক ও বৈষ্ণবদের রীতিমতো তুলনায় আলোচনা করা যায়। করা যায় ক্যাথলিক খৃষ্টান ও গৌড়ীয়দের। মধ্যযুগীয় মঠাধ্যক্ষ পাদ্রীদের রচনাবলীর সঙ্গে আরব

জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও আলকেমিষ্টদের এবং হিন্দু তান্ত্রিক ও নৈয়ায়িকদের রচনার তুলনায় আলোচনা করা যায়। এই ভাবেই বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র, আবেস্তা, তালমুদ, বাইবেল, কোরাণ, মনুস্মৃতি, প্লেটো, আরিষ্টটল, সবই একে অন্যের পরিপূরক হয়ে দাঁড়াতে পারে। বাঙালী বৈষ্ণব, দক্ষিণী আলোয়ার, উত্তরী সন্তরা এবং খৃষ্টান মরমিয়ারা পরস্পরের দোসর হতে পারেন।

আর শাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্যা থেকে সাহিত্যে এলেও একই কথা। হোমার, এস্কেলিস, সোফোক্লিস, ভার্জিল, সেনেকা, ওভিড, কাতুল্লাস, লুক্রেসিয়াস এক প্রান্তে, অন্য প্রান্তে বাল্মিকী, ব্যাস, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, ভর্তৃহরি, ফেরদৌসী, হাফেজ, রুমী, জামী, সাবিস্তারী…এক প্রান্তে সেক্সপীয়র লোপডি-ভাগা, ক্যালডেরন, অন্য প্রান্তে বিশাখদত্ত, শূদ্রক, শ্রীহর্ষ…পরস্পরের মধ্যে মানসিকতায় এবং জীবনবোধে কি অদ্ভুত ও আশ্চর্য মিল, তা উদ্‌ঘাটিত করা যায় এই ভাবেই তুলনামূলক নিরীক্ষার ব্যবস্থা হলে।

॥ ৩ ॥

কিন্তু নীরস তালিকায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে প্রবন্ধ। তা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু উপযোগিতা বোঝাতে চাইছি জিনিষটার। কারণ সবিস্ময়ে এবং কতকটা খেদের সঙ্গেই, স্বীকার করব, লক্ষ্য করেছি, সাহিত্যের বোধ ও বিচার সম্বন্ধে যাঁরা কর্তৃত্ব করেন, তাঁদের পুঁজি ও প্রস্তুতি বড় বেশী কম। শুধু এদেশে নয়, আজকের দুনিয়াতেই অসম্পূর্ণ পল্লবগ্রাহিতা যেমন বেড়েছে, স্পর্ধাও সেই সঙ্গে হয়েছে অভ্রভেদী।

তাই যে-কোন গল্প বা উপন্যাসকে, যে-কোন কাব্য ও কবিতাকে এক কথায় বিশ্বসাহিত্যে অদ্বিতীয় বলে চিহ্নিত করতে দেখা যায়। বিশ্ব কথাটা ক্ষুদ্র হলেও বস্তুটা ক্ষুদ্র নয়, আর তার সাহিত্যও আদিগন্তব্যাপী। তার মোটামুটি একটা কাঠামো ইংরেজীর মাধ্যমে আহরণ করতেই পুরো ত্রিশ বছর কেটে গেল, এখনো মাঝ-নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছি। হয়ত সাঁতারে কিনারায় পৌঁছানোর বৃথা চেষ্টার সময় ও শক্তি ক্ষয় না করে, বিমানপথে দু-মিনিটে ওপারে পৌঁছলেই ভালো হত। কিন্তু সংস্কৃতিচর্চা যাঁদের সাধনা, তাঁরা জলে নেমেই সাঁতার দেবেন, শর্টকাটে শূন্যে পাড়ি দেবেন কি করে? সরস্বতীর সঙ্গে এ শঠতা কি সম্ভব?

যাই হক, তুলনামূলক ভাবে সাহিত্য নিরীক্ষার এই হল রাস্তা এবং এ রাস্তা জিজ্ঞাসু মানুষ পার হতে পারে এক মাত্র অনুবাদের আলোক-বর্তিকা হাতে নিয়ে। পড়ার ও জানার বিষয় যেমন অফুরন্ত, তেমনি সমস্ত জানা ও বোঝার পথ আটক করে রয়েছে রকমারি ভাষা। সেই শত-ভাষার প্রাচীর পার হওয়া এক জীবনে সম্ভব নয় কোন মানুষেরই। এই জন্যেই নানা দেশের নানা পণ্য এক বন্দরে এনে উপস্থিত করা দরকার। ইংরেজী ভাষা করেছে সে কাজ, তাই ইংরেজী হল বিশ্বজ্ঞানের চাবিকাঠি।

এ চাবি হাতছাড়া করে হিন্দীর আশ্রয় নিলে আমরা বিপাকে পড়ব। আন্তর্জাতিক দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ত হবই, আমাদের নিজের পরিচয়ও ক্রমশ অনেক বেশী ঝাপ্সা হয়ে আসবে আমাদের চোখে। প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধ্যান-ধারণা হক, প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য এবং চিত্রকলা হক, ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, জীবনচর্যা হক, সব কিছুই আমরা জেনেছি পড়েছি ইংরেজী দিয়ে। বাংলা ও মারাঠী তবু কিছু চেষ্টা করেছে এই পথে সাহসের সঙ্গে পা বাড়াতে। কিন্তু আর কোন ভাষা করেছে তা? হিন্দী? তার শব্দসম্ভার ও প্রকাশভঙ্গী কি এখনো আধুনিক কালের উপযোগী হয়েছে?

কিন্তু যাক এ কথা। ভারতের আদি ও মধ্যযুগের সাহিত্য হক, আর একালের আঞ্চলিক সাহিত্য হক, সব আমাদের আত্মস্ত যাচিয়ে দেখতে হবে। আবার আন্তর্জাতিক সাহিত্যেরও আত্মস্ত যথাসম্ভব অনুশীলন করতে হবে। অর্থাৎ গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, আরবী, ফার্সি, চীনা, ফরাসী, ইটালিয়ান, জার্মান, স্প্যানিস, রুশ ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ধন ভাণ্ডার অনুসন্ধান করতে হবে। তার পাশাপাশি করতে হবে সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, ওড়িয়া, অসমিয়া, উর্দু, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী ও কেরলী সাহিত্যের সম্পদ আহরণ ও অনুশীলন। তাহলে এক দিকে জন্মাবে যেমন একটা সার্বভৌম সাহিত্য বোধ, তেমনি অন্যদিকে নির্ধারণ করা সম্ভব হবে বাংলা সাহিত্যেরও একটি আপেক্ষিক মূল্য। এই মূল্য নির্ধারণের কাজ যিনি নেন, অর্থাৎ যিনি সমালোচক, এটা প্রধানত তাঁরই জন্যে। সকলের জন্যে নয়, আর সকলের সাধ্যায়ত্ত যে নয় ব্যাপারটা, এ-ও বলা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু সে সমালোচক কোথায়? যিনি নবীন শিক্ষার্থীর সামনে মেলে ধরতে পারবেন বিশ্ব-সরস্বতীর এই ঐশ্বর্য নিকেতন, এমন শিক্ষকই বা কোথায়?

সেকালে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন, ছিলেন একালে জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর, হরিনাথ দে, প্রমথ চৌধুরী, রবি দত্ত, যাঁরা দেশ ও কালের সীমাতিক্রম করে অধিকাংশ সভ্যদেশের প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের প্রাণ-পরিচয় সংগ্রহ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে এক মাত্র রবি দত্তই তাঁর Echoes From East & West নামক কাব্যসংগ্রহে রেখে গেছেন তাঁর প্রতিভার কিছু স্বাক্ষর। আর অল্প কিছু বাংলায় রেখে গেছেন জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। আজ সর্বভুক পড়ুয়া বাঙালী বিরল। তাই তুলনামূলক সাহিত্য পড়ানো কার্যত অসম্ভব। যদিও জিনিষটা সুরু হয়েছে, এটা সুখের কথা।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের হবু ডক্টরদের উদ্দেশে এই নিবেদন করেই আমার বক্তব্য শেষ করছি যে চর্যাপদ, কৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীমঙ্গল, বাউল গান ও চরিতামৃত মাত্র সম্বল করে দন্ত কিড়িমিড়ি-করা বিকট বাংলায় থিসিস লেখাকে তাঁরা যেন পাণ্ডিত্য বলে ভুল না করেন। এ পাণ্ডিত্যের ঠিক উল্টো পথের জিনিষ। আসল পাণ্ডিত্য বুদ্ধির মুক্তিতে, চিন্তার প্রসারে, কল্পনার স্ফুরণে এবং তা সম্ভব একমাত্র নানা দেশে ও নানা যুগে মানুষ যে জ্ঞান ও চিন্তার ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছেন, তার পুণ্যসঙ্গমে অবগাহন করায়। সে পাণ্ডিত্য ইউনিভার্সিটির বাঁধা ছকে তৈরী হয় না।

মহৎ সাহিত্যের দিন

প্রায় একশো বছর আগে মেকল্যে বলেছিলেন, সভ্যতা যতই এগিয়ে চলবে, পৃথিবী থেকে ততই সাহিত্যের গৌরব কমতে থাকবে। তাঁর মতে সভ্যতার শৈশবে মানুষের কল্পনা যখন ছিল সতেজ ও সবুজ, সত্যিকার সাহিত্যসৃষ্টির সুযোগ ছিল তখনই। ক্রমে বিজ্ঞান এক-একটা করে যেমনি রহস্যলোকের বন্ধ দরজা খুলে ফেলছে, অমনি যুক্তি-তর্ক ও বিচার-বিবেচনা এসে মানুষের অবাধ কল্পনার মুখে লাগাম পরিয়ে দিচ্ছে।

এ কথার প্রতিবাদ করেছিলেন সেদিন অনেকেই। তার কারণ, মেকল্যের অল্প আগে, সময় কালে এবং ঠিক পরেও পৃথিবীর নানা দেশে এমন সাহিত্য রচিত হয়েছে, যা পুরানো দিনের সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় কিছুমাত্র কম মর্যাদার দাবী রাখে না। জার্মাণীতে গ্যেটে, সিলার; ফ্রান্সে ফ্লবেয়ার, জোলা, মোপাসাঁ, স্তাঁদাল; ইংলণ্ডে শেলী, কীটস, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সেদিন বিরাট সাহিত্যের সম্পদ দিয়ে গেছেন মানব জাতিকে। এই বিরাট সাহিত্যের ধারা সেখান থেকে একেবারে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত একটানা চলেছে। তাই দেখা যায়, ফ্রান্সে আনাতোল ফ্রান্স, রলাঁ, ভার্লেন, ভ্যালেরী; জার্মাণীতে জুডারম্যান, টমাস মান; ইংলণ্ডে হার্ডি, মেরিডিথ, এটস্; ইটালীতে পিরান্দেল্লো, দানানৎসিও প্রভৃতি যে সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন, যা রাশিয়াতে তুর্গেনিভ, ডষ্টয়েভেস্কি, টলষ্টয়; নরওয়েতে ইবসেন, বেয়ার্ণসেন; পোল্যাণ্ডে সিনকেভিচ করেছেন, যা করেছেন স্পেনে আইবেনেজ, বেনাভাঁতে প্রভৃতি, বস্তুগৌরবে তা সেক্সপীয়ার, দান্তে, সারভান্তিস বা মলেয়ারের অযোগ্য উত্তরাধিকারী নয়।

লক্ষ্য করার বিষয় যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই শেষোক্ত সাহিত্যস্রষ্টাদের আবির্ভাব হয়েছে। শুধু ইউরোপের তালিকাই আমি দিয়েছি, কারণ এশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এবং তাঁর আগের পর্বে মধুসূদন ও বঙ্কিম ছাড়া এই পর্যায়ের সাহিত্যস্রষ্টা এ যুগে কেউ হননি। যাই হক, এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি যে পরিমাণ হয়েছে—বেতার, বিমান, এক্স-রে, টেলিভিশন ও পরমাণু-বিজ্ঞান

মানব-সভ্যতার গতি-প্রকৃতি যেভাবে আমূল বদলে দিয়েছে, তাতে সভ্যতার এই অধ্যায়কে চরম উন্নতির অধ্যায়ই বলতে হবে। এর মধ্যেই যদি কাব্যে নাটকে উপন্যাসে ও কথাসাহিত্যে মানুষের প্রতিভা এত বিরাট ঐশ্বর্য সৃষ্টি করতে পেরে থাকে, তাহলে আর মেকল্যের কথার মূল্য থাকে কোথায়? কাজেই সভ্যতার ক্রমোন্নতি ও কল্পনার ক্রমিক ক্ষয় যে পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

এই জন্যেই কোন কোন মানুষ বলেন, সামাজিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে যতই কেন না পরিবর্তন আসুক দুনিয়ায়, মানুষের মনের মূল বৃত্তিগুলি চিরধ্রুব। তারা সর্ব যুগে সর্ব অবস্থায় এক থাকে, যদিও বাইরে কিছু কিছু পোষাক বদল করতে পারে এবং সাহিত্য জন্মায় সেই ধ্রুববৃত্তিগুলি আশ্রয় করেই। কাজেই সৎ বা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের কোন সেকাল-একাল নেই। এক যুগের কালিদাস আর একযুগের সেক্সপীয়ারকে এবং একযুগের হাফেজ আর এক যুগের পুস্কিন বা হায়েনেকে অনায়াসে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাতে পারেন। দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করে নির্বিশেষে মনুষ্যত্বের যে আবেদন, তা সর্বকালের ও সর্বদেশের সাহিত্যে এক। তাই সভ্যতার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও সাম্প্রতিক, সকল অধ্যায়েই সাহিত্য সাহিত্যই আছে এবং থাকবেও। তার প্রবাহ কোনদিন বন্ধ হবে না।

কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী সমালোচকরা সবাই বলেন, একথা ঠিক নয়। সামাজিক, বৈষয়িক ও পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনন, চিন্তন ও দর্শনের ধারাও আমূল বদলায়। আর এই পরিবর্তন এমন বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে পারে, যাতে এক যুগের সম্মানিত ধারণাগুলি আর একযুগে অর্থহীন হয়ে যেতে পারে। একযুগের অনতিক্রমণীয় বৃত্তিগুলি আর এক যুগে একেবারেই বিলুপ্ত হতে পারে। কাজেই সাহিত্য যখন সমাজ ও সমাজাশ্রিত মানসিকতার ওপর নির্ভরশীল, তখন তা কোন চিরন্তন বা ধ্রুব ভিত্তির ওপর স্থাপিত হবে কি করে? এমন দিন আসতে পারে, যখন পূর্বতন যুগের সাহিত্যের কোন আবেদনই থাকবে না আর মানুষের কাছে। সম্পূর্ণ নূতন সাহিত্য হবে। কিংবা সাহিত্য হবেই না আর। এখনি প্রশ্ন উঠেছে, এ যুগে মানুষ আর মহৎ সাহিত্য রচনা করতে পারছেন কি না? অর্থাৎ আজকের দুনিয়ায় যে সাহিত্য লেখা হচ্ছে, তা বিগতদিনে যাকে

মহৎ সাহিত্য বলা হত, তার সমস্তরের জিনিষ কিনা? প্রশ্নটা উঠেছে প্রতীচ্যেও, প্রাচ্যেও।

গত পঁচিশ বছরের মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের যাঁরা দিকপাল লিখিয়ে, ম্যাক্সিম গোর্কী, রোমা রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, বার্নার্ড শ, টমাস মান, একে একে অনেকেই তাঁরা লোকান্তরিত হয়েছেন। তার আগের পঁচিশ বছরে হয়েছেন টমাস হার্ডি, আনতোল ফ্রান্স, ইবসেন, চেকভ্, টলষ্টয়, দানানাৎসিও। উনিশ শতকের শেষ অর্ধেক থেকে বিশ শতকের প্রথম অর্ধেকের মধ্যে পৃথিবীতে এঁরাই বরেণ্য সাহিত্যিক এবং এঁরা যা লিখেছেন, তা-ই অনেকের মতে এ যুগের অবিস্মরণীয় সাহিত্য। হয়ত এই তালিকায় আরো দু-চারিটি নাম যোগ করা যায়, যেমন ষ্ট্রিণ্ডবার্গ, জোহান বোয়ের, রেমন্ত, মেতারলিঙ্ক, যেমন গ্যালস-ওয়ার্দি, শরৎচন্দ্র। এই অনুপাতে আজ যা লেখা হয়েছে বা হচ্ছে, সে-সাহিত্যের দাম কি ও কতটা?

নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে রবীন্দ্রনাথের মতো কবিতা, ইবসেন ও শ'র মতো নাটক, টলষ্টয়, আনাতোল ফ্রান্স, রলাঁ ও টমাস মানের মতো উপন্যাস, মোপাসাঁ, চেকভ ও গোর্কীর মতো গল্প আজ কোন দেশেই কেউ লিখছেন না। লিখছেন না মানে লেখা সম্ভবই হচ্ছে না। রাশিয়ায় স্তালিন প্রাইজ দিয়ে যাঁদের সম্বর্ধিত করা হয়েছে এবং যাঁদের বৃহৎ-বৃহৎ উপন্যাসগুলি ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে পড়তে বসে, পাঠকরা যে পরিমাণ আনন্দ পেয়েছেন ক্লান্তি বোধ করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী, তুর্গেনিভ, গোগোল বা ডষ্টয়েভেস্কির সাহিত্যে সেগুলি যে সম্মান করার মতো সম্পদ নয় এবং টলষ্টয় ও গোর্কীর পর সোলোখব ছাড়া আর কেউ যে আজকের রাশিয়ায় সত্যিকার মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, এ ধারণা ছিল আমার বরাবরই। এত দিনে দেখলাম, বিংশতি কংগ্রেসে উচ্চকণ্ঠে স্বয়ং রুশরাই তা স্বীকার করেছেন।

একথাও আমি ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে বলে রাখছি যে ফ্রান্সে জ্যাক প্রেভার ও পল এলুয়ের এবং ইংলণ্ডে এলিয়ট, পাউণ্ড বা কাম্মিংস (প্রথম দু-জন কিন্তু আসলে মার্কিন) যত বড় যুগন্ধর কবি বলেই আজ কীর্তিত হন, একদিন লোকে বুঝবেন যে তাঁরা বিদ্বান পণ্ডিত যা-ই হন, কবি খুব সাধারণ স্তরের। এত সাধারণ যে প্রকাশ ভঙ্গীতে উৎকট অবোধ্যতা না থাকলে, ফ্রান্সে ভ্যালেরী,

ভার্লেন ও মালার্মের এবং ইংলণ্ডে ব্রিজেস, মাসফিল্ড, ডেলা মেয়ার ও সিটওয়েলের পর এঁরা তেমন করে কারো চোখেই পড়তেন না। আর অডেন, স্পেণ্ডার, ডে লিউস ও ডিলান টমাস প্রভৃতি? নিজ দেশেই ওঁদের রং ফিকে হয়ে গেছে, অদূর ভবিষ্যতে আর নজরেই পড়বে না।

এই সূত্রে সার্ত্রের ও কামুর কথাও একটু বলি। অ যর ধারণা, এঁরা দু-জনেই সাহিত্যিক অঘোরপন্থী। বিকৃতাচারী তান্ত্রিকদের ক্লেদাসক্তিকে প্রথম জন প্রচার করেছেন অস্তিত্ববাদ বলে, আর দ্বিতীয়জন শার্ল বদলেয়ারের প্রতিভা না থাকায় তাঁর সেই সমাহিত সুগভীর জীবন-বেদনার স্তরকে স্পর্শ করতে পারেননি, করেছেন তাঁর ঘৃণাবাদকে সাহিত্য-সাধনার পুঁজি। এসবে কোন মহৎ সাহিত্যের সমৃদ্ধি পাওয়া যায় না, যায় শুধু দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে একটা অভিনব কিছু করার মনোভাব। আসলে সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক সম্বন্ধে দীর্ঘকাল মানুষ যে সমস্ত মাপকাঠি অনুসরণ করেছেন, সারা পৃথিবী-ভোর তার চরম পরীক্ষা হয়ে গেছে গত কয়েক শতাব্দী ধরে। সে পথে না চলে নূতন পথ বের করার মোহ থেকেই জন্মেছে এই সব অভিনব সাহিত্য, যা উগ্র আধুনিকতাবাদীদের প্রশংসায় সম্বর্ধিত হলেও, প্রজ্ঞাবানকে কমই পরিতৃপ্ত করে।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল কি? বৈজ্ঞানিক প্রগতি যে মহৎ সাহিত্যের প্রতিবন্ধক নয়, তা ত আগেই দেখিয়েছি। সুতরাং সারা দুনিয়ায় আজকের এই সাহিত্যিক অবক্ষয়ের হেতুটা কি? আমার মতে সে হল এ যুগের জীবন-দর্শন। এ যুগের গতি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে, তার ফলে পৃথিবীতে এত সম্পদ ও ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয়েছে, যা মানুষ কোনদিন কল্পনাও করেনি। কিন্তু এই সম্পদ ও সমৃদ্ধি গিয়ে পড়েছে খুব অল্পসংখ্যক মানুষের হাতে। সর্বক্ষমতার অধীশ্বর হয়ে তাঁরাই আজ পৃথিবীর সমস্ত ধনশক্তি নিয়োগ ও প্রয়োগ করছেন, অথচ তাঁদের না আছে বিদ্যা, না আছে মনুষ্যত্ব। তার ফলেই কোটি কোটি বঞ্চিত ও বিড়ম্বিত মানুষ আজ বিরূপ হয়েছেন সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সব কিছুর ওপর। এই বিশ্বব্যাপী বিরক্তি ও অসন্তোষেরই অভিব্যক্তি হচ্ছে আজকের সাহিত্যে। ক্রোধ, বিদ্বেষ, হতাশা, ঘৃণা, হননেচ্ছা পুঞ্জিত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে বিশৃঙ্খল বিবর্ণ চিন্তার ভগ্নাংশরূপে। কিউবিক বা সুর-রিয়ালিষ্টিক [redacted] এলিয়ট, পাউণ্ডের

কবিতা, সার্ত্রর-এর নাটক এই বিক্ষিপ্ত যুগ-মানসিকতারই সৃষ্টি। তাই তাতে সমগ্রতা নেই, সামঞ্জস্য নেই, সহজবোধ্যতাও নেই। এই ভগ্নস্তূপকে মহৎ সাহিত্য নামে যাঁরাই চালান, এর আয়ু দীর্ঘ হবে না, হওয়া উচিতও নয়।

আসলে সাহিত্য ত সাহিত্যের জন্যেই নয়, জীবনের জন্যে এবং জীবনের বঞ্চনা-বেদনাকে তা যেমন ভাষা দেবে, তেমনি মানুষের সামনে তুলে ধরবে নবজাগ্রত জীবন ও যুগের আদর্শ। দেবে আশা ও আনন্দের, জ্ঞান ও কর্মের, বিবেক ও মনুষ্যত্বের প্রেরণা। চিরকালের মহৎ সাহিত্যেই পাওয়া যাবে তার বার্তা। আজকের সাহিত্যে তা নেই কেন? অথচ আজকের যুগে মানুষ সর্বনিম্ন ধাপের মানুষের কথা যতখানি ভেবেছে ও ভাবছে, আগে কোনদিন তা ভাবেনি। সেই কোটি-কোটি মানুষের জন্যে আজকের সাহিত্যিক দিচ্ছেন কি নূতন চিন্তা ও উপলব্ধির প্রেরণা? রল্যাঁ, টলষ্টয়, গোর্কী, রবীন্দ্রনাথ, ইবসেন, শ যা দিয়ে গেছেন, যা দিয়ে গেছেন আনাতোল ফ্রান্স, হার্ডি, মেরিডিথ এবং শরৎচন্দ্র তার কাছাকাছি পৌছান এমন লেখক ত আজ কোন দেশেই দেখা যাচ্ছে না। তাহলে কি সাহিত্য জিনিষটাই ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে আসছে পৃথিবী থেকে? কেউ কেউ অবশ্য বলেন, তাই, কারণ এটা বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার যুগ, মানুষের প্রতিভা আজ ফুটবে সেই পথেই, কলম নিয়ে সে পাঠ্য বই লিখবে, করবে সাংবাদিকতা, যেহেতু সেগুলি প্রয়োজনীয়, কিন্তু সাহিত্য-বিলাস আর সে করবে না। অর্থাৎ মেকল্যেই ঠিক বলেছেন।

আমি একথা স্বীকার করি না। আমি মনে করি, পর পর দুটি মহাযুদ্ধে পৃথিবীতে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে, তার অনিবার্য পরিণতিরূপেই এসেছে একটা সার্বভৌম অসন্তোষ ও অপ্রকৃতিস্থতা। সেই অপ্রকৃতিস্থতা ছবিতে এনেছে পিকাসো, মাতিস, গগাঁকে, সাহিত্যে এনেছে যাঁদের কথা আগে বলেছি তাঁদের। এ মানবজাতির একটা সাময়িক বিভ্রান্তি ও বুদ্ধি-বিপর্যয়ের অধ্যায়। এ কুয়াশা কেটে যাবে এবং আবার নূতন সাহিত্যের জোয়ার আসবে সারা পৃথিবীতে, আর সে সাহিত্য শুধু শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন সংস্কৃতিমান নর-নারীর সাহিত্য হবে না, তা হবে সর্বমানবের সাহিত্য এবং কালিদাস, সেক্সপীয়ার, মলেয়ার, গ্যেটে, ভিক্টর হুগো, টলষ্টয় ও

রবীন্দ্রনাথের যোগ্য বংশধর রূপেই সেই সাহিত্যিকরা জগতে বরণীয় হবেন। উৎকটতা বা অবোধ্যতার জন্যে কিছুকাল মাত্র স্মরণীয় হবেন না। সেই নূতন সাহিত্যের প্রত্যাশ্যা না যদি থাকত, তাহলে আমরা কি কেউ আর কলম ধরতাম ?

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

সাহিত্যের সামনে বৃহত্তর বা মহত্তর কোন ভবিষ্যৎ আছে, না সাহিত্য আস্তে আস্তে প্রয়োজনের পণ্যে পরিণত হতে হতে শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকতার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাবে, এই প্রশ্ন ত্রিশ বছর আগে তুলেছিলেন চেষ্টারটন। তখন এ জিজ্ঞাসা নিরর্থক মনে হয়েছিল অনেকেরই, কেন না উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের প্রধান সাহিত্যস্রষ্টারা অনেকেই জীবিত ছিলেন তখন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, ছিলেন টমাস মান, ম্যাক্সিম গোর্কী, রোমা রলাঁ, বার্নার্ড শ। ত্রিশ বৎসরের ব্যবধানে আজ যখন সবাই তাঁরা লোকান্তরিত এবং খাঁটি বিংশ শতাব্দীর সময়-সীমার মধ্যে যাঁদের জন্ম, তাঁদের মধ্যে যখন একজনকেও পাওয়া যাচ্ছে না পূর্বোক্তদের যোগ্য উত্তরাধিকারী রূপে, তখন প্রশ্নটা অনিবার্য রূপেই আবার মাথা তুলেছে।

সত্যিই পৃথিবীতে আজ মহৎ পদবীর সাহিত্য রচিত হচ্ছে না কোন দেশেই। রাশিয়ায় সাহিত্য হয়েছে কতকটা হাইস্কুল ও টেকনিক্যাল স্কুলের পরিপূরক, কতকটা বা রাজনৈতিক প্রচারণার মাধ্যম। ফেদিয়েভ, দুদিনস্তেভ ও অস্ত্রোভস্কির সুবৃহৎ উপন্যাসগুলি কেউ যদি অধ্যবসায় সহকারে পড়ে শেষ করতে পারেন, তা হলেই এ কথার যাথার্থ্য বুঝতে পারবেন। ফ্রান্সে গল্প-উপন্যাসের এবং বৃটেনে কবিতার যে কদর মাত্র সেদিনও ছিল, আজ তা রীতিমতো নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। সার্তর কামু সাগাঁ নিঃসংশয়ে রলাঁ আনাতোল ফ্রান্স বা আঁদ্রে জিদের সমস্তরের লেখক নন। শ য়েটস হাক্সল্যে গালসওয়ার্দির পর অডেন স্পেণ্ডার ইশারউডও খুব বড় গণনীয় নাম নিশ্চয় নন। কিন্তু তাঁরাও দম রাখতে পারলেন কই বেশী দিন? ফ্রান্সে ও বৃটেনে সাহিত্য অবশ্য রাশিয়ার মতো ষোল-আনা প্রয়োজনের বাহন হয়ে ওঠে নি, কিন্তু মহৎ প্রাণ-ধর্মের অভিব্যক্তি রূপে আজ তার গরিমারও কিছু নেই। সাহিত্যে একটা অবক্ষয় সুরু হয়েছে তাঁদেরও।

দেশের প্রসঙ্গও উত্থাপন করা দরকার এই সূত্রে। রবীন্দ্রনাথের পর একক স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হবার মতো নাম আমাদের মাত্র দুটি: প্রমথ চৌধুরী ও শরৎচন্দ্র। (প্রমথ চৌধুরীর অবশ্য স্রষ্টা-সাহিত্যিক হিসাবে অগ্রগণ্য ভূমিকা

ছিল না কোনদিন এবং শরৎচন্দ্র অসামান্য জনপ্রিয়তার অধিকারী হলেও, ব্যাপ্তিহীন একমুখিতার আবর্ত ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নি কখনোই)। তবু দু-জনেই এঁরা নিজস্ব ব্যক্তিত্বে অধিষ্ঠিত দুই সাহিত্য নায়ক ছিলেন। কিন্তু তারপর? তারপর we are a composite fraternity of writers, each in his or her own way a tolerable individual. আমাদের কারও বই ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়, কারও বই নির্বাচিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসাবে, কেউ বা পাই কোন নামী পুরস্কার, কেউ বা কোন দামী পদ। কিন্তু অবিস্মরণীয় বা কালোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করিনি, করতে পারিনি কেউ আমরা এবং এ আমরা নিজেরাই বুঝি। আর এ-ও সবিস্ময়ে দেখি যে গরম পিঠার মতো যে-সব বই হু-হু করে আজ বাজারে কাটে, কোনটাই তার সাহিত্য হিসাবে উঁচুতলার বস্তু নয়। অর্থাৎ সাহিত্যের অবক্ষয় স্বরু হয়েছে এদেশেও।

কিন্তু কি কারণ এই দুনিয়াব্যাপী সাহিত্যিক ক্ষয়দশার? কারণ অনেক দেখানো যায় এবং কতকগুলো তার বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথম কথা, এটা একান্তভাবে বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান গতি ও উৎপাদনের রাজ্যে যে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছে, তার ফলে মানুষ সহসা আজ অসামান্য শক্তি ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে পড়েছে এবং এই শক্তি ও ঐশ্বর্যের লালসাই আকর্ষণ করেছে বেশীর ভাগ মেধাবী ও কল্পনাকুশলী মানুষকে বিজ্ঞানের অভিমুখে। তাছাড়া পাইকারি উৎপাদন ও আহরণের যুগে এই রাজ্যে শ্রম-নিয়োগের দক্ষিণা বৃদ্ধি পেয়েছে আশাতীত হারে, যা হয়নি অন্যান্য দিকে। তার আকর্ষণেও বিজ্ঞান ও কারিগরী কর্মের দিকে ঝুঁকেছেন দলে দলে বুদ্ধিমান মানুষরা। ফলে সাহিত্যের রাজ্যে হয়েছে প্রথম শ্রেণীর সৃজনী-প্রতিভার একান্ত অভাব, কেন না সেই প্রতিভাই নিয়োজিত হয়েছে ক্ষেত্রান্তরে এবং এই শতাব্দীর প্রথম দু-তিন দশক থেকেই আরম্ভ হয়েছে এটা। আজ হয়েছে তারই পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ।

দ্বিতীয় কথা, বিজ্ঞানের যুগ বলেই এটা ব্যস্ততারও যুগ। মানুষের সময় নেই। কলের ভেঁপু দিয়ে আমাদের দিন স্বরু হয় এবং ট্রামে-বাসে লোকাল ট্রেনে সেই দিন হু-হু করে অবিশ্রাম ছুটতে ছুটতে যেখানে এসে থামে, সেখানে মানুষের আর থাকে না এমন সামর্থ্য বা স্বাচ্ছন্দ্য, যা দিয়ে সে গভীর কোন

বস্তুর চর্চা বা অনুশীলন করতে পারে। অর্থাৎ সময়াভাব হয়েছে আজ লেখকেরও, হয়েছে পাঠকেরও। অথচ মানুষের বলার কথাও বেড়েছে, বেড়েছে জানার আগ্রহও। তার থেকেই জন্মেছে ছোট গল্প, ছোট প্রবন্ধ, ছোট কবিতা, যা এ যুগের প্রধান সাহিত্য। যাঁরা একটু বেশী সময় দিতে পারেন, তাঁরা খোঁজ করেন বই-পুঁথির। না হলে পত্রিকা এবং সংবাদপত্রের সাহিত্য-বিভাগই আজ হয়েছে বেশীর ভাগ মানুষের কাছে চলতি সাহিত্যের দিগদর্শন।

আসলে এটা শুধু পাইকারি উৎপাদনের যুগ নয়, পাইকারি লভ্য আহরণেরও যুগ এবং যা প্রচুর অর্জনের সহায়ক নয়, এমন জিনিষের প্রতি আস্থা থাকতে পারে না আজ কোন লোকেরই। সেই জন্যেই বিশুদ্ধ শিল্পের সব বিভাগেই আজ বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতার পথ উন্মুক্তকরার উদ্যম চলেছে। অভিনয় সঙ্গীত ও চিত্রের মতো সাহিত্যও এই বাণিজ্যায়ন থেকে রক্ষা পায় নি। তাই সাহিত্যকে আজ ছায়াচিত্র, বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের ওপর তার স্থিতি এবং পুষ্টির জন্যে নির্ভর করতে হয়। আর যে জিনিষকে এই সব জনপ্রিয় মাধ্যমের সাহায্যে সর্বজনের মধ্যে ছড়ানো হয়, তার জাত খুব কুলীন এবং ধাত খুব বনিয়াদী হতে পারে না সঙ্গত কারণেই। সমাজের সব চেয়ে নীচু ধাপের মননশক্তি ও উপভোগ-ক্ষমতার হিসাব করেই খাঁটি জিনিষকে জল মিশিয়ে বেশ কিছুটা তরল ও ঢিলে করে দিতে হয়। এই সাংবাদিক ও বেতারাশ্রিত রচনা যখন ভব্য মলাটে গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে দেখা দেয় গ্রন্থরূপে, তখন তাতে পাওয়া যায় বেশী করে জলের অংশটাই এবং আজ সব দেশেই চলতি সাহিত্যের খুব বড় একটা অংশ এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

বলা বাহুল্য, এ হতেই হবে। নিছক রসসৃষ্টির জন্যে সাহিত্যসেবা আজ কেউ করেন না, নিছক রসাস্বাদের জন্যে সাহিত্য পড়ার মানুষও দুর্লভ হয়েছে। লেখক সাহিত্যের আশ্রয় নেন তাকে জীবিকা হিসাবে লাভজনক করে তোলার জন্যে। কাজেই বাজারী চাহিদার খাতিরে তাঁকে সরবরাহ করতে হয় সেই সব পণ্য, যার নগদ খরিদ্দার অধিক। পাঠক সাহিত্যের সন্ধান করেন হয় তা থেকে কিছু প্রমোদ সংগ্রহের জন্যে, নয় কিছু জ্ঞান-বুদ্ধি আহরণের আশায়, যা তাঁর হাতে পৌঁছে দিতে হবে অল্প সময়ের মধ্যে এবং মাত্র দু-চার কথায়, অথচ যা খুব জটিল গভীর বা বুদ্ধি-আলোড়নকারী হবে না। এমন সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে

রঙচঙে সাংবাদিকতা ছাড়া আর কি? সারা পৃথিবীতেই তাই এই জাতীয় ঢিলে রচনার ব্যাপক আবাদ চলেছে। গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ, নানা খণ্ড-আকারে প্রকাশমান হলেও, অখণ্ডভাবে তা হল সাময়িকতা-চিহ্নিত এক রকম সাংবাদিক সাহিত্যই। সেই কারণেই মহৎ বা কালোত্তীর্ণ নয়, কেন না আজকের সময় পার হয়ে যাবার পর তার অনেকটুকুরই অর্থ এবং সার্থকতা যাবে অন্ধকারে হারিয়ে। সাংবাদিকতা মানেই সাময়িকতা!

বিশ্বসাহিত্যের বৃহৎ আকাশ থেকে আমাদের ঘরের মাটিতে নেমে এলেও, একই অবস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। বাংলা ভাষায় আজ ছোট-বড় ভালো-মন্দ-নির্বিশেষে সব লেখকই লেখেন গল্প-উপন্যাস এবং বলতে গেলে, এই দুটো বিভাগই আজ সত্যিকার সাহিত্য। খাঁটি গল্প-উপন্যাস ত লেখা হয়-ই, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা, দার্শনিক তত্ত্ব-জল্পনা, এ-সবও এখন লেখা হয় উপন্যাসের ছকে। এই পাঁচ-মিশেলী জাতের লেখার একটা সস্তা নাম হয়েছে রম্যরচনা, যা নাম হিসাবে সার্থকও নয়, রম্যও নয়। কিন্তু আজকের সমাজ সংস্কৃতি ও মানসিকতার পটভূমিতে এই শ্রেণীর লেখার ব্যাপক উৎপাদন এবং প্রচারই প্রমাণ করে যে কুলীন পদবীর সাহিত্যে আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, চলতি দিনের বেলোয়ারী লেখাই আমাদের চাই এবং যা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য শ্রোতব্য ও চিন্তনীয়, তা এই রকম একটা কোন সুলভ বাহনের মধ্যে দিয়ে পরিবেষিত হক, এ-ই আমরা চাই।

তাই দেখবেন, পুরনো কলকাতার কাহিনী হক, জেলখানার ভেতরকার বিবরণ হক, তীর্থযাত্রার স্মৃতি হক, সাধু-মোহান্তের চরিত হক, আপন ছেলেবেলার কথা হক, সব কিছুই আজ লেখা হয় উপন্যাসের ঢঙে। অর্থাৎ, তাতে না থাকে প্রবন্ধের মজবুত মেরুদণ্ড, না থাকে উপন্যাসের জীবনবোধ। কাজেই শিল্প হিসাবে তা সঙ্কর জাতির। কিন্তু এ-ই যখন সর্বাধিক স্বীকৃত ও সমাদৃত বাহন, তখন বুঝতে হবে, মানুষের মানসিক প্রবণতাই মোড় ফিরেছে আজ এই দিকে। আর তার কারণ হল এখনকার সামাজিক মনস্তত্ত্ব, যা বিশুদ্ধ কলার পরিপোষক নয়। অর্থাৎ বেতার ছায়াচিত্র ও সংবাদপত্রের দিকে চোখ রেখে যে রচনা তৈরি করতে হয়, তা তথাকথিত মহৎ সাহিত্য হবে কি করে? দুঃখের বিষয়, প্রাণগত মহত্ত্ব যখন অন্তর্হিত হয়েছে সাহিত্য থেকে, তখন প্রচারযন্ত্র হয়ে উঠেছে অতিশয় শক্তিশালী এবং তার মারফত এই সাহিত্যই

উচ্চাঙ্গের রচনা রূপে বাজার মাত করে ফেলেছে এবং এ জন্যে যশ ও অর্থলাভেরও অসুবিধা হচ্ছে না। এই ভাবে নিয়মিত জল-মেশানো পথ্যই যখন সুপথ্য রূপে সার্বভৌম স্বীকৃতি পাচ্ছে, তখন জনসাধারণের রুচি কতদিন আর তথাকথিত ধ্রুব সাহিত্যের জন্যে হাত পেতে বসে থাকবে?

তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে কি? চেষ্টারটন ত্রিশ বছর আগে যা বলেছিলেন, তাই কি? সত্যিকার সাহিত্য কি বাস্তবিকই একটা বকেয়া দিনের শিল্প হিসাবে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের বিষয় হবে এবং সাম্প্রতিক কালে যা সাহিত্য নামে বাজারে চলছে, তার এক হাত থাকবে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত, অন্য হাত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে? বলা দরকার যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রামাণ্য এবং পূর্ণায়তন বই-পুঁথি ইদানীং রচিত ও প্রচলিত হচ্ছে সব দেশেই। আর হচ্ছেও বহুল পরিমাণে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটো—প্রথমত, এখন একক পাণ্ডিত্য ও মনীষার ফল হিসাবে বৃহৎ বই বড় বেশী লেখা হয় না। নানা পণ্ডিতের বিভাগীয় রচনা একত্র করে একজন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ করেন একটি পুস্তক এবং প্রায়শ তা প্রকাশ করেন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অ্যাকাডেমি বা শিক্ষায়তন। দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষ সে-সব বই-পুঁথি বড়-একটা পড়েনও না, তার খবরও রাখেন না। তাঁদের জন্যে এই সব মহাগ্রন্থের সারমর্ম হ্যাণ্ডবুক বা পকেটবুক আকারে বের হয় এবং বেশীর ভাগ লোকই তা নাড়াচাড়া করে সর্ববিদ্যা-বিশারদ হয়ে ওঠেন। ফলে সাধারণ মানুষের বিদ্যা-বৈদগ্ধ্যের বনিয়াদও অধিকাংশ স্থলেই হয় বেশ ফাঁপা। আগেই বলেছি, মানুষ আজ ব্যস্ত, তার সময় নেই, অথচ তার ক্ষুধা বেড়েছে। সেই ক্ষুধার চরিতার্থতা বিশেষজ্ঞদের কাছে যতই উপহাসের বস্তু হক, এই হল যুগধর্ম।

এই যে হ্যাণ্ডবুকের বিশ্বব্যাপী প্রচার, এ-ও ঐ সাংবাদিকতারই আর এক রূপ এবং এ কথা আশা করি সবাই জানেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ওয়েলস যখন Outline of World's History লেখেন, তখন থেকেই এই শর্টকাটের পালা সুরু হয়। শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, কোন বিষয়ে না এই রকম সংক্ষিপ্তসার ঝুড়ি ঝুড়ি পাওয়া যাবে? একদিকে পূর্ববর্ণিত রম্য সাহিত্য, অন্যদিকে এই আউট-লাইন সাহিত্য, এই হল আজ বেশীর ভাগ দেশের সাহিত্য এবং আধুনিক সাহিত্যের ভালোত্ব ও মন্দত্ব নিয়ে যত তর্ক

হয়, তা হয় এই দুই পর্বের বই নিয়েই। রাশিয়ার কাছে সমস্যাটা সহজ হয়ে গেছে, তাঁরা প্রাণধর্মী বা রসধর্মী সাহিত্যকে প্রায় বাতিল করে ফেলেছেন এবং প্রয়োজনের সাহিত্যকেই সাহিত্য রূপে অনুমোদন দিয়েছেন। অন্যান্য দেশ এখনো মনস্থির করতে পারেন নি, তাই এখনো তাঁরা ছদ্মবেশটা জীইয়ে রেখেছেন সাহিত্যের, যদিও তাঁদের চোখের সামনেই পুরনো দিনে যাকে সাহিত্য বলা হত, তা একটু একটু করে দেউলে হয়ে যাচ্ছে।

এমন দিনে মন ঠিক করে ফেলার সময় এসেছে। আজ যখন কলাত্মক শিল্প বা liberal education-এর স্থান পিছনের সারিতে গিয়ে পড়েছে এবং সামনের পর্দায় এগিয়ে এসেছে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা, আর তাতে আমরা কোন অসঙ্গতি দেখছি না, তখন চলতি বাজারের সাহিত্যকেই বা কেন আমরা নিতে পারব না প্রসন্ন চিত্তে? সঙ্কট হয়েছে দুনিয়ার স্বীকৃত ক্ল্যাসিক সাহিত্য নিয়ে। সেগুলোর কি হবে? কি আর হবে? দিদিমার গায়ের গহনার মতো তা মূল্যবান বলেই গণ্য হবে। কিন্তু দিদিমার গহনা যেমন আজ কোন তরুণীর দেহে শোভাবর্ধন করে না, ক্ল্যাসিক পদবীর সাহিত্যও তেমনি প্রতি দিনের প্রীতিভোজে আর পাঙ্‌ক্তেয় থাকবে না। কি আর উপায়? যুগের বিরুদ্ধে আমরা যা-ই কেন না বলি, তার অমোঘ নিয়মকে না মেনে নিয়ে আমাদের উপায় কি?

পূর্বাচার্যদের প্রসঙ্গে

১৯৩০-৩১ সালে যখন আমার বয়স কুড়ি-একুশ এবং সাহিত্যিক সমাজে চেয়ার না হক, ছোটখাটো একখানা পিঁড়ি অন্তত লাভ করেছি বসার জন্যে, বাংলা দেশে তখন বিশিষ্ট ও বরেণ্য মানুষ ছিলেন অনেক। অবসর পেলেই বেপরোয়া বেগে কলম চালানোর মতো এঁদের ঘরে হানা দেওয়াও ছিল আমার নিত্যকার কাজ।

ত্রিশ-একত্রিশ বৎসর পরে আজ যখন আমিই বৃদ্ধের তালিকায় স্থান পেতে চলেছি, তখন আশেপাশে তাকিয়ে দেখি, দেখা হলে প্রণাম করার মতো মানুষের সংখ্যা ত কমে গেছেই, এমন কি উঁচুমাথা মানুষের সংখ্যাও আঙুলে গণা যায়। ত্রিশ বছর আগে ছিলেন যে দিকপালরা, তাঁরা সবাই আজ লোকান্তরিত হয়েছেন এবং লক্ষ্য করার বিষয় যে তাঁদের নামও আস্তে আস্তে মুছে আসছে আজ বাঙালীর মন থেকে।

না আসবে কেন? মানুষের নাম বাঁচে তাঁর কাজকে আশ্রয় করে, আর কাজ বাঁচে হয় বইয়ের মাধ্যমে, নয় প্রতিষ্ঠানের জোরে। কিন্তু আমাদের দেশে বই হল নিতান্তই এক-ফসলী জিনিষ। লেখকের জীবন পার হয়ে গেলে, তার পাত্তা পাওয়া যায়না কোথাও। আর প্রতিষ্ঠান গড়ে যাওয়া ত যার-তার কর্ম নয়। যাঁরা পারেন, তাঁরা ভাগ্যবান এবং তাঁদের নাম-কাম বাঁচিয়ে রাখবার লোকের কোনদিন অভাব হয় না।

লক্ষ্য করে দেখেছি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দুর্গাদাস লাহিড়ী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতির স্মৃতি ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছে মানুষের মনে। যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকের নামও এক-ডাকে কারো মনে আসে না। যেন তাঁরা ছিলেন না, নয়ত ছিলেন কোন দূর অতীতে!

মানুষের দোষ নেই। এঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এঁদের রচনাবলীরও মৃত্যু

হয়েছে এবং তাকে জীইয়ে তোলার গরজ বোধ করেননি কেউ। অন্যান্য দেশে এই কাজ করেন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় সাহিত্য-নিকেতন এবং এমনি ধারা দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানরা। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এ চেষ্টা কমই হয়েছে। জাতীয় সাহিত্য-নিকেতনের কর্মধারাতেও এদিককার চেতনার বেশী পরিচয় মেলে না।

অর্থাৎ জন সাধারণের অনুগ্রহের মুখ চেয়ে বাঁচতে হয় এদেশে চিন্তাজীবী মানুষকে। সেই অনুগ্রহ যাঁর ভাগ্যে স্থায়ী হয়, তিনি টিঁকে যান। যাঁর হয় না, তিনি স্খলিত হয়ে যান আস্তে আস্তে। দুঃখের কথা যে জিনিষটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্থায়ী হয় না। একে ত জনসাধারণের রুচি সাম্প্রতিকের গণ্ডী দিয়ে ঘেরা, তার সময়-সীমার মধ্যে যা ভালো যা প্রশংসিত, তাকেই সে নেয় স্বাগত করে। তার ওপর জনসাধারণ নামে যে নির্বিশেষ মানবগোষ্ঠীকে বোঝায়, তার রুচির স্তরটাও খুব উঁচু নয়। তাই অভিনেতা, গায়ক, নর্তক, মুষ্টিযোদ্ধা, যাদুকর, জ্যোতিষী,…এঁদের কদরই তাঁদের কাছে আর সবার ওপর। এ হবারও কারণ আছে। মানুষকে এই সব শ্রেণী জোগান নগদ প্রয়োজনের পণ্য এবং একদিনের বেলোয়ারী সওদা আর-একদিন বাসি বলে পরিত্যক্ত হলে, নালিশ করতেও আসেন না কেউ।

কিন্তু সংস্কৃতি ত এ জাতের জিনিষ নয়। সংস্কৃতিমান মানুষও এ রকম হাতে-হাতে কিছু পাইয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন না। তাঁকে তাই স্বীকৃতির জন্যে অপেক্ষা করতে হয় এবং অপেক্ষা করতে করতে যেমন অনেকের জীবনের পুঁজি ফুরিয়ে যায়, অনেকের তেমনি জীবন থাকতে থাকতেই কাজের মৃত্তিকায় বন্ধ্যাদশা উপস্থিত হয়। ফলে স্বীকৃতি আর পাওয়াই হয় না। তারপর একমাত্র ভরসা পুরাবৃত্তকার ও প্রত্নতাত্ত্বিকের ওপর। তবে তাঁরা জন্মান অনেক পরে, ফলে অনেক কিছুই তার আগে মিশে যায় মাটির সঙ্গে।

আমি শুধু আমার অল্প বয়সে যাঁদের দেখেছি এবং যাঁদের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি, তাঁদের কয়েক জনের কথাই বলেছি। এঁরা মাত্র সেদিনের মানুষ, এঁরাই যখন প্রায় প্রাগৈতিহাসিক কালের গল্প-কথায় পর্যবসিত হয়েছেন, তখন আরো আগের যাঁরা, তাঁদের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে, সে কি আর বলতে হবে? একেবারে উনিশ শতকের গোড়া থেকে ধরুন, কত জাহাজই না ডুবি হয়েছে আমাদের স্মৃতির অতলে!

রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, হরিশ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, কেশবচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, উমেশচন্দ্র বটব্যাল আজ এক-একটা নাম মাত্র হয়ে আছেন আমাদের প্রবন্ধ সাহিত্যে। তাঁদের কোন রচনাই চলতি বাজারে পাওয়া যায় না। কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান তাঁদের স্মৃতিসভার আয়োজন করেন না। কোন প্রকাশক তাঁদের বই-পুঁথি প্রকাশ করেন না। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণায় পৃষ্ঠপোষকতা করেন না। সাধারণ মানুষকে দায়ী করছি না, যাঁরা সংস্কৃতিমান এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে নায়কতা দাবী করেন যাঁরা, তাঁদের ঔদাসীন্য দেখলে লজ্জা করে। তবে সৌভাগ্যের কথা যে তাঁরাও এঁদের সম্বন্ধে জানেন এত কম যে সে-জানাও না-জানারই নামান্তর বিশেষ। অথচ কর্তৃত্বের আসনগুলি তাঁদেরই অধিকারে, তাই অ-চর্চার অপরাধটাও অপরাধ বলে গণ্য হয় না আমাদের দেশে!

অবশ্য এর মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই বাঙালীর মন ভুলতে রাজী হয়নি। বরং যত দিন যাচ্ছে, ততই রবীন্দ্রানুরক্তি দেশে বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু বহু রবীন্দ্র-জয়ন্তীর আসরে বক্তা হিসাবে যোগ দিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তাতে আশার চেয়ে নৈরাশ্য, আনন্দের চেয়ে বেদনাই বেশী লাভ হয়েছে। শুধু নৃত্য আর গীত আর নাট্যাভিনয়, এর মধ্যেই আবদ্ধ হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। উদ্যোক্তরা তার বেশী কিছুই জানেন না এবং চানও না জানতে। নৈবেদ্যের ওপর মণ্ডার মতো এ-সবের আগে একটা বক্তৃতা দরকার। তাই একজন সাহিত্যিক বা সাহিত্যের অধ্যাপককে ডাকা হয় কিছু বলতে। কিন্তু সে ভাষণ শোনার দায় যে কার, তা বোঝা যায় না!

এক-এক সময় আমার মনে হয়েছে, গান এবং নাটক ও নৃত্য-নাট্য যদি না থাকত তাঁর, তাহলে হয়ত রবীন্দ্রনাথের জন্যেও আমাদের মাথা-ব্যথা খুব বেশী হত না। তাঁকে নিয়ে উৎসব করা যায় বলেই বোধহয় তাঁকে বর্জন করা হয়নি। এই অশোভনতার নিন্দা করেন সবাই। করি আমিও। তবু অন্তত একজন স্মরণীয় পুরুষকেও ত স্মরণ করা হচ্ছে, যে ভাবেই হক। আর সকলকেই ত আমরা বৈতরণী পার করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। তবে রবীন্দ্রনাথের রচনা কতজন পড়েন, তার আদমসুমারি করলে দেখা যাবে, মাইকেল, দীনবন্ধু ও

বঙ্কিমের চেয়ে তাঁর পাঠকসংখ্যাও নিদারুণ রকম বেশী নয়। যদিও অবস্থাপন্ন বাড়িতে পরের পর রবীন্দ্র-রচনাবলী সাজিয়ে রাখা একটা আভিজাত্য হিসাবে চল হয়েছে আজকের বাজারে।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের রচনাই যখন পড়ার লোক গাড়ি-গাড়ি নেই, তখন তাঁর আগের বা সময়ের আর সমস্ত কবি-সাহিত্যিককে কে মনে করে রাখবেন? তাই ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন সবাই আজ অন্ধকারে হারিয়ে গেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এখনো পেশাদার রঙ্গালয়ের কৃপায় মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি বেমালুম অন্তর্ধান করেছেন। করেছেন শশাঙ্ক-মোহন সেন, প্রিয়নাথ সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতিও। প্রমথ চৌধুরীর বই এখনো হয়ত মেলে, তবে পাঠক মেলে অতি অল্পই।

অর্থাৎ বাংলাদেশে সাহিত্যসেবা করে যাঁরা জীবনকালেই নগদ মূল্য পেয়ে গেলেন, তাঁরা যাহক কিছু পেলেন। জীবনান্তের পর তাঁদের আর আশা করার কিছু নেই। ঐ এক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় স্থান পাওয়া বা ডি.-ফিল. পরীক্ষায় গবেষণার বিষয়ীভূত হওয়ার অনিশ্চিত সম্ভাবনা ছাড়া। এটা কেন হয় এবং এ আমাদের উন্নতি না অবনতির লক্ষণ, এ কথা ভেবে দেখেছি। আমার মতে এটা অবনতিই এবং আমাদের জাতীয় প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই এই। বই-পুঁথি আমরা ফুল-তুলসী দিয়ে পূজো করি, কিন্তু খুলে পড়ি না। তাছাড়া বর্ষা ও উই-ইঁদুরের দেশে বই বাঁচেও না বেশী দিন। আগেকার মানুষরা এটা বুঝতেন। তাই মঠ-মন্দির বানিয়ে এবং সম্প্রদায় সৃষ্টি করে, তার মারফত তাঁরা আপন আপন মত, পথ, চিন্তা ও রচনা চলিত করে যেতেন। চরিত ও মঙ্গলের ভেতর দিয়ে স্মরণীয়দের কীর্তি-কলাপ সর্বজনের কাছে গানের মাধ্যমে প্রচার করতেন। মহৎ মানুষদের নামে মেলা বসাতেন। যখন থেকে সংস্কৃতি ছাপা বইয়ে আশ্রয় নিয়েছে, তখন থেকে সাধারণের জন্যে যেমন ব্যবস্থিত হয়েছে বাধ্যতামূলক সংস্কৃতি-বঞ্চনা, সংস্কৃতি-সাধকেরও তেমনি হয়েছে মর্মান্তিক ভাগ্য-বিপর্যয়।

সেই বিপর্যয়ের ফলেই গত এক শতাব্দী ধরে বাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যসংস্কৃতির রাজ্যে এক দিকে যেমন ঐশ্বর্য জমা হয়েছে, আর এক দিকে

তেমনি আমরা ছুর্নিবার মূঢ়তায় পুরাতনের সমস্ত পদচিহ্ন মুছে ফেলেছি। এর মানে এই নয় যে আমরা শুধু পুরানো আঁকড়েই পড়ে থাকব এবং যে যুগ ও জীবনের মধ্যে আমাদের স্থিতি, তার দিকে ফিরেও তাকাব না। কেবলমাত্র অতীত আশ্রয় করে বাঁচা মৃত্যুরই নামান্তর। কিন্তু অতীতকে ছেঁটে ফেলে বাঁচাও আত্মহত্যার সামিল। সব জাতি ও সংস্কৃতির শিকড়ই সংলগ্ন থাকে তার ঐতিহ্যের মাটিতে এবং সে মাটির কর্ষণা থেকেই জন্মায় ভবিষ্যতের নূতন ফসল। আমরা অতীতকেও চিনছি না, তাই ভবিষ্যৎকেও স্বাগত করতে পারছি না। বর্তমানের চৌহদ্দির মধ্যেই দাপাদাপি করছি দিনরাত্রি।

এই জন্যেই আজকের জীবনে আমাদের পলিটিক্সই হয়েছে প্রধান উপজীব্য। ট্রেড ইউনিয়ন, ধর্মঘট, নির্বাচন ও দলাদলির চতুর্বর্গ আক্রমণে আমাদের চিত্তবৃত্তি আজ চঞ্চল ও উৎক্ষিপ্ত। এর থেকে বিরতির একমাত্র পথ খুঁজে বের করেছি আমরা নৃত্য-গীত অভিনয়, তারি আবাদ সুরু হয়েছে দেশে দরাজ হাতে। আর আজকের সাহিত্যও হয়ে দাঁড়িয়েছে দৈনন্দিন পথচলারই একটা সুলভ বাহন। তাই সংবাদপত্র, বেতার ও সিনেমাই তার একান্ত নির্ভর। তা অতীতকেও আমল দেয় না, ভবিষ্যৎ নিয়েও মাথা ঘামায় না, তার কারবার বর্তমান নিয়ে। এ সাহিত্য পরিপাক করা কঠিন নয়, কেননা এ নিজেও কিছু ভাবে না, অন্যকেও কিছু ভাবায় না। গতি ও উৎপাদনের যুগে এ-ও একটা চলতি বাজারের উৎপাদন মূলক শিল্প বিশেষ।

এই পটভূমিতে যা ক্ল্যাসিক্স পদবীভুক্ত, তা বাঁচবে কি করে? আর তা যদি না বাঁচে, তাহলে তার স্রষ্টারা, স্থায়ী জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপারীরা বাঁচবেন কি করে? সেই জন্যেই আজ এতক্ষণ ধরে যাঁদের নাম করলাম, তাঁরা কেউ বেঁচে নেই। কারুকে কারুকে আমরা নিওনের আলো আর প্রাচ্যকলা সমৃদ্ধ দৃশ্যপট খাটিয়ে পাদ-প্রদীপের সামনে হাজির করছি বটে, কিন্তু যেখানে তাঁদের সত্যিকার স্থিতি, সেই জায়গাটা থেকে যাচ্ছে আমাদের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে এবং কেন, তা ত আগেই বলেছি।

এমন দিনে বিগত দিনের মনীষাকে আমাদের প্রতিদিনের প্রবহমান জীবনের মধ্যে এনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, আমাদের মননশীলতার মোড়ই পুরোপুরি ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কি ভাবে? শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্রগুলি যাঁদের হাতে, তাঁরা কারা এবং কি গুণ ও ক্ষমতা-

বলে এগুলি দখল করেছেন তাঁরা, তা জানলে আর আশা করার কিছু থাকে না। তবু আশা রাখাই ভালো। হতাশা মানুষকে অমানুষ করে।

তাই একটা প্রস্তাব করছি। আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন যাতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলে, যাতে হুজুগের হাটে গোলে হরিবোল দিয়ে আমরা অন্যকেও বোকা না বুঝাই, নিজেরাও বোকা না হই, তার জন্যে একশত স্মরণীয় বাঙালীর জীবন ও কর্মের ইতিহাস সমস্ত দেশের সামনে উদ্ঘাটিত করা হক এবং একশত বাংলা বই আনুপূর্বিক ভাবে প্রকাশ ও প্রচার করা হক। গবেষণা, আলোচনা, উৎসব, স্মৃতিসভা, সবই হক দেশ ও জাতির সত্যিকার প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে। আর পদ ও অর্থের চেয়ে পদার্থ যাঁদের বেশী, তাঁদের হাতেই দেওয়া হক সংস্কৃতির এই পঙ্কোদ্ধারের ভার। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তেমন মানুষের অভাব দেশে এখনো হয়নি। বৈশ্য-প্রতিপত্তির দাপটে তাঁরা কোণঠাসা হয়ে আছেন, সুযোগ ও সুবিধা দিলে নিশ্চয় উঠে দাঁড়াতে পারবেন।

ব্যক্তি-রাষ্ট্র-সাহিত্য

॥ ১ ॥

ভ্লাদিমির ডুদিনস্তেভের Not By Bread Alone, কেবল পেটের ভাত দিয়ে নয়, বইটির কঠোর সমালোচনা করেছেন সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা মিঃ ক্রুশ্চেভ। এই বই ষ্ট্যালিন আমলের ব্যক্তি-প্রাধান্য বাদকে জীইয়ে রাখার চেষ্টা করেছে, এতে জাগ্রত বাস্তবের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান নায়ক ও শাসকদের ব্যর্থতা ঘোষণা করা হয়েছে, এ রকম বই রচিত ও প্রচারিত হওয়া ক্ষতিকর, এই কথা বলেছেন তিনি।

সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির সর্বাধিনেতা একটি বই সম্বন্ধে এ ধরণের অভিমত প্রকাশ করেছেন, ব্যাপারটির গুরুত্ব তাই কম নয় এবং এ ঘটনার তাৎপর্য কি, তা-ও কারুকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, মিঃ ক্রুশ্চেভের এই অভিমত খাঁটি কি না এবং রাষ্ট্র-যন্ত্রের সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর হাতে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতি বা ভবিষ্যৎ নির্ধারণের কর্তৃত্বও তাঁর করতল-গত হওয়া শুভ কি না?

Not By Bread Alone বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এর কয়েক লাখ কপি বিক্রী হয়েছে। সোভিয়েট প্রেস বইটিকে স্বাগত জানান অদ্বিতীয় রচনা বলে এবং Literary Man's Who's Who-তে বলা হয়েছে, মানুষের ব্যষ্টি-জীবন জৈব প্রয়োজনের অর্থাৎ প্রাত্যহিক ক্ষুধা-তৃষ্ণার গণ্ডীতে আবদ্ধ হলেও, তার সমষ্টি-জীবনের আশ্রয় হল মহত্ত্বের সাধনা। এই সাধনাই সৃষ্টি করে তার শিল্প সংস্কৃতিকে, তার দেশ-কাল জয়ী আদর্শবাদকে। যে ব্যবস্থায় এই আদর্শবাদ ব্যাহত হয়, মানুষ শুধু আঁকড়ে ধরতে শেখে সীমাবদ্ধ বাস্তবকে, তা প্রকৃত পক্ষে ব্যর্থতাই ডেকে আনে মানুষের জীবনে। যুগ-জীবনের এই জটিল সমস্যাকেই ভাষা দিয়েছেন ডুদিনস্তেভ, তাই তাঁর এ রচনা একটি ক্ল্যাসিক। ডষ্টয়েভেস্কী, টলষ্টয় ও গোর্কীর সঙ্গে এই রচনা একাসনের অধিকারী।

Not By Bread Alone মানুষকে বাস্তব-বিমুখ এবং বিজ্ঞান ও কারিগরী শিল্পাশ্রিত সাম্যবাদী সমাজ সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ করছে, এ কথা বলেন নি

কোন বিজ্ঞ সমালোচকই। আর সে সমালোচকরা সবাই রুশ ত বটেই, সাম্যবাদীও। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই বইটির এই ভাগ্য-বিবর্তন মানুষকে অবাক করেছে এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি অনিবার্য ভাবে উঠেছে এই কারণেই। মনে করার কারণ হয়েছে যে সাহিত্যিক আদর্শবাদের জন্যে নয়, রাজনৈতিক মতবাদের বিরোধেই মিঃ ক্রুশ্চেভ রুষ্ট হয়েছেন বইটির ওপর।

সবিনয়ে বলে রাখি যে আমি একজন মার্ক্সপন্থী এবং সাম্যবাদী সমাজের সবল সমীকরণ অনভিপ্রেত মনে করলেও, আমি সাম্যবাদের সমর্থক ও প্রচারক। আমি একথা বিশ্বাস করি না যে সাম্যবাদী দেশে মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নেই, তাঁরা সব 'রোবট' বিশেষ, তাঁদের সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান হক, আর ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বা জাতির সঙ্গে জাতির সম্পর্ক হক, সবই চালিত হয় রাষ্ট্রস্বার্থের সুনির্দিষ্ট ছক ধরে। এই রকম অন্ধ রাষ্ট্রানুগত্য যেখানে বাধ্যতামূলক করা হয়, সেখানে সমাজ হারায় তার গতিশীলতা এবং নিষ্প্রাণ নিষ্প্রবাহ সমাজ কখনো প্রাণবান সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে পারে না। সোভিয়েট সংস্কৃতির মধ্যে পাই সুস্পষ্ট জীবনোত্তাপ, তাই সে সমাজ যে জাগ্রত ও জীবন্ত, তা বুঝতে দেরী হয় না। এই কারণেই সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রাধিপত্যের অভিযোগটা অভিযোগ মাত্র, সে বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।

তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে সাহিত্য সম্বন্ধে মিঃ ক্রুশ্চেভের এই ডিক্টেটার-সুলভ মনোভাব আমার ভালো লাগে নি। এলিয়া এরেনবুর্গ বা মিখায়েল সলোখভের মুখ থেকে এ রকম অভিমত শুনলে আমরা ভাবতে বাধ্য হতাম। হতাম সোভিয়েট সাহিত্য একাডেমীর রায় শুনতে পেলে। বিংশতি পার্টি কংগ্রেসে সলোখভ যখন ষ্ট্যালিন আমলের সাহিত্যিকদের 'মৃত আত্মা' নামে অভিহিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, সাহিত্যসৃষ্টির নামে তাঁরা গাড়ী গাড়ী কাগজ নষ্ট করেছেন, তখন আমরা বিচলিত হইনি। বুঝেছিলাম, ষ্ট্যালিনবাদ সব কিছুর মতো দেশের সাহিত্যকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সাহিত্যের স্বাধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছিল সেই জন্যেই। সাহিত্য হারিয়েছিল গতিশীলতা।

কিন্তু ক্রুশ্চেভের আদর্শ ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নয়, সম্মিলিত নেতৃত্ব। সুতরাং কৈ এ ক্ষেত্রে ত তিনি বিজ্ঞ বিচারকদের মতামত আহ্বান করেন নি। বোধ হয় জৈব ক্ষুধা-তৃষ্ণার ঊর্ধ্বে মানুষের একটা মর্মগত পরম তৃষ্ণা আছে, এই

কথার মধ্যে তিনি বুর্জোয়া সংস্কৃতির গন্ধ পেয়েছেন এবং যেহেতু অপরাপর মানুষ ও সাম্যবাদী মানুষের মধ্যে তিনি একটা মৌলিক পার্থক্য দেখতে চান, সেই জন্যেই তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। বলা দরকার, এইখানেই মুক্তবুদ্ধি মানুষদের আপত্তি।

॥ ২ ॥

সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রথম স্থাপনার আমলে সাহিত্যে বুর্জোয়া ও সাম্যবাদীর বিরোধ একদিন প্রবল হয়েছিল। বিশ্বসাহিত্যের যেগুলো চির-স্বীকৃত ক্লাসিক্স, তার ওপর সেদিন নির্বিচারে নিষেধ প্রয়োগ করা হয়েছিল। হয়েছিল খোদ রুশ সাহিত্যের অনেক অবিস্মরণীয় বইয়ের ওপরও। দান্তে, সেক্সপীয়ারের সঙ্গে সেদিন গোগোল, লারমনতভ, টুর্গেনিভ, এমন কি চেকভও ছুঁৎমার্গের আওতায় পড়েছিলেন। খারকোভ কংগ্রেসে ম্যাক্সিম গোর্কীর কণ্ঠ প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল এই অবিবেচনার বিরুদ্ধে। তিনি বলেছিলেন, বিশেষ কালের বিশেষ প্রয়োজনকে স্বীকার করবেন নিশ্চয় সাহিত্যিক। কিন্তু সেই সাম্প্রতিকতাকে অতিক্রম করতে হবে তাঁকে, অতীতের সঙ্গে অনাগতকেও যুক্ত করতে হবে। এই জন্যেই সাহিত্যের রাজ্যে জাতে ঠেলাঠেলি চলে না, চলা উচিত নয়।

তারপর থেকে রাশিয়ায় নানা দিক-দেশের সাহিত্য মন্থনের উত্তম যেমন ব্যাপক হয়, স্বদেশের সাহিত্য বরণ এবং প্রচারের ব্যবস্থাও তেমনি হয় প্রচুর। তার ফলে রাশিয়ার সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যই অনুবাদের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। কে ইউক্রেণের, কে জর্জিয়ার, কে বেলোরাশিয়ার, কে তাজিকস্তানের, তা আমরা ভালো করে জানার সময় পাইনি। অথও রুশ সাহিত্য হিসাবেই তা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ভারতবর্ষের বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী সাহিত্যও এই ভাবে একদিন ভারতীয় সাহিত্য রূপে বিশ্বে প্রচারিত হবে, এই ছিল আমাদের স্বপ্ন। আর এই জন্যেই রাষ্ট্রকে আমরা কেউ কেউ সাহিত্যের অভিভাবকতা দেবার কথাও ভেবেছিলাম।

কিন্তু ভয় ছিল অনেকেরই এবং সে ভয় জাগিয়েছিল শুধু সদ্য বিপ্লবোত্তর রাশিয়া নয়, নাৎসী জার্মানীও। হিটলার তাঁর হারেনফোক বা মহান জাতি-

তন্ত্রের চিতাগ্নিতে ব্রেথ বেকথ, আর্ণস্ট টলার, টমাস মান এবং এরিয়া রেমর্কের রচনাবলী ভস্মসাৎ করেছিলেন। করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও রলাঁর রচনাবলী। মিউনিক ও ড্রেসডেনের আর্ট গ্যালারি থেকে গগাঁ, মাতিস ও পিকাসোর ছবি এনে রাজপথে বহ্ন্যুৎসব করেছিলেন।

সেদিন রলাঁ ক্ষোভ করেছিলেন এই বলে যে মধ্যযুগীয় হূণ বা তাতাররা, গথ বা ভ্যাণ্ডালরা গির্জা, গ্রন্থাগার ও চিত্রশালা বিধ্বস্ত করত, আজ বিংশ শতাব্দীর সভ্য ভ্যাণ্ডালরা ঠিক একই কাজ করছে। যাঁরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শান্তির পক্ষে, যাঁরা জাতিবিশেষের শ্রেষ্ঠতার চেয়ে সর্ব-মানুষের সাম্যকে বড় করে দেখেন, তাঁদের কণ্ঠরোধ করে এই কথাই কি প্রমাণ করা হচ্ছে না যে সামন্ত যুগ থেকে বিজ্ঞান যুগে এসেও মানুষ সমান বর্বর এবং সমান সংস্কৃতিদ্রোহী থেকে গেছে?

রলাঁ যে ক্ষোভ করেছিলেন প্রাক-মহাযুদ্ধ জার্মাণীর অবস্থা দেখে, সেই ক্ষোভ করেছেন আইনষ্টাইন, ম্যাকার্থী-প্রপীড়িত মার্কিন দুনিয়ার অবস্থা দেখে। ওপেনহাইমারকে বেইজ্জত করা হয়েছে, চার্লি চাপলিনকে খেদানো হয়েছে, হাওয়ার্ড ফাষ্ট ও পল রোবসনের পায়ে নিষেধের শিকল পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রোজেনবার্গ বৈজ্ঞানিক দম্পতির প্রাণদণ্ডের কথা না হয় আর না-ই বললাম। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছিল মস্তিষ্ক ধোলাই এবং প্রক্রিয়াটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে সমষ্টিবাদ আর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে অন্য জায়গায় তফাৎ যাই থাকুক, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার জায়গায় সবাই এক।

॥ ৩ ॥

এই জায়গায় আমরা ভরসা রাখছিলাম বিশেষ করে ষ্ট্যালিনোত্তর সোভিয়েটের ওপর। কিন্তু দুদিনস্তেভের বই সম্পর্কে বিষোদ্গার করে ক্রুশ্চেভ আমাদের হতাশ করেছেন। Not By Bread Alone যে সমস্যা তুলে ধরেছে, ভৌগোলিক পটভূমি তার যদিও রাশিয়া, লক্ষ্যস্থল কি পৃথিবীর সমস্ত দেশই নয়? যন্ত্রবিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার সঞ্চয়ে যে-সব দেশে মানুষ হয়েছে অসীম শক্তিমান, ঐশ্বর্যবান, তাদের জীবনে এসেছে স্থূল ইহসর্বস্বতা। বস্তুসম্পদ ও বাস্তব ক্ষমতার ব্যাপ্তিকেই তারা ভাবছে জীবন বলে। আর এই সমুন্নতি থেকে পেছিয়ে পড়েছে যারা, তাদের জীবনে এসেছে একটা হীনমন্যতা জনিত

উদ্‌ভ্রান্তি : মানুষের প্রতিভা এত সম্পদ সৃষ্টি করেছে, তবু আমাদের এই উঞ্ছ দশা কেন? এই দ্বিমুখী বিশ্বসমস্যাকেই ভাষা দিয়েছেন ডুদিনস্তেভ। এক দিকে সমস্যা Not By Bread Alone, শুধু পেটের ভাতে নয়, আর এক দিকে Not without bread also ভাত বাদ দিয়েও নয়! এত বড় একটা যুগ-দর্শনের মধ্যে ক্রুশ্চেভ দেখলেন শুধু সাম্প্রতিক সোভিয়েট শাসকদের বিদূষণ? এ থেকেই ওঠে সেই মৌলিক প্রশ্ন, রাষ্ট্রের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্কটা কি রকম হওয়া উচিত এবং তার গণ্ডী কত দূর যাওয়া উচিত? সমসাময়িক কালের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী থেকে বার বার এই প্রশ্ন করতে হয়েছে মানুষকে, আবার করতে হচ্ছে। বোধ হয় সংস্কৃতিমানদের এ দুর্ভাগ্য অদূরভবিষ্যতে দূর হবে না, যতই কেন না রাষ্ট্রসঙ্ঘ শিল্পী-সাহিত্যিকের স্বাধিকার মূলক চার্টার বা সনদ জারী করুন।

আসলে সাহিত্য ও সংস্কৃতিই হল সমাজ-শক্তির ঘনীভূত রূপ। তা অলক্ষ্যে চিন্তার বনিয়াদ গড়ে, ভাবের রাজ্যে ওলট-পালট ঘটায়, কর্মের পথে দেয় প্রত্যক্ষ প্রেরণা। এত বড় একটা শক্তিকেন্দ্র বেসরকারী এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিতান্ত সাধারণ মানুষের এক্তিয়ারে থাকবে এবং সেখান থেকে তাঁরা সমাজকে ভাঙবেন গড়বেন, এ কথা কোন দেশের রাষ্ট্রপতি, ধনপতি বা রণপতিরাই পছন্দ করতে পারেন না। অন্যান্য শক্তিকেন্দ্র, যেমন বেতার, সংবাদপত্র, শিক্ষায়তন, নাট্যমঞ্চ, ছায়াচিত্র, এই সবের মতো সাহিত্য, শিল্প-কলা এবং বিজ্ঞানকেও তাঁরা কুক্ষিগত করে নিতে চান। অবশ্য কোথাও সরাসরি, কোথাও আড়াল থেকে থাবা বাড়িয়ে। এ জায়গায় গণতন্ত্রী এবং সমাজতন্ত্রী দেশের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য শুধু একটা—মুনাফা ব্যক্তির, না সরকারের?

আমাদের দেশ অল্প দিন স্বাধীন হয়েছে। সাংস্কৃতিক আদম-সুমারীর সময় এখনো আসেনি তার। কিন্তু এর মধ্যেই মৃদু আকারে একটা সরকার-স্বীকৃত সাহিত্যিক, শিল্পী ও সঙ্গীতকারদের গোষ্ঠী সৃষ্টির উদ্যম চলতে সুরু করেছে। সরকারী প্রসাদ বণ্টনে, বৈদেশিক সফরের প্রতিনিধি নির্বাচনে, অথবা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচারিত পুস্তকের রচনা নির্বাচনে রাজনৈতিক মত-বাদের দিকে চোখ রেখেই যথাসম্ভব জাত বাছাবাছি সুরু হয়েছে। এরি ব্যাপকতর রূপ দেখা দিতে পারে একদিন, ভিন্ন মত বা আদর্শের সমর্থকদের

কণ্ঠরোধ এবং অনুবর্তীদের ছত্র-চামর ধারণ ও স্তুতিবাদন কর্মে নিয়োজিত করায়। এইখানে হুঁসিয়ারির প্রয়োজন।

আসলে সাহিত্য যুগের ফসল বটে, কিন্তু তার অস্তিত্ব যুগাতিক্রান্ত। তার এই সার্বভৌমিক বা সার্বকালিক সার্থকতা যদি নষ্ট হয় রাষ্ট্রযন্ত্রের চাপে, তাহলে মানব জাতির পক্ষে তা হবে চরম নৈতিক পরাভব। সেই পরাভবের পথ প্রস্তুত করবেন যিনি, তিনি মানব স্বাধীনতার মূলেই ঘা দেবেন। এই ঘা বরদাস্ত করবেন না দুনিয়ার কোন সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিসেবকই।

সাহিত্য ও স্বাধীনতা

আমাদের একশো নব্বুই বছরের রাজনৈতিক পরাধীনতার শেষ হয় ১৯৪৭ সালে। ১৯৬২ সালে আমাদের স্বাধীনতার বয়স হল পনেরো বৎসর। এই পনেরো বৎসরে বাংলা সাহিত্য জাতিকে নূতন সম্পদ কি দিয়েছে বা কিছু দিয়েছে কিনা এবং সে দান প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার দান কিনা, এ প্রশ্ন উঠতে পারে।

এই প্রবন্ধে এ প্রশ্নেরই দু-একটা দিক আলোচনার আলোয় তুলে ধরা হচ্ছে। সময় ও অবকাশ সমৃদ্ধ কোন লেখক বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনা করলে, তা নিঃসংশয়ে আমাদের সাহিত্য ও স্বাধীনতা, দুইয়েরই স্বরূপ উপলব্ধির সহায়ক হবে।

বলা দরকার যে রাজনৈতিক পরাধীনতা বাংলা সাহিত্যের অগ্রযাত্রার পথে প্রধান একটা প্রেরণা স্বরূপ ছিল। বলা যেতে পারে, উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য আমাদের আসলে দেশপ্রেমেরই সাহিত্য। জাতির সামনে পুরানো গরিমার চিত্র ফোটানো হয়েছে কাব্য ও নাটকের মাধ্যমে। সাম্প্রতিক দুর্দশার রূপটি আঁকা হয়েছে উপন্যাস, নকসা ও প্রহসনের সাহায্যে। বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধ্যান-ধারণার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে দেশবাসীর হাতে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে, তার দৃষ্টি ও মননশীলতার বিস্তার ঘটানোর জন্যে।

হয়ত এই সাহিত্যের সবটাই কালাতিক্রান্ত মহৎ সাহিত্য হয়ে ওঠেনি। বেশীর ভাগই সাময়িক প্রয়োজনের বরাত নিয়ে জন্মেছে এবং হাতে হাতে নগদ পাওনা নিয়ে বিদায় হয়েছে। তবু দেশের সামগ্রিক মনস্তত্ত্বকে এই নবযুগের সাহিত্যই স্বাজাত্য বোধে অভিষিক্ত করেছে এবং এই পথের অগ্রনায়ক হিসাবে আমরা স্মরণ করতে পারি রামমোহন বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার মাইকেল দীনবন্ধু ও বঙ্কিমকে।

রবীন্দ্রনাথেরও সাহিত্য জীবনের প্রথমার্ধ একান্ত ভাবে আশ্রয় করে থেকেছে জাতীয়তাকেই এবং জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে যেমন তিনি ভাষা দিয়েছেন তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে, তার দৈন্য ও পরাধীনতাকে তেমনি ভাষা দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে, কবিতায় ও গানে। দ্বিতীয়ার্ধে তিনি জাতীয়তার

সীমা এড়িয়ে নিজেকে ব্যাপ্ত করেছেন আন্তর্জাতিক মানুষের মহাকাশে। আর সেখান থেকেই সুরু হয়েছে আমাদের সত্যিকার আধুনিক সাহিত্যের জীবন। এই নবযুগের সাহিত্য জাতীয়তাকে অস্বীকার করে না, কিন্তু তাকে স্বীকার করে বিশ্ব-মানবতার অংশ হিসাবে।

রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে বিচিত্র পথে মন ও লেখনী চালানোর নিদর্শন পাওয়া যাবে। প্রকৃত প্রতিভাধর এবং যুগোত্তীর্ণ সাহিত্যের স্রষ্টাও তাঁদের ভেতরে আছেন, আবার সীমাবদ্ধ শক্তি ও কুশলী কলমের অধিকারী লেখকরাও আছেন। সব সুদ্ধ তাঁদের দানের পরিমাণ কম নয় এবং লক্ষ্য করার বিষয় যে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতায় গাঁট-ছড়া বেঁধেই সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন তাঁরা। প্রধান দু-জন এঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরী, যদিও নাম করা যেতে পারে আরো অনেক কবি ও সাহিত্যিকের।

বিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে নূতন সাহিত্যের জোয়ার এল দেশে, যা পরোক্ষভাবে জাতীয়তার মাটি ছুঁয়ে থাকলেও, প্রত্যক্ষভাবে চলে গেল অন্তর্লোক বিশ্লেষণের এলাকায়, অথবা রাজনীতিক সমাজ-চেতনা সৃষ্টির পথে। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ এবং মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এ শতাব্দীর জীবন ও মনন রাজ্যে যে বিপ্লব এনেছে, বাংলা সাহিত্যের প্রাণ-প্রবাহ তা থেকে দূরে সরে থাকতে পারে নি। সাহিত্যিকের সৃজনী মন চলে গেছে নোংরা মজুর বস্তীতে, অবজ্ঞাত পতিতা-পল্লীতে, চোর ডাকাত ভিক্ষুক গেঁজেল ও জুয়াড়ীর আড্ডায়।

মানুষকে সন্ধানের, তার অন্তর্লোক যাচাইয়ের এই প্রয়াস সাহিত্যের দ্বিমুখী (জাতীয়তা বনাম আন্তর্জাতিকতা চিহ্নিত) পথকে শতমুখে প্রসারিত করে দিয়েছে। কিন্তু যত বড় সৃষ্টি হলে এই অভিনব মাল-মসলা সার্থক ঐতিহ্য গড়তে পারত, তা হয়নি। প্রথমত লেখকদের জীবনবোধ ছিল সীমাবদ্ধ, কেননা বয়স ছিল অল্প এবং অভিজ্ঞতার চেয়ে পুঁথির সঞ্চয়ের ওপরই ভরসা রেখেছিলেন তাঁরা সব চেয়ে বেশী। দ্বিতীয়ত নিজের আদর্শ তাঁদের নিজেই তৈরি করে নিতে হয়েছিল, সামনে কোন পূর্বাচার্য ছিলেন না। তবু এঁরা স্মরণীয় নূতন যুগের লেখক।

এর পর সেই অধ্যায়, যে অধ্যায়ের কথা দিয়ে এই আলোচনা সুরু করেছি। অর্থাৎ স্বাধীনতা-পরবর্তী কাল। লক্ষ্য করার বিষয় যে এই সময়ে নূতন লেখা

সাহিত্য কিছু কিছু এসেছে, আজো আসছে, কিন্তু নূতন সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ লেখক এই সময়-সীমার মধ্যে বিশেষ কেউ দেখা দেননি। যাঁরা দিয়েছেন, তৃতীয় দশকের লেখকদের তুলনায় খুব বেশী শক্তি বা নিজস্বতার অধিকারী তাঁরা নন। সাময়িক চটুলতায় কেউ কেউ ঈষৎ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেও, অল্পদিনেই সে ঝুটা জৌলুষ ধরা পড়ে গেছে তীক্ষ্ণদৃষ্টি পাঠকের চোখে।

মুস্কিল হয়েছে যে তৃতীয় দশকের লেখকদলও এই সময়ের মধ্যে অনেকে বোধহয় বয়সের ধর্মেই হয়েছেন প্রতিক্রিয়াশীল। কারু কারু সৃজনীশক্তিও গেছে রীতিমতো বন্ধ্যা হয়ে। কেউ তাঁদের নিয়েছেন ধর্ম-ব্যাখ্যানের পথ, কেউ ধরেছেন দলগত রাজনীতির পতাকা। কেউ ছায়াচিত্রের স্বীকৃতি থেকে সাহিত্যের মর্যাদা নিরূপণে ব্যগ্র হয়েছেন। অর্থাৎ যে বৃহৎ বা মহৎ রবীন্দ্র-পরবর্তী সাহিত্য আশা করেছিল দেশ তাঁদের কাছে, তা অল্পই সার্থক হয়েছে। যদিও অবশ্য উৎকৃষ্ট গল্প কবিতা এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধ এঁদের হাত থেকে জন্মেছে নিতান্ত কম নয়। গণনীয় উপন্যাসও হয়েছে কিছু কিছু।

পুরানো দলের এই অবক্ষয় ও নূতন দলের অপ্রতিশ্রুতিই একটা শূন্যতার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। এই শূন্যতা পূর্ণ করে দেখা দিয়েছে রম্যরচনা নামক এক শ্রেণীর চারু গদ্য, যা গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ আত্মকথা ভ্রমণ দর্শন অনেক কিছুর ভগ্নাংশ নিয়ে গঠিত বর্ণাঢ্য সাংবাদিকতা ছাড়া কিছু নয়। বেশীর ভাগ লেখকই আজ এই পথে। কিছু সংখ্যক আবার হয়েছেন সমাজ-সজাগতার নামে শব-ব্যবচ্ছেদক। অর্থাৎ ধ্রুব সাহিত্য আজ শুধু দুর্লভ দর্শন নয়, তার প্রয়োজন সম্বন্ধেও মানুষ আজ হয়েছেন সন্দিহান।

বোধ হয় কল-কারখানা ও পায়কারি পণ্য উৎপাদনের যুগে এই হবে সাহিত্যের অবস্থা। তবে অনেকে ভেবেছিলেন, স্বাধীনতা দেশে নূতন জীবন ও সাহিত্য উজ্জীবিত করবে। বলা বাহুল্য, এটা একটু বেশী আশা করা হয়েছিল। দেশের দশ-আনা মাটি বিসর্জন দিয়ে অথচ ষোল-আনা পুরানো পাপ বজায় রেখে আমরা স্বাধীনতা নিয়েছি। সে স্বাধীনতার মধ্যে জীবন কোথায়, আশা কোথায় যে তা সুস্থ ও বৃহৎ সাহিত্যের প্রেরণা জোগাবে? পরাধীনতায় যে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা এসেছিল আমাদের, স্বাধীনতা তাকে নির্মূল করেছে এটা লজ্জার হলেও সত্যি কথা!

এশিয়ার সাহিত্য

॥ ১ ॥

দিল্লীতে কিছুকাল আগে যে এশিয়া সাহিত্যিক সম্মেলন হয়ে গেছে, তা সত্যিকার একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রায় দুই শতাব্দী কাল ধরে প্রতীচ্যের নানা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এশিয়ার দেশগুলির ওপরে চড়াও হয়েছিলেন। এক দিকে তাঁরা যেমন নির্মম হাতে প্রাচ্য মুল্লুক শোষণ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মধ্যে বিভেদের দেওয়াল খাড়া করে তুলে, এককে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। তার ফলেই প্রাচীন এশিয়ার সুমহান আত্মিক ঐক্য আধুনিক কালে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছিল।

অথচ এমন দিন ছিল যখন ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, চীন, জাপান, আরব, পারস্য পরস্পরের অতি নিকট-আত্মীয় ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য ও সামাজিক আদান-প্রদানে একে অন্যকে গভীর ভাবে প্রভাবান্বিতও করেছিল। ভারতের ব্রহ্মবাদ, চীনের তাও তত্ত্ব বা ইরাণের আন্‌ল হক তত্ত্বের মধ্যেই হক, আর ভারতীয়, চৈনিক, ইরাণীয় বা আরব্য শিল্প-রীতি ও ভাস্কর্য-পদ্ধতির মধ্যেই হক, যে নিগূঢ় গোত্রসম্বন্ধটি আজো দেখা যায়, পূর্ব এশিয়ার দ্বীপময় দুনিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির যে প্রাণ-প্রবাহটি আজো অনুসৃত দেখা যায়, তা আকস্মিক নয়। অন্তরঙ্গ আদান-প্রদান থেকেই তার জন্ম হয়েছিল। এই আদান-প্রদান সম্ভব হয়েছিল পর্যটক, শ্রমণ ও বণিকদের ব্যাপক আনাগোনার মাধ্যমে। দেশ ও দূরত্বের বাধা সেদিন ছিল দুরতিক্রম্য, তবু নিখিল এশিয়ার জীবন ও মনন-ধারায় একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা গড়ে উঠতে পেরেছিল।

এই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পরস্পরের মধ্যে পড়ে গেল অপরিচয়ের পর্দা, বিদেশী আক্রমণকারীদের জবরদস্তির ফলে। এশিয়ার রাজনৈতিক বন্ধনই ডেকে আনল তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতি, যার ফলে এশিয়া তার নিজস্বতা হারিয়ে প্রতীচ্যের অন্ধ অনুকৃতিকেই আত্মোন্নতির একমাত্র পথ বলে ভাবতে সুরু করল। এশিয়ার সম্পদে স্ফীত হয়ে ইউরোপ তার যন্ত্রদৃপ্ত আধুনিক সভ্যতার বনিয়াদ পোক্ত করল, আর হৃতসর্বস্ব প্রাচ্য দৈন্য ও গ্লানির গাঢ় অন্ধকারে আকর্ণ ডুবল। দুই শতাব্দীব্যাপী এশিয়ার শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি

তাই এক হিসাবে হয়েছে ইউরোপীয় মননশীলতার প্রতিধ্বনি স্বরূপ। তার নিজের স্বর অনেকটাই খোয়া গেছে।

সৌভাগ্যের কথা যে সেই দুর্যোগের কালো মেঘ কেটে গিয়ে এশিয়ার আকাশে আবার নূতন ঊষার অরুণাভাস দেখা দিতে সুরু করেছে। এশিয়ার অধিকাংশ দেশই আবার রাজনৈতিক স্বাধীনতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক জীবনেও অগ্রগামী দুনিয়ার সঙ্গে একতালে চলার প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে। এমন দিনে এশিয়ার বিভিন্ন দেশকে শুধু বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক-সূত্রে আবদ্ধ হলেই চলবে না, তাদের পরস্পরের মধ্যে বৃহত্তর ও মহত্তর মিলনের পথটিও প্রশস্ত করতে হবে। সে জন্যে চাই এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, শিল্পী ও সংস্কৃতি-নায়কদের পারস্পরিক সম্মেলন এবং এশীয় সাহিত্য সম্মেলন তার পটভূমি রচনা করেছে বলেই, নূতন এশিয়ায় তা বৃহত্তম ঘটনারূপে সকলের অভিনন্দনযোগ্য।

কিন্তু পরিকল্পনাটি মহৎ হলেও, শুধু বছরে একবার করে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেই উদ্দিষ্ট ফল লাভ করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, দীর্ঘ অপরিচয়ের ফলে পরস্পরের মধ্যে মনন ও চিন্তনে আজ এতটা দূরত্ব এসে পড়েছে, যার তুলনায় ইউরোপকেও অনেকখানি কাছের মনে হয়। আজকের শিক্ষিত এশিয়াবাসী গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, বৃটিশ, রুশ ও স্ক্যাণ্ডিনেভীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির যতটা খবর রাখেন, প্রতীচ্য রাজনীতি, অর্থনীতি, কলা-কৃষ্টি ও বিজ্ঞান প্রগতির সঙ্গে তাঁদের যতটা অন্তরঙ্গ যোগ আছে, তার শতাংশের একাংশও নেই বিভিন্ন এশিয়ান জাতি-গোষ্ঠীর সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে। ভারতবাসীর মধ্যে খুব বেশী অনুসন্ধিৎসু যাঁরা, তাঁরা হয়ত ইংরেজীর মারফৎ চীনের লিপো, তু-ফু, জাপানের হিতো-মারো, বাসো প্রভৃতির কবিতা পড়েছেন। পড়েছেন ইরাণের হাফিজ, সাদী, রুমি, জামী ও ওমর খৈয়ামের কবিতা। আর অতি অভিজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা হয়ত লাউৎজে, কংফুজে, জরথুষ্ট্র প্রভৃতির কিছু কিছু বৃত্তান্ত জানেন, জানেন আবেস্তা, তালমুদ, কোরাণ ও সুফীবাদের মোটামুটি কথাগুলো।

অবস্থা আমাদেরও যা, অন্যদেরও তাই। ঐ ইংরেজীর মাধ্যমেই বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মশাস্ত্র, কালিদাসের কাব্য-নাটক কিছু

কিছু পৌঁছেছে উচ্চ শিক্ষিতদের কাছে। আর পৌঁছেছে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও নেহেরুজীর টুকিটাকি, যেমন আমরাও পেয়েছি লু-স্থন, লিন উ-টাং, নোগুচি প্রভৃতিকে। কিন্তু বর্তমান এশিয়ার নানা দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধ্যান-ধারণার যে ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে, তার সম্বন্ধে যেমন তাঁরা তেমনি আমরা রয়েছি প্রগাঢ় অজ্ঞতার অন্ধকারে। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিকাসোর ছবি, এলিয়টের কবিতা এবং সার্তর-এর নাটক নিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি, কিন্তু আজকের চীনের কথা-সাহিত্য, জাপানের চিত্রকলা বা আরব ও পারস্যের কবিতা সম্বন্ধে আমরা কি জানি ? কি জানেন তাঁরা বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, তামিল ও তেলেগু ভাষার সম্পদ সম্বন্ধে ? কতটুকু বার্তা পেয়েছেন তাঁরা ভারতবর্ষের জীবন ও দর্শনের ?

এই দুস্তর দূরত্বের স্রোত পার হয়ে একে অন্যের হৃদয়ের কাছে, চিত্ত ও চিন্তার কাছে পৌঁছুতে হবে। কিন্তু কি উপায়ে ? বলা বাহুল্য নির্বাচিত ও নির্ভরযোগ্য অনুবাদই একমাত্র উপায়। ইংরেজ, ফরাসী, রুশ ও জার্মাণরা এই অনুবাদের অস্ত্রেই দুনিয়া জয় করেছেন। আমাদেরও অবহিত হতে হবে এই অস্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে। সমগ্র এশিয়ার পুরানো এবং নূতন চিন্তার সমৃদ্ধি পরস্পরের সামনে সুবোধ্য ও সহজলভ্য আকারে অবারিত করে দিতে হবে। ভাষার অবরোধ মুক্ত করে দিলে দেখা যাবে, ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পার্থক্য সত্ত্বেও, এশিয়ার মনের তন্ত্রী প্রায় একই সুরে বাজছে। আর সে সুরের নিজস্বতাটুকু আজো একেবারে খোয়া যায় নি। তা থেকে বিভ্রান্ত ইউরোপও নূতন প্রেরণা পেতে পারে।

সেই বৃহত্তম উদ্যোগের প্রস্তুতি হিসাবে এশিয়ার এই সাহিত্যিক সম্মেলন আত্মপ্রকাশ করেছে, এ খুবই আনন্দের কথা। এশিয়ার মোট সতেরোটি দেশের সাহিত্যিক প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন, অনেশীয় দুনিয়ার পর্যবেক্ষক প্রতিনিধিও এসেছিলেন বেশ কয়েক জন। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা ত ছিলেনই। উল্লেখযোগ্য অভ্যাগতদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে চীনের মাও তুং, ব্রহ্মের থিয়েন পে-মিণ্ট, কোরিয়ার হাল-সুলইয়া, ইরাণের সৈদ নফিসি। এশিয়াভুক্ত রাশিয়ার কয়েকজনও ছিলেন। এঁরা একদিকে যেমন নিজ নিজ দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার আলোয় সাহিত্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা

করেছেন, তেমনি সর্ব-এশিয়ার দৃষ্টি ও মননশীলতায় ঐক্য বিধানের উপায় নিয়েও চিন্তা করেছেন। এই শেষোক্ত ব্যাপারটি কার্যকরী করার জন্যে একটি কর্মপরিষদ গঠিত হয়েছে, যার সভাপতি হয়েছেন সিংহলের আনন্দ এবং সদস্যমণ্ডলীতে আছেন প্রায় সব দেশেরই এক-এক জন সাহিত্যিক-প্রতিনিধি।

এতগুলি জ্ঞানী, গুণী ও চিন্তাশীল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং শুভ বুদ্ধির ফল যে ভাবী এশিয়ার পক্ষে নূতনতর কল্যাণের সূচনা করবে এবং খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রবাহিত এশিয়ার সংস্কৃতি-সাধনা যে এক অখণ্ড নব জাগরণে রূপান্তরিত হয়ে নিখিল এশিয়ায় নূতন দিনের অবতারণা করবে, এই আশা নিয়েই সম্মেলনকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

॥ ২ ॥

সম্মেলনে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি যে বক্তৃতা দেন, একাধিক কারণে তা বিশেষ মূল্যবান। তিনি বলেন, সাহিত্যিকদের এই সংহতি যদি শেষ পর্যন্ত একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীতন্ত্রে পরিণত হয়, তাহলে তা দুঃখের বিষয় হবে। সাহিত্যস্রষ্টারা সমাজেরই মানুষ, সে হিসাবে সমাজাশ্রিত রাজনীতি থেকে তফাতে থাকা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। সঙ্গত কি না তা-ও সন্দেহ। কিন্তু সাহিত্যকে নিছক রাজনীতির হাতিয়ার করে তুললে, তাতে সাহিত্যেরও ক্ষতি হবে, সমাজেরও লাভ হবে না। সাহিত্য সর্বজনের জন্যে। মতবাদের বেড়া তুলে তাকে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করলে, সাহিত্যের আদি উদ্দেশ্যই নিষ্ফল হয়ে যায়। আজকের পৃথিবীতে কথাটা মুক্ত বুদ্ধি ও পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে ভেবে দেখা দরকার। কারণ জীবন ও কর্মের আর সব ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যেও আজ মতবাদের বিরোধ এত প্রবল হয়েছে যে পৃথিবীর সব দেশেই আজ সত্যিকার বড় সাহিত্য যা রচিত হচ্ছে, তার চেয়ে ঢের বেশী হচ্ছে সাহিত্য-কলহ।

সাহিত্যিকের স্বাধীনতা সম্পর্কীয় প্রস্তাবটির আলোচনা করলে দেখা যাবে, এই সম্মেলনেও সেই কলহ কিছুটা ছায়া ফেলতে কসুর করেনি। বাদানুবাদে এক পক্ষ বলেন, সাহিত্য শুধু চিত্ত-বিনোদন বা প্রমোদ-পরিবেশণের বাহন নয়, তার উদ্দেশ্য আছে, সে উদ্দেশ্য হল লোককল্যাণ। মানুষের দুঃখ-ব্যথাকে

সাহিত্য ভাষা দেবে, দৈন্য ও শোষণ, অন্যায় ও অনাচার থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্যে সাহিত্য করবে সংগ্রাম। অন্য পক্ষ বলেন, সমাজ কল্যাণ সাহিত্যের লক্ষ্য হতে পারে, কিন্তু তাই একমাত্র লক্ষ্য নয়। সাহিত্যস্রষ্টার জন্যে যদি এইটুকুর মধ্যেই চলা-ফেরার সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, আর সে চলা-ফেরা যদি নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনৈতিক খপরদারীতে, তাহলে সাহিত্য ফরমায়েসী পণ্যে পরিণত হবে এবং শিল্পগুণ ভ্রষ্ট সেই সাহিত্য সাংবাদিকতার মতোই উৎপাদন-মূলক শ্রমের পর্যায়ে নেমে আসবে। কাজেই সাহিত্যের সমুন্নতির জন্যেই চাই সাহিত্যিকের সর্বাত্মক স্বাধীনতা।

বলা নিষ্প্রয়োজন, আজকের দুনিয়ায় সর্বাত্মক রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ বনাম তথাকথিত গণতান্ত্রিক স্বাধিকার এবং তার ফলাফল নিয়ে যে তর্ক সব ক্ষেত্রেই মাথা তুলেছে, সাহিত্যিকের স্বাধীনতা সম্পর্কীয় এই বিবাদেও তা-ই প্রতিফলিত হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তাই পাশ কাটিয়ে আপোষ-রফা করে লাভ হবে না। বরং সমস্যাটাকে সব দিক থেকে খতিয়ে দেখাই ভালো। একথা অবশ্য কেউ অস্বীকার করবেন না যে জার আমলে রাশিয়ায় যে বিরাট সাহিত্য হয়েছে, বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় দু-এক জন ছাড়া কোন সাহিত্যিকই তার ধারে-কাছে পৌঁছুতে পারেন নি। পুস্কিন, লারমনতফ, টুর্গেনিভ, গোগোল, ডষ্টয়েভেস্কী, চেকভ ও টলষ্টয়ের পাশে এক গোর্কী এবং সলোখব ছাড়া আর কারুকেই নিঃসংশয়ে স্থান দেওয়া যায় না। স্বয়ং রুশরাই বিংশতি পার্টি কংগ্রেসে সোভিয়েট সাহিত্যিকদের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে এই কথা কবুল করে নিয়েছেন।

কিন্তু সর্বাত্মক রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণই কি এজন্যে দায়ী? যে-সব দেশে সমষ্টিবাদী শাসন নেই, 'মুক্ত দুনিয়া' নামেই যাঁরা নিজেদের উচ্চকণ্ঠে চিহ্নিত করেন, তাঁরাও কি কেউ ঊনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের প্রথম দুই দশকের সমস্তরের সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারছেন? কামুর নভেল, জ্যাক প্রেভার ও পল এলুয়ারের কবিতা বা সার্তর-এর নাটক কি ভার্লেন, বদলেয়ার, মালার্মে, আনাতোল ফ্রান্স ও রলাঁর রচনার পাশে দাঁড়ানোর যোগ্য? লরেন্স, শ, গ্যালসওয়ার্দী, য়েটস বা ব্রিজেসের সমপর্যায়ে কি এলিয়ট, পাউণ্ড, অডেন ও স্পেণ্ডারকে নির্ভয়ে বসানো যায়? রবীন্দ্র-শরৎ অধ্যায়ের পর বাংলার সাহিত্যও কি সমান সমৃদ্ধ বলে গণ্য হতে পারে?

কাজেই সমষ্টিবাদ বনাম স্বাধিকারবাদের ছকে ফেলে সমস্যাটাকে ঘোলা করে ফেলায় কোন লাভ নেই। জিনিষটাকে আর একটু তলিয়ে বুঝতে হবে। আসলে এ যুগের জীবন ও মনন-ধারার মধ্যেই মূলগত একটা পরিবর্তন ঘটেছে, যার ফলে পৃথিবীর কোন দেশেই ঠিক পুরানো নিরিখের মহৎ সাহিত্য লেখা হচ্ছে না। যে হিসাবে রামায়ণ, মহাভারত মহৎ সাহিত্য, ফের্দৌসী ও ও হাফেজের বা কালিদাস ও ভবভূতির রচনা মহৎ সাহিত্য, দান্তে, সেক্সপীয়ার, গ্যেটে, ভিক্তর হুগো বা বঙ্কিম, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথের রচনা মহৎ সাহিত্য, সে হিসাবে সাম্প্রতিক কালের কার রচনা সমান মূল্যের দাবীদার? পার্ল বাক, হেমিংওয়ে, জিদ, মারিয়াক, সিলান পা, জেনসন···কার? ঘরের কোন নাম আর না হয় না-ই তুললাম!

প্রকৃত পক্ষে বস্তু-বিজ্ঞানের অপরিসীম উন্নতির ফলে গত তিন-চার দশকের ভেতর দুনিয়ায় উৎপাদন ও গতির রাজ্যে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে, দেশ-কালের ব্যবধান ও প্রকৃতির বহু বিচিত্র বাধা জয় করে মানুষ সভ্যতার এমন একটা অধ্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে তার পুরানো কল্পনা ও আবেগ-অনুরাগের সৌধ আর আপন রহস্যময় মহিমায় মাথা খাড়া করে থাকতে পারেনি। তারপর দু-দুটো বিশ্বগ্রাসী মহাযুদ্ধও দিয়েছে তার সমস্ত ধ্রুবমূল্যের নিরিখ আগাগোড়া চুরমার করে। মানুষ দেখছে, তার জীবন ধনপতি ও রণপতিদের হাতে নিতান্তই খেলার বস্তু হয়ে পড়েছে। শিল্প-প্রগতির নামে তাকে নির্মম ভাবে শোষণ এবং দেশগৌরবের নামে পায়কারি হারে নিধন করাতেই তাঁরা বিজ্ঞানকে পূর্ণভাবে নিয়োজিত করছেন। এই রোগজীর্ণ মানসিক পটভূমিতে মানুষের চিন্তা, কল্পনা শ্রেয়বোধ, সবই খেই হারিয়ে ফেলেছে। অতীতের সঙ্গেও তার যোগ নেই, ভবিষ্যতের দিকেও তার আশাপ্রদ গতি নেই। সব কিছুই তার কাছে হয়েছে ভঙ্গুর, অসংলগ্ন, ধোঁয়াটে। এই পটভূমিতে পিকাসো, মাতিসের ছবি, এলিয়ট, পাউণ্ড, কামিংস-এর কবিতা, জয়েসের উপন্যাস ও সার্তর-এর নাটকই ত প্রত্যাশিত।

এই বনিয়াদের ওপর কি সেক্সপীয়ার, গ্যেটে. শেলী বা রবীন্দ্রনাথের ইমারত দাঁড়াতে পারে? মানুষের এই ভাবিক অবক্ষয় লক্ষ্য করেই এ যুগের বাস্তববাদী দার্শনিকরা সাহিত্যের জন্যে একটি উপযোগিতার মাপকাঠি ধার্য করেছেন, তা হল তথাকথিত সমাজ কল্যাণের লক্ষ্য। সাধারণ ভাবে

লক্ষ্যটি মহৎ, কিন্তু কিছু সংখ্যক শিল্পী ও সাহিত্যিক এই লক্ষ্যকে সার্থক সৃষ্টির মধ্যে রূপায়িত করলেও (তাঁদের মধ্যে গোর্কী, কুপরিণ, এলেক্সী টলষ্টয়, এরেনবুর্গ ও সলোখবের নাম উল্লেখযোগ্য), বেশীর ভাগই উদ্দেশ্যের লৌহ-কাঠামোতে বন্দী হয়ে শিল্পকে গৌণ এবং প্রচারকে মুখ্য করে তুলেছেন।

অর্থাৎ এক তরফে প্রচারণা ও অন্য তরফে হেঁয়ালি, এই হয়েছে সাম্প্রতিক সাহিত্য-কর্মের কুললক্ষণ এবং যেহেতু এই সাহিত্য স্বাভাবিক আবেগে মানুষ মেনে নিচ্ছেন না, তাই হয় দর্শনের দোহাইয়ে, নয় রাজনীতির দোহাইয়ে তাকে চালানো হচ্ছে। ফলে ছায়াবাদ, সমাজবাদ, নানা বাদের বিবাদে সাহিত্য-জগৎ তোলপাড় হতে সুরু করেছে। এই বিবাদের অনুরণন সব দেশের মতো আমাদের দেশেও এবং নয়া দিল্লীতেও তারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল: সাহিত্য কিসের জন্যে? অন্নবস্ত্র, বাসস্থান, জীবিকা ও ন্যায্য সামাজিক অধিকারের সংগ্রামে মানুষকে সহযোগিতা দেবার জন্যে, না, মানুষের বৃহত্তর কামনা, কল্পনা, ব্যথা ও তৃষ্ণাকে ভাষা দেবার জন্যে? অর্থাৎ সাহিত্যের ভিত্তি সাম্প্রতিকতা, না চিরন্তনতা?

এ বিবাদের মীমাংসা হয় নি। অবশ্য একথা ঠিক যে জীবন থেকেই সাহিত্যের উদ্ভব, তাই বাস্তবের মাটির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবেই। যেহেতু সাহিত্যিকও সমাজের মানুষ, তাই সমাজের বাস্তব সংস্থিতি থেকে ষোল-আনা বিমুক্ত হয়ে নিছক সৃষ্টির স্বপ্নে বুঁদ হয়ে থাকার সুযোগ তাঁর কোথায়? এই বিজ্ঞান তথা রাজনীতি-সর্বস্ব যুগে তা সম্ভবই নয়। দুঃখের বিষয়, সর্বাঙ্গীন সুস্থ সমাজ দুনিয়ার কোন দেশেই নেই। কোন-না-কোন আকারের অসুস্থতা দেখা যাবে সর্বত্রই। তাই যে দেশের জীবন-সঙ্কট যে রকম, সে দেশের সাহিত্যে তার কিছু-না-কিছু ছায়াপাত হবেই। কিন্তু এই টুকু গণ্ডীর মধ্যেই সাহিত্যিক সীমাবদ্ধ থাকবেন, না তাকে আশ্রয় করে বৃহত্তর সত্যের সন্ধানই হবে তাঁর সাধনা? বোধ হয় শেষোক্তটাই।

কিন্তু সেই ধ্রুবপদী সাহিত্য হচ্ছে না আজ কোথাও। কোন দেশ তাকে কামনাও হয়ত করছে না ভালো করে। সমষ্টিবাদী দেশ ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সাংবাদিকতার মতো সাহিত্যকেও রাষ্ট্রশক্তির তাঁবেদার করেছেই, গণতন্ত্র-বাদী দেশও মস্তিষ্ক ধোলাই নামক প্রক্রিয়ার কৌশলে চ্যাপলিন, হাওয়ার্ড ফাষ্ট, ওপেন হাইমারের গলা টিপে ধরতে কার্পণ্য করছে না! হিটলারী

স্বৈরাচারের ইতিহাস ত পুরানোই হয়ে গেছে। কাজেই সাহিত্যিকের স্বাধীনতা চাই, আর তা চাই জীবনের জন্যে, সভ্যতার জন্যে। সাহিত্যিক জীবনের বাস্তব দুঃখ-বেদনা ও আঘাত-অবমাননাকে নিশ্চয় ভাষা দেবেন। কোন যুগেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যা তা জীবন-বিমুখ ছিল না, কিন্তু দুঃখোত্তীর্ণ চিরন্তন মনুষ্যত্বের বাণীও শোনাতে হবে তাঁকে। কারণ শুধু ডাল-ভাতের গণ্ডী দিয়েই ঘেরা নয় মানুষের জীবন, শুধু জৈব চরিতার্থতার চৌহদ্দিতেই আবদ্ধ নয় তার মনন-শীলতা। সেই সুস্থ ও মহৎ সাহিত্যের জন্যে চাই সুস্থ ও প্রাণবন্ত সমাজ, যার আকাঙ্ক্ষাই আজ মানুষের সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা। এশিয়া সাহিত্য সম্মেলন সেই আকাঙ্ক্ষাকেই ব্যক্ত করেছে।

সংস্কৃত নাটকের প্রেম

সংস্কৃত ভাষায় নাটকের সংখ্যাও যেমন কম নয়, তার বৈচিত্র্যও তেমনি কম নয়। অতি বিখ্যাত কয়েকখানি নাটক নিয়ে অল্প একটু আলোচনা করলেই স্পষ্ট হবে বিষয়টা। বেণী-সংহারে ভট্টনারায়ণ দেখিয়েছেন, অপমানিত নারীত্বের প্রতিশোধ কেমন করে নিতে হয়। নাগানন্দে শ্রীহর্ষ এঁকেছেন মাতৃ-মুক্তিকামী এক বীর সন্তানের মহনীয় চিত্র। বিশাখদত্ত দেখিয়েছেন হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘাত তৎকালীন রাজনীতিতে ঘটিয়েছে কি বিচিত্র ভাঙাগড়া, তাঁর মুদ্রারাক্ষসে। মৃচ্ছকটিকে শূদ্রক চিত্রিত করেছেন এমন এক অত্যাশ্চর্য নটীকে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে যিনি সর্বজনমান্যা হতে পেরেছেন। ভবভূতির উত্তররাম চরিতে ফুটেছে অনুপম দাম্পত্য-প্রেমাশ্রিত গার্হস্থ্য জীবনের ছবি। বিক্রমোর্বশীতে কালিদাস মূর্ত করেছেন পার্থিব ও অপার্থিব প্রেমের তুলনাত্মক এক মধুর অনুভূতিকে।

এত বিচিত্র দিক থেকে জীবনকে দেখা ও ফোটানোর দৃষ্টান্ত এক বিশ্ববিজয়ী সেক্সপীয়ার ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন দেশের নাট্যকারের পক্ষেই সম্ভব হয় নি। কিন্তু সেক্সপীয়ার যখনকার কবি, তখন ইউরোপে সুরু হয়েছে রেনেসাঁস। ইউরোপের নবজাগ্রত প্রতিভা সেদিন মধ্যযুগের মোহনিদ্রা কাটিয়ে দুনিয়ার দিক-বিদিকে পাড়ি জমিয়েছে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে মানুষের মননশীলতা সেদিন অসীম গুপ্ত ঐশ্বর্যের সন্ধান পেতে সুরু করেছে। সেই জাগ্রত দিনের পটভূমিতে সেক্সপীয়ারের জন্ম অলৌকিক হলেও অসম্ভব নয়। পক্ষান্তরে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্য খৃষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী থেকে যাত্রা সুরু করে, অষ্টম-নবম শতাব্দীর মধ্যেই প্রায় সমাপ্তির কিনারায় পৌঁছেছে। এক গ্রীক-ল্যাটিনে ছাড়া ইউরোপে সেদিন গভীর জ্ঞানের বস্তু কোথাও ছিল না। কাজেই সেক্সপীয়ারের সঙ্গে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনা করলে, তা হবে গুরুতর কালাতিক্রমণ দোষের নিদর্শন।

কিন্তু সে আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কথাটা উঠল শুধু সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের বস্তু-বৈচিত্র্য বোঝানোর জন্যে। অবশ্য জগৎ ও জীবন-রহস্যের নানা দিকের রূপায়ণ যতই থাকুক সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে,

তাতে প্রধান ও প্রথম স্থান নেয় প্রেমই এবং সে-প্রেম শেষ পর্যন্ত বিবাহে এসেই পর্যবসিত হয়। আর এই প্রেমের অবতারণায় অলঙ্কার শাস্ত্রানুমোদিত কতকগুলি গতানুগতিকতার ছকও প্রায় সব কবিই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেন। তা সত্ত্বেও প্রকৃত সৃজনী-প্রতিভার অধিকারী কবিরা যে কতটা কৃতিত্ব ও কলা-কৌশল দেখিয়েছেন, পদে পদে যে কি আশ্চর্য রসসৃষ্টি করেছেন, তা ভাবলে বিস্ময় লাগে। এই প্রেমতত্ত্বের কয়েকটা দিক নিয়েই উপস্থিত আলোচনা করা যাচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার যে আমাদের আলোচনা অল্প কয়েকখানি নাটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অধিকতর অবসর ও সুযোগ হলে, এ বিষয়ে বারান্তরে আলোচনা করব।

প্রেমাত্মক নাট্যকাব্য হিসাবে কালিদাসের শকুন্তলা বিশ্ববিখ্যাত হলেও, আমার মতে বিক্রমোর্বশীই তাঁর সর্বোত্তম রচনা। স্বর্গের অপ্সরী উর্বশী দৈত্য-কবল থেকে মুক্তি পেয়ে একদিন মর্ত্যের মানুষ পুরূরবার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এই আকর্ষণ তাঁকে করল শাপগ্রস্ত ও স্বর্গভ্রষ্ট। স্বর্গচ্যুত অপ্সরী ধরা দিলেন মরণশীল মানুষের কাছে। তারপর মর্ত্যের অনিবার্য দুঃখ-দুর্ভাগ্য তাঁর সৌভাগ্যের পথে সৃষ্টি করল দুরতিক্রম্য বিচ্ছেদের ব্যবধান। কুমার বনে প্রবেশ করে উর্বশী পরিণত হলেন লতায় এবং শাপান্তে যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন পুরূরবার কাছে, তখনই শেষ হল তাঁর মর্ত্যবাসের মেয়াদ। ক্ষণমিলনের স্মারক একমাত্র পুত্রকে আকাঙ্ক্ষিতের হাতে তুলে দিয়ে স্বর্গের অপ্সরী আবার চলে গেলেন স্বর্গে।

এই যে নাট্য কাহিনী, এর কাহিনী-অংশ অপসারিত করলে পাওয়া যায় একটি মহান তত্ত্ব, তা হল এই যে, স্বর্গের প্রেম মর্ত্যের মাটিতে কোনদিন বাস্তব মূর্তিতে ধরা দেয় না। বিরহের মহাকাশেই মিলনের স্বপ্ন বেঁচে থাকে অম্লান দ্যুতিতে, যদিও দুর্বল মানুষের কামনা সেই প্রেমকে জীবন্ত ও জাগ্রত সত্য রূপে পেতে চায়। এই তত্ত্বটি কালিদাস শকুন্তলা নাটকেও রূপায়িত করেছেন। সেখানেও বিরহিনী শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের মিলন হয়েছে পৃথিবী থেকে বেরিয়ে, কল্পনার স্বর্গলোকে গিয়ে।

প্রেমের এই উচ্চ গ্রামটি অন্য নাট্য-কবিরা সামান্যই স্পর্শ করেছেন। তাঁদের প্রেমে আছে কলহ, কাপট্য, আছে দূত ও দূতী নিযুক্ত করে প্রেমিকাকে আয়ত্ত করা, আছে সপত্নী-বিদ্বেষ এবং বিভিন্ন কবির রচনায় এ বিষয়ে এমন একটা

বিষয়-সাদৃশ্য বিগুমান, যা সময় সময় ভারী একঘেঁয়ে লাগে। সমস্ত নাটকেই নায়ক রাজা, তিনি বহুবল্লভ, কিন্তু পারিবারিক জীবনে সুখী নন। ঘটনাচক্রে নায়িকা তাঁর দৃষ্টিপথবর্তিনী হন। তখন পূর্ববর্তিনীদের মৃৎপাত্রের মতো উপেক্ষা করে তিনি ধাবিত হন নবীনার দিকে এবং নানা ছলে অবশেষে তাঁকে লাভ করেন। এই আহরণের পথে বিদূষক, কুট্টনী প্রভৃতি তাঁকে করে প্রভূত সাহায্য এবং প্রথমে জ্যেষ্ঠা মহিষী যতই কুপিতা হন, শেষপর্যন্ত তিনি ব্যাপারটা মেনে নেন এবং স্বামীকে নবীনার হস্তে সমর্পণ করে দিয়েই সতী-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেন। মালবিকাগ্নিমিত্র, রত্নাবলী প্রভৃতি বহু বিখ্যাত নাটকে এই একই গল্পধারা অনুসৃত হয়েছে। প্রথমটিতে গণদাস ও হরদত্ত দুই নাট্যাচার্যের দ্বন্দ্ব ও সেই সুযোগে নর্তকীরূপে মালবিকার আবির্ভাব এবং দ্বিতীয়টিতে যাদুকর নিষ্পন্ন কৃত্রিম অগ্নিকাণ্ডের গণ্ডগোলে রত্নাবলীর আবির্ভাব নাটকীয় সংস্থিতির দিক থেকে একটু অভিনব হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আনুষঙ্গিক আর সব দিকেই রয়েছে সেই ক্লান্তিকর গতানুগতিকতা, যা আজকের পাঠককে নিশ্চয় তৃপ্ত করবে না।

এই ছকে যা সবচেয়ে পীড়াদায়ক, সে হল নারীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কবিদের সুগভীর ঔদাসীন্য। প্রবৃদ্ধ বয়স্ক ও পুত্র-কন্যা পরিবৃত রাজা অনায়াসে জ্যেষ্ঠা সহধর্মিনীকে উপেক্ষার অন্ধকারে বিসর্জন দেন। সেই অপমানিত নারীত্বের রূপটি নাটকে ফোটে না। সুন্দরী কিশোরী বহুবল্লভের আহ্বানে বিনা দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করেন, কোথাও অনভিরুচি জনিত প্রত্যাখ্যানের ঘটনা ঘটে না। ক্রীড়নক বা তৈজসের মতো নারীর রূপ ও যৌবন শুধু পুরুষের বিলাসকে চরিতার্থ করে, তার কাছ থেকে মর্যাদাময় স্বীকৃতির গৌরব লাভ করে না। সেই মহান প্রেম কোন ক্ষেত্রেই ভাষা পায় না, যা পেয়েছে একমাত্র বিক্রমোর্বশীতে এবং কতকটা ভবভূতির মালতী-মাধবে।

আজকের দিনে দুটি কুমার-কুমারীর (এবং তারা রাজা নয়, যোদ্ধা নয়, সাধারণ সংসারী মানুষ) যে প্রেমকে আমরা দেখতে ও খুঁজতে অভ্যস্ত, সংস্কৃত নাটকে তার রূপ দুর্লভ। তাতে শুধু রাজকীয় প্রেম এবং তার পিছু পিছু সিপাহী-শান্ত্রী, দৌবারিক এবং ইতর জনের বারবণিতা-বিলাসের বিস্তৃত কাহিনী আছে। আছে রাজ-অন্তঃপুরের পরিচারিকাদের সঙ্গে রাজানুগৃহীত অপদার্থদের অসুন্দর ইয়ার্কির বিবরণ। আর আছে ভ্রষ্টা বা অর্ধ-ভ্রষ্টা নারীদের পরস্পরের

মধ্যে ঈর্ষ্যা, অসূয়া ও কুশ্রী কলহের চিত্র। এই বাঁধা ছকের মধ্যেই দৈবানুগ্রহের মতো বহুবল্লভা বসন্তসেনা নারীত্বের একক গরিমায় দীপ্ত শিখার মতো হঠাৎ জ্বলে উঠেছেন। মৃচ্ছকটিকে সেই মনোরম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের রূপটি পাওয়া যাবে। কিন্তু সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে বসন্তসেনারা সহজলভ্যা নন, রত্নাবলী ও মালবিকারা এক দিকে, অন্য দিকে হংসপদিকা ও গুণবতীরাই কাব্যের ভুবন ভরে আছেন।

আগেই বলেছি যে গুণবতী বা হংসপদিকারা নবাগতাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এঁটে উঠতে পারেন না। কিন্তু তা নিয়ে তাঁরা শুধু মনানলেই দগ্ধ হন, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব নিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারেন না। অর্থাৎ ব্যক্তিত্বময়ী নারী রূপে বসন্তসেনাই একমাত্র ব্যতিক্রম, যেহেতু প্রচলিত সতী নারীরূপে চিহ্নিতা নন তিনি। আর ভাসের মধ্যম-ব্যায়োগ একাঙ্ক নাট্যে আর এক রকমের ব্যক্তিত্বময়ী নারী হলেন রাক্ষসী নামে অভিহিতা ঘটোৎকচ জননী হিড়িম্বা। হিড়িম্বার পারণ উপলক্ষে পুত্র ঘটোৎকচ নিয়ে এল অনুপম ভক্ষ্য হিসাবে এক বলিষ্ঠদেহ মানুষকে বন থেকে ধরে। হঠাৎ আবিষ্কার করলেন হিড়িম্বা যে ধৃত মানুষটি আর কেউ নন, তাঁরই স্বামী ভীমসেন। সলজ্জ প্রণামে পুনর্মিলিত হলেন তিনি স্বামীর সঙ্গে এবং বললেন, দূরে বা নিকটে, সুখে বা দুঃখে আমি চিরদিন তোমারি আছি। তবু তোমার অমিত কীর্তিময় জীবনকে আমি বাঁধিনি ঘরের বাঁধন দিয়ে, কেন না বন্ধনকে নিজেও আমি গ্রহণ করি নি কাম্য বস্তু হিসাবে। মুক্ত মানবাত্মার ঘোষণা হিসাবে এই রকম একটি উক্তি সংস্কৃত সাহিত্যে আর কোন নারীর মুখেই পাওয়া যাবে না। তারা সবাই পুতুল, পুতুল-নাচের পুতুল!

এই সূত্রে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে, শুধু নাট্য সাহিত্য কেন, কাব্য সাহিত্যেও, প্রেম দেহ-ধর্মের গণ্ডী ছাড়িয়ে আত্মিক গভীরতার স্তর স্পর্শ করে কদাচিৎ। কবিরা রূপ-লাবণ্যময় দেহ-মিলনের বিচিত্র অবস্থাকেই প্রাধান্য দেন। দেহের আড়ালে রয়েছে যে-মন, যে-মন রহস্যের লীলানিকেতন স্বরূপ, তার ওপর তাঁরা বরাবরই সব দরজা বন্ধ করে রাখেন। দু-একবার মাত্র কালিদাস এই দরজা খুলেছেন। যেমন শকুন্তলায় একবার, যখন তিনি বলছেন, সুন্দর জিনিষ দেখলে, মধুর শব্দ শুনলে, সুখী ব্যক্তির চিত্তও কেমন যেন অজানা বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এ কি

তাহলে যে জন্মের কথা মনে নেই, সেই জন্মের কোন হারানো সম্পর্কের স্মৃতি? কিন্তু প্রেমের এই সূক্ষ্ম ও অন্তর্গূঢ় রসানুভূতির সুরটি সংস্কৃত নাটকে পাওয়া যায় না বললেই চলে! যা পাওয়া যায়, তা হল স্থূল জৈব-কামনার অভিব্যক্তি এবং তা সংযমমুক্ত, শালীনতামুক্ত বন্য অশ্বের মতো অবিরাম দাপাদাপি করেই শিল্পায়তন মুখরিত করে তোলে। প্রেমোন্মাদনার এই পৌনঃপুনিকতাও বিষয়-বস্তুর একঘেঁয়েমির মতোই সময় সময় নিতান্ত ক্লান্তিকর লাগে। অবশ্য বলা বাহুল্য যে তা সত্ত্বেও নারীর রূপ-লাবণ্য বর্ণনায়, প্রকৃতির শোভা-সুষমা বর্ণনায়, সর্বোপরি চতুর ও অলঙ্কার-নিপুণ বক্তব্যের অবতারণায় কালিদাস ভবভূতি প্রমুখ কবিরা এমন মায়াজাল সৃষ্টি করেন যে এই সব ত্রুটি রসিক পাঠকের চোখে সব সময় ধরাই পড়ে না।

মোটের ওপর দেড় হাজার থেকে বারো শো বছর আগে ভারতবর্ষের বরেণ্য কবিরা লিখেছিলেন যে নাট্য সাহিত্য, তাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও কৃত্রিমতার সঙ্গেই সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যও কম নেই। যদিও আজকের নিরিখে বিচার করলে, এই সব নাটকে মঞ্চ-জ্ঞানের অনেক অভাব পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে বস্তু-সংসার ও বাস্তব জ্ঞানের অনেক অভাব, তবু এ সাহিত্যকে অশাশ্বত বা প্রাণ-ধর্ম বিবর্জিত বলে তুচ্ছ করার উপায় নেই। অপ্রেমাত্মক নাটকের বস্তু-বৈচিত্র্যের কথা ত গোড়াতেই বলেছি। প্রেমাত্মক নাটকের কয়েকটা মোটা বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বললাম।

মনে রাখা দরকার যে অলঙ্কার শাস্ত্রের কাঠামো ধরে লিখতে বাধ্য হলেও, হিন্দু নাট্যকাররা কিন্তু গ্রীক নাট্যকারদের মতো অন্ধ নিয়তিবাদের লৌহ-শৃঙ্খলে মানুষকে একবারও বাঁধেন নি। তাই জগৎ ও জীবনের সহজ রূপটি তাঁদের লেখায় ফুটেছে যতখানি কাব্যের ভাষায়, তা প্রাচীন কালের আর কোন সাহিত্যে হয় নি। কিন্তু মজা এই যে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের ধারা পরবর্তীকালে আমাদের দেশে আদৌ অনুসৃত হয় নি। হিন্দু রাজত্ব অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য সাহিত্যও শেষ হয়েছে। তাই ভারতীয় সাহিত্যে ইংরেজ আমলের আগে আর কোন ভাষাতেই নাটকের দেখা মেলে না, যদিও আমাদের টোলে ও চতুষ্পাঠীতে নাট্য সাহিত্য বরাবরই নিয়মিত পাঠ্যরূপে পড়ানো হয়েছে। বোধ হয় অধ্যয়নের সঙ্গে উপলব্ধির যোগ ছিল না, আশঙ্কা করি যা আজও খুব বেশী নেই। তাই আধুনিক কালের লেখকরাও সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে আলোচনা খুব কমই করেন।

ভারতীয় সাহিত্যের ঐক্য

অল্পদিন আগে উড়িষ্যার এক সংবাদপত্র সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি কলকাতায় এসেছিলেন আধুনিক বাংলার উল্লেখযোগ্য গল্প, উপন্যাস ও কবিতা পুস্তকগুলি সংগ্রহ করতে। কথাপ্রসঙ্গে বুঝলাম, মাইকেল, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের রচনাবলী তিনি ভালো করে পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির রচনাবলীর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। আধুনিক কালের কবি-সাহিত্যিকদের সকলের নামই তিনি জানেন। কিছু কিছু পড়েছেনও প্রত্যেকের লেখা। পূর্ণতর পরিচয়ের জন্যেই তাঁর কলকাতায় আসা।

তাঁকে দেখে ও তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে যেমন খুসী হয়েছিলাম, তেমনি লজ্জাও পেয়েছিলাম। তাঁর তুলনায় উড়িষ্যার সাহিত্য সম্বন্ধে আমি কত কম জানি? গত শতাব্দীর লেখক হিসাবে একমাত্র উপেন্দ্র ভঞ্জ ও রাধানাথের রচনার সঙ্গে এবং আধুনিক কালের লেখক হিসাবে কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর লেখার সঙ্গে বাংলা অনুবাদ মাধ্যমে অল্প-স্বল্প পরিচয় আছে। সে পরিচয়ও এত অগভীর যে তার ওপর নির্ভর করা চলে না। অথচ ওড়িয়া ভাষা আসলে বাংলা ভাষাই, শুধু হরফ আলাদা। এই হরফটা জানা থাকলে অনায়াসেই আমি ওড়িয়া সাহিত্য পড়তে পারতাম। ভদ্রলোককে ভরসা দিয়েছি, অদূর-ভবিষ্যতেই এই অজ্ঞতা দূর করব এবং প্রাচীন ও আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্য আদ্যন্ত পড়ে ফেলব।

শুধু ওড়িয়া সাহিত্য বলে নয়, ভারতের সমস্ত আঞ্চলিক সাহিত্য সম্বন্ধেই আমাদের অজ্ঞতা অপরিসীম। হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, কোন সাহিত্য সম্বন্ধেই আমরা কিছু জানি না। কিছু জানি না তামিল, তেলেগু, কনাড়ী ও মালয়ালী সাহিত্য সম্বন্ধে। একই ভারতবর্ষে একই সুখ-দুঃখ নিয়ে বাস করি আমরা, আমাদের মনন চিন্তন প্রবাহিত হয় একই ধারায়। তবু কেউ আমরা সাহিত্যের মাধ্যমে কারো অন্তরঙ্গ পরিচয় সংগ্রহ করতে পারি না, একমাত্র ভাষাগত অপরিচয়ের দরুণ। এই অপরিচয়ের জন্যেই সর্ব-ভারতীয় একত্ব আজও আমাদের কাছে যতটা আদর্শ, ততটা বাস্তব হতে পারে নি।

সরকারী চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনীতির কাজ আমরা কোন মতে ইংরেজী দিয়ে চালিয়েছি, চালাচ্ছি, কিন্তু ঘরোয়া বা প্রাত্যহিক আদান-প্রদানের পথ আমাদের মধ্যে আজও সুগম হয় নি।

ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা আমাদের যতই থাক, এটা কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে শিক্ষিত ভারতবাসী, এস্কিলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিডিস পড়েছেন, পড়েছেন ভার্জিল, সেনেকা, দান্তে, সেক্সপীয়ার, সারভান্তিস, পড়েছেন গ্যেটে, ভলতেয়ার, ফ্লবেয়ার, জোলা, আনাতোঁল ফ্রান্স, রলাঁ, টলস্টয়। নরওয়ে, সুইডেন, পোলাণ্ড, ফিনল্যাণ্ডের সাহিত্যের বার্তাও তাঁর একেবারে অজানা নয়। আন্তর্জাতিক সাহিত্যের ভোজে এই ভাবে পাতা পেতে বসার সুযোগ হয়েছে ভারতবাসীর, একমাত্র ইংরেজী অনুবাদের মধ্যস্থতায়। ভারতবর্ষের আঞ্চলিক সাহিত্যগুলিও যদি অনূদিত হত এই ভাবে ইংরেজীতে, তাহলে অজ্ঞতা নিশ্চয় থাকত না আমাদের। সে অনুবাদ বিদেশীরা করেন নি, কাজেই আমরা যারা পাকা ফল হাতে পেলে তবেই সানন্দে খেতে প্রস্তুত, তারা আর করব কি ?

অথচ অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে এক দক্ষিণী ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে তামিল ছাড়া, আর সমস্ত ভারতীয় ভাষাই মোটামুটি এক উৎস থেকে জন্মেছে। তাই শব্দভাণ্ডার, বাক-ভঙ্গী ও ব্যাকরণ-বিধিতে তাদের পরস্পরে ঘনিষ্ঠ মিল আছে। এই মিলটা খুঁজে পাওয়া যায় না শুধু বর্ণমালার বিভিন্নতার জন্যে। যদি একটি সাধারণ লিপিতে অনুলেখন করা হয় সবগুলি ভারতীয় ভাষার, তা হলে অল্প সংখ্যক দেশজ শব্দ ও টুকিটাকি আঞ্চলিক প্রবাদ-প্রবচন ছাড়া আর কোন জায়গাতেই কারো আটকানোর কথা নয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলতে পারি, বাংলা হরফে লেখা 'তুলসী রামায়ণ' আমি আগাগোড়াই পড়তে এবং বুঝতে পেরেছি। নলিনীমোহন সান্যাল সম্পাদিত তামিল 'কুরল' গ্রন্থ এবং কিষণচাঁদ দরবেশ সম্পাদিত শিখ 'গ্রন্থসাহেব' যাঁরা পড়েছেন, কিংবা যাঁরা বাংলা হরফে হিন্দী ভজন ও উর্দু গজল পড়েছেন, তাঁরা বুঝতে না পেরে ছেড়ে দিয়েছেন, এ কথা বলবেন না নিশ্চয়।

আসলে এই পারস্পরিক বোঝাবুঝির আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা হয় নি, হলেই আশানুরূপ সফলতা লাভ করা যেত। পুরানো আমলে যখন সর্ব-ভারতীয় আনাগোনার রাস্তা এত প্রশস্ত ছিল না এবং দেশে এখনকার মতো রাজনৈতিক

ঐক্যবোধও জন্মায় নি, তখন ভারতবর্ষের এক অঞ্চল অন্য অঞ্চলকে ঢের বেশী বুঝত। বুঝত তার প্রমাণ দক্ষিণের শ্রীবৈষ্ণবদের দর্শন ও আলোয়ারদের ভক্তি সাহিত্য বাঙালী বৈষ্ণবদের প্রেরণা দিয়েছিল। উত্তর ভারতীয় সন্তদের রচনা পৌঁছেছিল রাজস্থানে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে। আসামের মহাপুরুষিয়ারা এবং উড়িষ্যার ভাগবতকাররা প্রেরণা পেয়েছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের রচনা থেকে। রাজস্থানে মীরা, উত্তর প্রদেশে দাদু, কবীর, মিথিলায় বিদ্যাপতি, বাংলায় বড়ু চণ্ডীদাস, গুজরাটে নরসিং মেহতা, মহারাষ্ট্রে তুকারাম একই ভাবের পদাবলী লিখেছেন, এ আকস্মিক নয়। ভ্রাম্যমান সাধু-ফকির, তীর্থযাত্রী ও বণিকের মারফত গানের আকারে ভেসে ভেসে গিয়েছে এই সাহিত্য। ছাপা বই, রেলগাড়ী, ডাক ও তার-বেতারের যুগে এই আদান-প্রদান ছুটে গেছে, অথচ যে আন্তঃরাজ্য আদান-প্রদান এ যুগে হতে পারত, হওয়া উচিত ছিল, তা হয় নি। এ যুগের যুগধর্ম অনুযায়ী সর্ব-ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির বনিয়াদ পোক্ত করতে চাইছি আমরা। আর সেই ফাঁকেই অতীত কাল থেকে যে সর্ব-ভারতীয় সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা চলে আসছিল সাহিত্যের ভেতর দিয়ে, তা গেছে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে।

আজ যে প্রাদেশিক অন্তর্দ্বন্দ্বকে আমরা সবাই অপছন্দ করি এবং এড়াতে চাই, তা গট হয়ে চেপে রয়েছে আমাদের সমাজ-বিন্যাসের মধ্যেই। কেউ কারো মন জানি না আমরা, হৃদয়ের দরজা আমাদের বন্ধ রয়েছে পরস্পরের কাছে। এই রুদ্ধ দুয়োরের চাবি হল ভাষা। আঞ্চলিক ভাষার অবরোধে বন্দী রয়েছে আমাদের সাহিত্য ও সঙ্গীত। তার স্রোত অবারিত করে দিতে হবে পরস্পরের মনের মাটিতে, তাহলেই দেখা যাবে, প্রাদেশিক সীমানার কলহ থেমে গেছে, থেমে গেছে রাষ্ট্রভাষার কলহ। এ দেওয়ার উপায় হল একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তন করা এবং ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষা সেই লিপির সাহায্যে লেখা। আগেই বলেছি, এই সার্বজনীন হরফের মাধ্যম পেলে পরস্পরের ভাষা আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দশ-আনা থেকে বারো-তেরো আনা পর্যন্ত অনায়াসে বুঝতে পারব। বাকিটুকু অল্প অনুশীলনেই আয়ত্ত হবে। কারণ সমস্ত ভারতীয় ভাষার উৎস এক, এ ত বলাই হয়েছে।

এখন প্রশ্ন, কোন লিপি হলে ভালো হয়? ব্যক্তিগত ভাবে আমি রোমান বা ইংরেজী লিপির পক্ষে, কারণ তার বর্ণসংখ্যা কম, তাতে যুক্তাক্ষর নেই, রেফ,

র-ফলা, য-ফলার হাঙ্গাম নেই। দ্রুত লেখা এবং টাইপ করার দিক থেকে তা সুবিধা জনক। তাছাড়া জার্মানী ও রুশিয়া ছাড়া সমগ্র ইউরোপ, সমগ্র আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং এশিয়া-আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েই এই লিপির প্রচলন রয়েছে। অবশ্য রোমান হরফে ভারতীয় ভাষা লিখতে গেলে, হ্রস্ব-দীর্ঘ এবং সংবৃত-ব্যাবৃত উচ্চারণ নির্ণয়ের জন্যে কিছু-কিছু চিহ্ন দরকার হবে গোড়ার দিকে। অভ্যস্ত হয়ে গেলে, এগুলো যে বর্জনও করা যেতে পারবে, এ ত বলাই বাহুল্য। আর যদি রোমান লিপিতে আপত্তি থাকে ত সংস্কৃত বা দেবনাগরী হরফ নেওয়া হক। তা আমাদের ক্ল্যাসিকাল লিপি এবং নিখুঁত বানান-বিন্যাস ও উচ্চারণ-বিধানের দিক থেকে তা সব চেয়ে বিজ্ঞানসম্মত লিপি, যদিও গতিবেগের বিচারে একটু শ্লথ এই লিপি। মোট কথা এই একটা দিক, যেখানে আমরা মনোযোগ নিবদ্ধ করলে সত্যিকার সুফল পেতে পারি।

আগেই বলেছি ভারতীয় মনন ও চিন্তনের ধারা এক, কেন না একই আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি আশ্রয় করে আমাদের চিত্তের গঠন হয়েছে। সঙ্কট-সমস্যাও আমাদের এক, কেন না একই সামাজিক পটভূমিতে আমাদের স্থিতি। এ অবস্থায় একে যদি আমরা অনায়াসে অন্যের মনের অন্দর মহলে যেতে পারি, তাহলে দেখব দক্ষিণের ভারতী ও ভেল্লাথোল হন, উত্তরের প্রসাদ, প্রেমচন্দ্র ও জৈনেন্দ্রকুমার হন, আর পূর্বের শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, রাধানাথ ও উপেন্দ্র ভঞ্জ হন, সবাই একটি সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেছেন: সে হল ভারতীয় সাহিত্য, তামিল, মালয়ালী, বাংলা বা ওড়িয়া সাহিত্য নয়। গোর্কী, রঁলা, ইবসেন, শ যেমন সারা ইউরোপের সাহিত্যিক, আমাদের দেশে এঁরাও তেমনি সর্ব-ভারতের সাহিত্যিক হতে পারেন, যদি এঁদের রচনাবলী আমরা আঞ্চলিক গণ্ডীমুক্ত করে সর্ব দেশে ছড়িয়ে দিতে পারি। এ চেষ্টা কোন দিন হবে, এই আশা রইল।

আজকের হিন্দী লেখা ও লেখক

॥ ১ ॥

আমাদের আলোচনার বিষয় হল আধুনিক হিন্দী সাহিত্য। এই আলোচনার একটু ভূমিকা দরকার। পুরানো কালের হিন্দী সাহিত্য ছিল প্রধানত ধর্মমূলক। সাধু-সন্তদের জীবন কাহিনী, ভজন, দোঁহা, এই সবই ছিল তখনকার জনপ্রিয় রচনা। মুসলীম প্রভাবে কিছু পরিমাণ কিস্‌সা বা লোক-গাথাও লেখা হয়েছিল, তরুণ সমাজে যার সমাদর ছিল। এই পুরানো সাহিত্য লেখা হয়েছে যখন, তখনো হিন্দী ভাষার বর্তমান রূপটি গড়ে ওঠেনি। অবোধী বা ব্রজভাষাই ছিল তখনকার সাহিত্যের মাধ্যম। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ধাপে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র এবং তাঁর সুহৃদ ও সহকর্মী মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী প্রথম কথ্য হিন্দীর সুসংস্কৃত রূপ খাড়ী বোলীকে সাহিত্য রচনায় নিয়োগ করেন এবং এখান থেকেই আধুনিক হিন্দীর যাত্রা সুরু হয়। ১৮৯৪ সালে কাশী নাগরী প্রচারিণী সভার উদ্যোগে প্রকাশিত 'সরস্বতী' পত্রিকাই এই নূতন হিন্দী গঠনের প্রথম স্মরণীয় উদ্যম, আর এই উদ্যমের প্রধান নায়করূপে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র এবং তাঁর পর মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী চিরস্মরণীয়।

অবশ্য মহাবীর প্রসাদ এবং ভারতেন্দু ভাষা সংস্কারক রূপেই বিখ্যাত, যদিও দ্বিবেদী মহাশয় কবিতায় এবং প্রবন্ধে. আর ভারতেন্দু কবিতায় এবং নাটকে মোটামুটি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রথম স্মরণীয় কবি রূপে এর পর দেখা দিলেন হিন্দীতে পণ্ডিত অযোধ্যা সিং উপাধ্যায়। কৃষ্ণের বৃন্দাবন থেকে মথুরা যাত্রা নিয়ে লেখা তাঁর কাব্য 'প্রিয়-প্রবাস' মনোরম রচনা। কর্মময় পুরুষ কর্মের মথুরায় চলে যান, ভাবময় নারী ভাবের বৃন্দাবনে তাঁর বিরহের দীপটি জ্বালিয়ে চিরদিন প্রতীক্ষা করেন, এই তত্ত্বটিকেই তাঁর কাব্যে ফুটিয়েছেন কবি সুন্দর রূপে। এই আমলের দ্বিতীয় বিশিষ্ট কবি হলেন মৈথিল শরণ গুপ্ত। তিনিই আধুনিক হিন্দীর প্রধান জাতীয়তাবাদী কবি। 'ভারত-ভারতী' কাব্যে মৈথিল শরণ অতীত ভারতের জ্ঞান-গরিমার গৌরব কীর্তন করেছেন, সেই সঙ্গেই করেছেন পরাধীন ভারতের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে খেদ। কিন্তু এই কাব্যে দেশপ্রেম যত জাগ্রত, কাব্যরস ততটা নয়।

১৯২০ সাল থেকে হিন্দী কাব্য সাহিত্যে ধীরে ধীরে একটি রূপান্তর দেখা দিল। এই রূপান্তর সাধারণ ভাবে ছায়াবাদ নামে পরিচিত। জাতীয়তাবাদী কবি মৈথিল শরণ গুপ্ত এবং তাঁর সহযাত্রী জয়শঙ্কর প্রসাদই এই আন্দোলনের আদি নায়ক, যদিও নিরালা, পন্থ, মহাদেবী বর্মা প্রমুখ কবিরাই এই আন্দোলনকে পরবর্তী সময়ে পূর্ণতা দেন। মৈথিল শরণ তাঁর 'সাকেত' কাব্যে লক্ষ্মণের পত্নী ঊর্মিলার হৃদয়-বেদনাকে অপরূপ রসাবেশে সিক্ত করে ছন্দে রূপ দিয়েছেন। জয়শঙ্কর প্রসাদ তাঁর 'কামায়ণী' মহাকাব্যে পার্থিব প্রেমের পথ ধরেই মানুষকে আশা ও আশ্বাসের সঙ্গে দিব্য প্রেমে পৌছানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে এসেছে হিন্দী কবিতায় যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, পরের তিন জন কবি তাকেই আরও অগ্রসর করে দিয়েছেন আখ্যান-কাব্যের পরিবর্তে সুরেলা সুন্দর গীতি-কবিতা রচনা করে। নিরালা বা সূর্যকান্ত ত্রিপাঠীর 'অনামিকা', 'পরিমল', 'গীতিকা', সুমিত্রানন্দন পন্থের 'গুঞ্জন', 'যুগান্ত', মহাদেবী বর্মার 'নীহার', 'নীরজা', 'রশ্মি'···ছায়াবাদী কবিদের রচনার সংগ্রহ হিসাবে আধুনিক হিন্দী কবিতার সর্বোত্তম নিদর্শন। এই বইগুলি একদিকে যেমন হিন্দী কাব্য-ভাষার একটি নিশ্চিত মান তৈরী করেছে, অন্যদিকে তেমনি হিন্দী কবিতার রাজ্যে একটি নূতন দিগন্তও উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

প্রেম ও প্রকৃতির, জগৎ ও জীবনের রহস্য-মধুর ব্যাখ্যানই ছায়াবাদী কবিদের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু ১৯৩৫ সাল থেকে এই কবিদের লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে সুরু হল একটি বিরোধিতা আন্দোলন। তাঁরা অতি-রোমান্টিক, অবাস্তব এবং প্রত্যক্ষ জীবনের দুঃখ-ব্যথা সম্বন্ধে অচেতন, এই অভিযোগ উঠল একদিকে, অন্যদিকে নূতন যুগাদর্শ অনুযায়ী লেখা সুরু হল প্রগতিবাদী কবিতা। ছায়াবাদী সুমিত্রানন্দন পন্থই প্রথম দিকে ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোভাগে। কিন্তু তিনি শীঘ্রই পিছু হঠে গেলেন। আসলে নূতন কবি ভগবতী বর্মার 'ভৈঁসা গাড়ী'ই হল এই পর্যায়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা গ্রন্থ। এঁর পর দিনকর, সুমন, ভারতভূষণ এবং অজ্ঞেয় বা এস এইচ বাৎসায়ন প্রমুখ কবির বিশেষ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কবিতায় প্রচারমূলক বাস্তবতার, কেউ কেউ প্রতীকময় দুর্বোধ্যতার আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু এখনো সার্থক কবির স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি। অন্তত ছায়াবাদীদের মতো জনপ্রিয় হননি প্রগতিবাদী কবিরা কেউই।

॥ ২ ॥

কবিতার তুলনায় হিন্দী কথা-সাহিত্য অল্প দিনের। ১৯২০ সালের আগে হিন্দীতে কোন উল্লেখযোগ্য গল্প-উপন্যাস লেখা হয় নি। যদিও কিশোরী লাল গোস্বামী, দেবকীনন্দন ক্ষেত্রী প্রমুখ একদল লেখক আদি ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন কথা-সাহিত্যের। মুন্সী প্রেমচন্দই হলেন প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক ও গল্পকার এবং আজ পর্যন্ত তাঁর শ্রেষ্ঠতা প্রায় অনতিক্রান্তই রয়েছে। সমাজের যারা সর্ব নীচুতলার মানুষ, যারা ব্যথিত, পতিত, নিগৃহীত, তাদের প্রতিদিনের জীবন থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন গল্প-উপন্যাসের উপকরণ। তাঁর 'সেবাসদন', 'গোদান', 'কর্মভূমি' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'কফন', 'প্রেম-পূর্ণিমা' প্রভৃতি গল্প-সংগ্রহ হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। উত্তর ভারতে তা একদিকে যেমন এনেছে নূতন সমাজ বোধ, অন্যদিকে গড়ে তুলেছে বিশিষ্ট একটি সাহিত্য-রুচি। কবিতায় যখন ছায়াবাদ চলছে, কথা-সাহিত্যে তখন এসেছে এই বাস্তবতা-সম্মত জীবনবাদ, এটা আশ্চর্য। প্রেমচন্দের এই ধারা অনুসরণ করে বেচন শর্মা লেখেন 'বুধুয়াকী বেটী' এবং কৌশিক লেখেন 'ভিখারিণী', যা এক সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় বই ছিল। সমাজের নীচুতলার মানুষদের দুঃখ-বেদনাকে এঁরা আরো স্পষ্ট, আরো জীবন্ত করে ব্যক্ত করেছেন। এরপর উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক জৈনেন্দ্রকুমার। বাইরে ঘটনা আশ্রয় করে মনের গহনে ডুব দেওয়া এবং মনোজগতের ভাঙা-গড়াকে আখ্যায়িকার ভেতর রূপ দেওয়ার কৃতিত্বে এঁর সমকক্ষ লেখক হিন্দীতে আর কেউ নন। এঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ত্যাগপত্র' একটি যুগ-স্তম্ভ স্বরূপ।

১৯৩৫ সাল থেকে হিন্দী কথা-সাহিত্যে রাজনীতির প্রত্যক্ষ পদ-সঞ্চার দেখা যায়। আজকের সর্বাধিক খ্যাত ঔপন্যাসিক যশপাল এই সময়ের পরই লেখেন তাঁর 'দেশদ্রোহী', যা একদিন প্রভূত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। উপেন্দ্রনাথ আসকের 'গিরতে দেওয়ারে' বা 'ভেঙেপড়া দেওয়াল' এবং ভগবতী বর্মার 'টেরে মেরে রাস্তে' ঠিক এই রকমই নিন্দা-প্রশংসায় বিখ্যাত উপন্যাস। প্রথমটিতে নিম্নবিত্ত মানুষদের সামাজিক দৈন্য ও ক্রমক্ষয়ের কাহিনী বিবৃত হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে মধ্যবিত্ত ঘরের রক্ষণশীলতা বনাম প্রগতির সংঘর্ষ ফোটানো হয়েছে চমৎকার করে। রামচন্দ্র তেওয়ারীর 'সাগর সরিতা ঔর আকাল' এবং মোহন সিং সেংগরের 'খুনকে ধব্বী'তে যথাক্রমে বাংলার দুর্ভিক্ষ এবং দাঙ্গাকে গভীর দরদের সঙ্গে গল্পে চিত্রিত করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে যশপাল এবং উপেন্দ্রনাথ

আসক বাস্তবতার নামে সুরুচি ও সুনীতিকে অনেক সময় কঠিন আঘাত করেছেন। 'নির্বাসিতা'র লেখক ইলাচাঁদ যোশী এবং তিন খণ্ডে সমাপ্য 'শেখর' উপন্যাসের লেখক অজ্ঞেয় বা এস এইচ বাৎসায়ন, উভয়েই সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রথমের গল্পের গাঁথুনি ঢিলে, বৈদগ্ধ্যের আতিশয্যে তাঁর কাহিনী খুঁড়িয়ে চলে। দ্বিতীয়ের আসক্তি অস্বাভাবিকতার দিকে, মনোবিকার এবং তার দৈহিক প্রতিক্রিয়াকে সর্বত্র তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর গল্পের গঠনে। তবু দু-জনেই এঁরা আধুনিক হিন্দীর বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিকার এবং ইদানীন্তন কালের যা-কিছু আদর্শ ও চিন্তাধারা, তাকে সাহিত্যের মাধ্যমে সর্বজনের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এঁরাই। হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী, নরোত্তম প্রসাদ নাগর, উষাদেবী মিত্র, সুভদ্রা কুমারী চৌহান প্রভৃতি লেখক-লেখিকাও পাঠক সমাজে সুপরিচিত।

কবিতা ও কথা-সাহিত্যে আধুনিক হিন্দীর যতটা সমৃদ্ধি, নাটকে ও প্রবন্ধে ততটা নয়। গদ্যে তবু ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী, বালমুকুন্দ গুপ্ত প্রমুখ সাবেকী সাহিত্যিক-সাংবাদিকরাই হন, আর রাহুল সাংকৃত্যায়ন, জৈনেন্দ্রকুমার, হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী প্রমুখ আধুনিক পণ্ডিতরাই হন, সবাই কিছু-কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। তার মধ্যে রাহুলজীর 'মানব সমাজ', 'ভলগাসে গঙ্গা', জৈনেন্দ্রকুমারের 'সাহিত্য চিন্তা', এবং হাজারী প্রসাদের 'হিন্দী সাহিত্যকী ভূমিকা' বিশেষভাবে স্মরণীয়। কিন্তু নাটকে এক পুরানো আমলে জয়শঙ্কর প্রসাদ রচিত 'রাজ্যশ্রী', 'চন্দ্রগুপ্ত' এবং হরিকৃষ্ণ প্রেমী রচিত 'স্বপ্নভঙ্গ' প্রভৃতি রোমান্টিক নাটক, আর হাল আমলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা 'তুফান সে পহেলে' সামাজিক নাটক ছাড়া গণনীয় নাটকই মেলে না। রঙ্গমঞ্চে উর্দু অপেরার অত্যধিক প্রচলন থাকায়, হিন্দী নাটক বহুদিন অভিনীত হওয়ার সুযোগ পায়নি। তাইতেই বোধ হয় সাহিত্যিকরাও নাটক লেখার দিকে তেমন মনোযোগ দেন নি। তবে একান্তভাবে অধ্যয়নের জন্যে একাঙ্ক নাটক লেখা হয়েছে অনেক এবং তার উঁচু সাহিত্যিক মূল্যও আছে। এই পর্যায়ে রামকুমার বর্মার 'পৃথীরাজকে আঁখে' এবং শেঠ গোবিন্দ দাসের 'পঞ্চভূত' বিশেষত্বপূর্ণ রচনা।

মোটের ওপর এই হল আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের এবং সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কয়েকটা মোটা কথাই মাত্র এই আলোচনায় বলা হল। অনেক কথাই রয়ে গেল অ-বলার মধ্যে, যা পরবর্তী সুযোগে আবার শোনাতে চেষ্টা করব।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নর-নারীর সম্পর্ক

এখন থেকে প্রায় হাজার বছর আগে লেখা চর্যাপদগুলি থেকে সুরু করে, জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদাবলী, গোপীচাঁদ, ময়নামতী বা গোরক্ষনাথের কাহিনী, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্তন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, মালাধরের ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, বিভিন্ন মঙ্গল কাব্য—যেমন, কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল, বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, রামেশ্বরের শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, বিভিন্ন পল্লীগাথা, লোক সঙ্গীত ও তরজা, পাঁচালীর পালা পর্যন্ত, যদি সমগ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পুঁজি মনোযোগ দিয়ে অনুসন্ধান করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, প্রাচীন বাঙালীর সাহিত্যাদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল প্রধানত এবং প্রথমত যৌনতত্ত্বের ওপর। ধর্মের কথা তাঁরা বলেছেন, কিন্তু ধর্মে উচ্চ দার্শনিকতা, তত্ত্বজ্ঞান বা নীতি-বিশুদ্ধির পরিচয় নেই। যুদ্ধ-বিগ্রহের বৃত্তান্ত তাঁরা লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু তাতে দেশ-প্রেমের, সংহত সাংগ্রামিকতার, বীরত্বের বা কোন আদর্শের জন্যে আত্মত্যাগের নিদর্শন নেই। পারিবারিক জীবনের চিত্র তাঁরা অঙ্কিত করেছেন, কিন্তু সে চিত্রে শুচিতা, শান্তি, পরিচ্ছন্ন, পরস্পর-সম্বন্ধ, সহৃদয় প্রতিবেশিত্ব, গার্হস্থ্য শালীনতা কোনটাই পরিস্ফুট হয়নি। এই সমস্ত দিক যখন রচনায় এসে পড়েছে, রচয়িতারা নমো নমো করে সেরে দিয়েছেন। বেশ বোঝা যায়, এ-সব বিষয়ে তাঁদের আস্থা বা নিষ্ঠা ছিলনা একরত্তিও। ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজ সম্বন্ধে এই নিরুত্তাপ নিশ্চেতনতা কেন ছিল, এটা থাকা জাতীয় সংস্কৃতির পক্ষে লাভজনক হয়েছে কিনা, সে বিচার আপাতত করতে চাই না। ব্যাপারটা যে অনুপেক্ষণীয়, শুধু এইটুকুই এখানে বলে রাখছি।

এর পরিবর্তে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় একটা জিনিষ এবং তা দেখা যায় একেবারে আদি থেকেই প্রভূত পরিমাণে—সে হল নর-নারীর সম্পর্ক বিন্যাস। তার অতি স্থূল জৈব চেহারা থেকে সুরু করে, বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক রূপ পর্যন্ত, সমস্ত দিককেই বাংলার সাহিত্য-স্রষ্টারা অনুপমভাবে প্রকটিত করেছেন। এ-ই হল বাংলায় নিজস্ব সংস্কৃতি। বলা যেতে পারে এই বাঙালীর

সহজিয়াবাদ, যা বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, বৈষ্ণব, শৈব, বাউল, নানা সম্প্রদায়ের হাত দিয়ে যুগে যুগে নব রূপ পরিগ্রহ করেছে। চর্যা থেকে একটানা ভারতচন্দ্র পর্যন্ত, এর ধারা প্রায় অব্যাহত আকারে লক্ষ্য করা যায়। এই ধারাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করলে, এর ভেতর থেকে প্রাচীন বাংলার সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের স্বরূপটি যেমন উদ্ঘাটিত হবে, তেমনি যৌন জীবন ও যৌনবৃত্তির গতি-প্রকৃতিকে আমাদের পূর্বাচার্যেরা কি চোখে দেখতেন, সেটা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে। আমি তার কয়েকটা মূলসূত্র এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করছি।

চর্যায় দেখা যাচ্ছে, মুণ্ডিতশীর্ষ, গৃহ-সংসার বিচ্যুত যোগী কাহ্ন সমাজভ্রষ্টা ডোম্বীর সাহচর্য করছেন। নগর বাহিরে তার কুটীরে গিয়ে রস-রসানের চর্চা করছেন। বলছেন, এই অস্পৃশ্য ডোম্বীর মধ্যেই তিনি পেয়েছেন মোক্ষ বা নৈরঞ্জনার সাক্ষাৎ। এরি আর এক রূপ দেখছি গোরক্ষনাথের কাহিনী পর্যায়ে। মাতা ময়নামতী পুত্র গোপীচাঁদকে প্রব্রজ্যা নিইয়ে দেশান্তরী করেছেন এবং নিজে হাড়িপা সিদ্ধাই-এর সঙ্গে গুহ্য সাধনে কালাতিপাত করছেন। এদিকে সন্ন্যাসী গোরক্ষনাথ মায়াবিনীদের ফাঁদে আবদ্ধ গুরু মীননাথকে নর্তকীর ছদ্মবেশে কায়াসাধন মন্ত্র শুনিয়ে উদ্ধার করে আনছেন। দুটোই তন্ত্রাশ্রিত বৌদ্ধ-সংস্কৃতির মিলনে উদ্ভূত কাহিনী। সন্ন্যাস ও প্রব্রজ্যা, আর বামাচার তাই একসঙ্গে মিশেছে। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ প্রমুখ নাথ-যোগীরা তান্ত্রিক বৌদ্ধই, তবে লক্ষ্য করার বিষয় যে তাঁরা বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্ম···এই তিন উপাস্যকে পরিহার করে, সোজাসুজি মেনে নিয়েছেন শিব-দুর্গাকে। অর্থাৎ বৌদ্ধরা যখন হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে প্রত্যাবর্তন করছেন, এঁরা হলেন সেই যুগ-সন্ধির লোক। তাই এখানে ডোম্বীর বদলে গোরক্ষনাথকে পথভ্রষ্ট করার জন্যে স্বয়ং দুর্গা মাঝপথে শুয়ে থাকেন এবং গোরক্ষনাথ বটপত্র দিয়ে তাঁর সম্ভ্রম আবৃত করেন।

বৈষ্ণব মতের আবির্ভাবে এই যৌনতারই আর এক দিক উদ্ঘাটিত হতে দেখছি। জয়দেবের গীতগোবিন্দে ও বিদ্যাপতির পদে রাধা-কৃষ্ণ লীলার যে কামময় রূপটি সুস্পষ্ট হয়েছে, তা এই মৃত্তিকারই সহজাত সম্পদ, তাতে আর সন্দেহ নেই। কৃষ্ণ-কীর্তনে এই রতি-সাধনা চরমে উঠেছে। বড়াইকে কুট্টনী রূপে নিয়োগ করে, তার সাহায্যে তরুণ কৃষ্ণ কিশোরী রাধাকে

ঘাটে, মাঠে, নদীজলে প্রলুব্ধ করে নিয়ে আসছেন। কামকেলিতে অনভিজ্ঞা রাধা ভয় পাচ্ছে, পীড়নে ব্যথা অনুভব করছে, তবু তার নিস্তার নেই। শুধু তাই না, যৌন-পীড়নের সঙ্গেই কৃষ্ণ তাকে শালী, হারামজাদী ইত্যাদি সম্ভাষণে আপ্যায়িত করছেন। তার মা-মাসীর সদগতি করছেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস এই ঐতিহ্যের পত্তন করে যান বলেই, পরবর্তী কালের উচ্চ লোকোত্তরতা-সমৃদ্ধ বৈষ্ণব পদাবলীতেও মাঝে মাঝে সর্বপ্রকারের যৌন-আতিশয্য প্রকাশমান হয়েছে। চৈতন্য নিজে সন্ন্যাসী ছিলেন এবং বৈষ্ণব ধর্মের এই জৈবাংশকে তিনি রূপকাশ্রিত ব্যাখ্যা দিয়ে মোলায়েম করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা সে ব্যাখ্যা মুখে প্রচার করলেও, কাজে গ্রহণ করেন নি। তার প্রমাণ খোদ চৈতন্যজীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি। নয় বৎসরের বিধবা নারায়ণী প্রভু চৈতন্যের চর্বিত তাম্বুল ভক্ষণ করে সন্তান-সম্ভবিতা হন এবং চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন হলেন সেই গর্ভের সন্তান। আর ঠাকুর জগদানন্দ প্রভুর কৃষ্ণ-জন্মে চন্দ্রাবলী ছিলেন, তাই গৌরাঙ্গ-জন্মে তাঁর সম্বন্ধে তিনি অভিমান-মিশ্রিত রতিভাব পোষণ করতেন ইত্যাদি ইত্যাদি উপাখ্যান চৈতন্য জীবনের ওপর প্রক্ষেপ করে, বৈষ্ণবাচার্যেরা কি বলতে চেয়েছেন? যৌন-পরিমণ্ডলের বাইরে কেউ নন, এই তাঁদের বক্তব্য নয় কি?

মঙ্গল কাব্যে বর্ণিত দেব-দেবী এবং মানব-মানবীর চরিত্রেও এই যৌনতার প্রভাবই তার ষোল আনা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিজয় গুপ্ত ডোমপাড়ায় ঢুকে শিবের লাম্পট্যের যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন, মনসার জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনায় তিনি বা নারায়ণ দেব বা ক্ষমানন্দ দেবাদিদেবের অসংযমের যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তা কে না পড়েছেন? কালকেতুকে কৃপা করার জন্যে স্বর্ণ-গোধিকা বেশে দেবী চণ্ডিকার তার ঘরে আসা এবং সুন্দরী রূপসী সেজে এর পর তার পত্নী ফুল্লরার চিত্তে অসূয়া জাগ্রত করাও সুবিদিত কাহিনী, যেমন সুবিদিত হর-পার্বতীর মিলন কাহিনী, বা দেব-সভায় নৃত্যরতা বেহুলার যৌবন-দীপ্ত দেহ দেখে দেবতাদের চাঞ্চল্যের কাহিনী। সপত্নী খুল্লনাকে স্বামী সহবাসে বঞ্চিত করার জন্যে লহনা দাম্পত্য-ব্যাপারটা কি ভয়াবহ, তা সবিস্তারে বর্ণনা করছেন। তাতে খুল্লনা কি বললেন? বললেন, সংসর্গে নারী মরে, এ তিনি কোনদিন শোনেন নি। রাবণ-কুম্ভকর্ণদের মতো

বীররাও সংসর্গ করতেন। কৈ, তাতে ত কেউ মরেন নি! বিদ্যার ঘরে সুড়ঙ্গ কেটে প্রবিষ্ট সুন্দরের কুক্রিয়া বহু আড়ম্বরে বর্ণিত হয়েছে। অবিবাহিতা বিদ্যার গর্ভ নিয়ে মা কুৎসিত খিস্তি করেছেন, বাবা সুন্দরকে ধরিয়ে এনেছেন এবং সে শ্বশুরের (?) সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছে একান্ত নির্ভয়ে ও যথেষ্ট নির্লজ্জভাবে···এই রকম কাহিনী উপ-কাহিনী মঙ্গল কাব্যে পাওয়া যাবে রাশি রাশি। এ ছাড়া মঙ্গল কাব্যের নায়ককে দেখলেই কুলনারীরা নিজ নিজ পতিনিন্দা করেন: তারা কেউ কলানিপুণ নয়, তাদের কোন যোগ্যতা নেই! আর বিরহিনীদের বারমাস্যা মাত্রেই যৌন-বুভুক্ষা জনিত অতৃপ্তি তীব্র ক্রন্দনের ভাষায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

মঙ্গল কাব্যে গ্রাম্য দেব-দেবীর একান্ত প্রাদুর্ভাব হওয়ায় এবং তাতে সামাজিক রুচি নিরয়গামী হওয়ায়, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি বিশুদ্ধ পৌরাণিক সাহিত্য আমদানি করলেন যাঁরা, তাঁরাও এই যৌনতার আবর্ত এড়িয়ে যেতে পারলেন না একেবারে, সমগ্র সমাজ-চেতনার মূলে এর প্রভাব অনতিক্রম্য ছিল বলেই। তাই কৃত্তিবাস রাবণের রম্ভাবতী হরণ ও পীড়নের অমন লোমহর্ষণ কাহিনী রচনা করেছেন। কাশীদাস তাই মূল মহাভারত ছাড়িয়ে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী গমনের প্রলম্বিত কাহিনী আবিষ্কার করেছেন। মালাধর দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্কন্ধ ভাগবতকে পল্লবিত করে, এক দীর্ঘ কাব্যে পরিণত করেছেন এবং তাতে ভাগবতী রসলীলাকে রস-রসানের কাহিনী রূপে গড়ে তুলেছেন। এমন কি, ভক্তিমূলক শ্যামা সঙ্গীত, যা এসেছিল দেশে অত্যধিক পরিমাণে প্রেমমূলক শ্যামসঙ্গীত প্রচলনের প্রতিক্রিয়া রূপে, তাতেও দেখা যায়, শিব-শক্তি সম্মেলনের যৌন দিকটারই সমধিক প্রাদুর্ভাব। শিবের বুকে দুই পদ রক্ষা করে নাচছেন যে 'ল্যাংটা মাগী', 'কৃত্তিবাসের কটিতে সংলগ্নকটি হয়ে রতাতুরা যে দিগম্বরী' সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের খেলা খেলছেন, তাঁর উদ্দেশে সাধক-কবিরা অঞ্জলি দিয়েছেন মা-মা ধ্বনি করতে করতেই।

সেই পুরানো তন্ত্রাচার বিশুদ্ধ মাতৃতত্ত্বে এসেও তার আমিষ গন্ধ পরিত্যাগ করতে পারে নি। যেমন পারেনি বাউলদের দেহতত্ত্বে এসেও। তাতেও সম্বাধকে ভব-নদীর নৌকা এবং সাধনকে সাধন-বৈঠা রূপে রূপকায়িত করে, বৈতরণী পারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সুকৌশলে। সেই নবম বা দশম

শতাব্দীর রচিত চর্যার 'আসিসি যাইসি ডোম্বী কাহারো নায়ে' থেকে সুরু করে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত বাউল গানের—

বৈঠা হেনে বালাম টেনে চল,
ও মন-দিশারী খুঁজবি যদি দেহ-নদীর তল···

পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলেছে সেই একই তত্ত্ব, একই জীবন-দর্শন। বার বার শুধু তার ভোল বদল হয়েছে, বদলেছে তার আঙ্গিক ও উপাদান। কিন্তু প্রাণ-বস্তুতে তার যৌনতার প্রভাবটি ঠিক একই থেকেছে। এমন কি, এক চিত্র, এক রূপকই চলেছে পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত হয়ে, যেমন ওপরের এই গীতাংশটুকুতে। এটি পূরোপূরি যৌন-সম্পর্কের গান এবং চর্যা থেকেই এই রকম গান এবং 'মনপবন', 'দেহনদী,' 'সাধন বৈঠা', 'চমন চমন দুই পিঁড়ি' ইত্যাদি রূপকগুলো চলেছে জাতির সাধারণ সম্পত্তি রূপে, একেবারে ঈশ্বর গুপ্তের অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের ঠিক আগে পর্যন্ত। সুতরাং আমাদের অতীত নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যে একান্তই যৌনতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাতে আর সন্দেহ আছে কি ?

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া

বাল্য বয়স থেকেই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া আমার মানস-কল্পনায় একটি উজ্জ্বল সকরুণ মূর্তিতে জাগরূক আছেন। ঘরের দেওয়ালে প্রলম্বিত ছিল নিমাই সন্ন্যাসের একখানি চিত্র: তাতে বধূবেশী বিষ্ণুপ্রিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূতা রয়েছেন, জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে তাঁর কেশে, কপোলে, ওদিকে নিঃশব্দ পদক্ষেপে আস্তে আস্তে শয্যা থেকে উঠে অর্ধোন্মুক্ত দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন প্রভু চৈতন্য। এই ছবির দিকে তাকালেই কেন জানি না আমার বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্যে জাগত অসীম মমতা। নিজের অজ্ঞাতেই এসে যেত আকুল কান্না। ঐ বয়সের স্কুলের বইয়েও পড়ানো হত শিবনাথ শাস্ত্রীর বিখ্যাত 'নিমাই সন্ন্যাস' কবিতা, যা বাড়ীতে অবস্থিত ছবির ছন্দোবদ্ধ ব্যাখ্যা রূপেই যেন হৃদয়ের নিভৃতে একটি প্রীতির আসন লাভ করেছিল—

বৌমা বৌমা ঘুমায়ো না আর,
উঠ অভাগিনী দেখো একবার,
প্রাণের নিমাই, বুঝি ঘরে নাই,
বুঝিবা পালাল করি অন্ধকার!

*　　*　　*

শচীমাতা কাঁদে ঘর ফেটে যায়,
বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বারে পুতলীর প্রায়,
দাঁড়ায়ে ললনা বিষণ্ণ বদনা,
বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়িছে পায়!

আমার মনশ্চক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়ার এই অশ্রুমুখী বালিকা মূর্তিটিই চিরদিনের জন্যে শীতের শিশির-ভেজা পদ্মের মতো অঙ্কিত হয়ে আছে। শুধু আমার নয়, চৈতন্য-জীবনীর একনিষ্ঠ পাঠক মাত্রেরই চোখে তিনি এই রকম চির-বেদনার প্রতীক, অশ্রুমতী বালিকা। তার কারণ সর্পদংশনে লক্ষ্মীদেবীর লোকান্তরের পর মহাপ্রভুর দ্বিতীয়া সহধর্মিণী হয়ে তিনি চৈতন্যজীবনে এসেছেন রূপবতী সুকুমারী কিশোরী রূপে। সেই কৈশোরের অরুণোদয় অতিক্রান্ত হবার আগেই তাঁকে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করে, মহাপ্রভু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন এবং

সেখান থেকেই তাঁর ওপর ইতিহাসের যবনিকা নেমেছে চিরদিনের জন্যে। এই যবনিকা উত্তোলন করে বৃন্দাবন, কৃষ্ণদাস, লোচন, জয়ানন্দ, কোন চৈতন্য-জীবনীকারই আর তাঁকে একবারও পাদ-প্রদীপের সাম্নে উপস্থিত করেন নি। প্রত্যুষের শুকতারার মতো চৈতন্য-জীবনের উদয়-শিখরে একবার আত্মপ্রকাশ করেই তিনি দিবালোকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। নবদ্বীপের ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী রূপে যাত্রারম্ভ করে মহাপ্রভুর সাধনা সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে বিশাল সমুদ্রের পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। কিন্তু দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন কৈশোরের স্থির-বিন্দুতেই নিশ্চল থেকে গেছে, তার আর কোন রূপান্তর বা পরিণতি হয়নি।

বলা বাহুল্য মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের পরই বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনান্ত হয়নি। তিনি অনেক দিন জীবিতা ছিলেন এবং পতি-পরিত্যক্তা বঙ্গ-ললনার সনাতন দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় নিয়ে দীর্ঘ দুঃখের জীবন মায়াপুরের কুটীরে একা যাপন করেছিলেন। হয়ত মহাপ্রভুর পরিণীতা বলেই, পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-পরিজনের অনুকম্পা মিশ্রিত সহায়তা পেয়েছিলেন। অথবা রূপ লাবণ্য ও গুণ-গরিমার অমিত ঐশ্বর্য থাকতেও, যিনি যুবক স্বামীকে ধরে রাখতে পারেন নি সংসারে, তিনি শুভার্থী আত্মীয়বৃন্দের অবিমিশ্র গঞ্জনাই লাভ করে গেছেন এক দিকে, অন্য দিকে তাঁর বিশ্বপাবন পতির তপস্যাপূত জীবনের উদ্দেশে নীরবে শ্রদ্ধাঞ্জলিই নিবেদন করে গেছেন, তারপর একদিন মৃত্যু এসে তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছে!

কে জানে! কারণ ইতিবৃত্ত এই জায়গায় আশ্চর্য রকম নীরব। প্রভু বুদ্ধও একদিন যৌবনে ঠিক এই ভাবে প্রব্রজ্যা নিয়েছিলেন। রূপবতী ভার্যা গোপাকে ঠিক এমনি করেই চোখের জলে ভাসিয়েছিলেন তিনিও। কিন্তু বুদ্ধ তাঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন সোনার চাঁদের মতো পুত্র রাহুল। তাকে বুকে ধরেই বিরহিনী গোপা সংসার-সমুদ্রের সমস্ত তরঙ্গ-বিক্ষোভ হেলায় সহ্য করতে পেরেছিলেন। কিন্তু অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া…তাঁর দেহ-মালঞ্চ কোনদিন মহিমান্বিত মাতৃত্বের ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি। নিষ্ফল নারীত্বের নিরুর্বর ব্যর্থ জীবন তাঁর। সন্ন্যাসাশ্রম থেকে বুদ্ধ যখন পিতা-মাতার সন্দর্শনার্থে সাময়িক ভাবে বাড়ি ফিরেছিলেন, তখন ভূলুণ্ঠিতা গোপাকে তিনি সাদরে হাত ধরে তুলেছিলেন, এ কথা লিখেছেন প্রায় সমস্ত বুদ্ধ-জীবনীকারই। কিন্তু বঞ্চিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাগ্যে এটুকুও জোটেনি কোন দিন। সন্ন্যাসাশ্রম থেকে

মহাপ্রভুও একবার মাতৃ-সন্দর্শনে এসেছিলেন, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখা দেননি। শচীদেবী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হলে, তিনি তার প্রতিকূলতাই করেছিলেন!

কাজেই এই আর একবার যে সুযোগ এসেছিল, তাতেও দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে সমুপস্থিত হতে পারলেন না! নিষ্পাপ পবিত্র নিরপরাধ একটি নারীর হৃদয়-বেদনা কবি-কল্পনায় রূপায়িত হয়ে অনুপম সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারত, তা করল না। বৈষ্ণব মহাজনরা শুধু নিমাই সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরবর্তী তাঁর সেই ভীতি-বিহ্বল, অশ্রু-সচকিত মূর্তিটিই বার বার এঁকেছেন। বাসুদেব ঘোষ, বলরাম দাস, উদ্ধব দাস, যাদবেন্দ্র, কেউ তাঁকে তার অধিক স্বীকৃতির গৌরব দেননি। একমাত্র 'অমিয় নিমাই চরিত'কার শিশিরকুমার কিম্বদন্তীকে ভিত্তি করে, তাঁকে দিয়ে মহাপ্রভুর উদ্দেশে পত্র লিখিয়েছেন—

যে অবধি গেছ তুমি এ ঘর ছাড়িয়া।
সে হতে আছেন মাতা উপোষ করিয়া॥
সদা তাঁর সঙ্গেতে মালিনী ঠাকুরাণী।
নৈলে প্রাণে এতদিন মরিতেন তিনি॥
খাওয়াইতে করি যত সাধ্য সাধন।
মোরে কোলে ধরি করেন দ্বিগুণ রোদন॥

* * *

পিতা চেয়েছিলেন মোরে বাড়ি লইবারে।
তাকি যেতে পারি আমি মাকে একা ছেড়ে॥
সন্ন্যাসী রমণীর নিয়ম কিছুই না জানি।
কি খাইব কি পরিব লিখিবা আপনি॥

* * *

আপনি যে সব তুমি নিয়ম পালিবে।
তা হতে কঠোর নিয়ম এ দাসীরে দিবে॥
বাঁচিব ত্যজিয়া আমি ভূষণ ভোজন।
সুখেতে করিব আমি মাটিতে শয়ন॥

মথুরা প্রস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে দূতী মারফৎ শ্রীরাধার বার্তা পাঠানো নিয়ে শেখরের যে বিখ্যাত পদ, বৈষ্ণব সাহিত্যের যা একটি উজ্জ্বল রত্ন, তাতে শ্রীরাধাও ঠিক

এই ভাবেই মাতা যশোদা, পিতা নন্দ, বৃন্দাবনের গোপ-সখাগণ, সকলের দুঃখের কথাই এক এক করে নিবেদন করেছেন। শুধু একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি আপন হৃদয়ের অসীম বেদনা সম্বন্ধে। অথচ তাঁর যে অকথিত বেদনা, তা-ই হল সবার বড় এবং সেই অতলস্পর্শ বিরহই বৈষ্ণবী রস-সাধনার স্থায়ী ভাব, তা-ই হল বৈধী ভক্তির উপায়। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াও সেই নির্বাক বৈষ্ণবী বিরহের প্রতীক। তাই বোধ হয় বিদগ্ধ গোস্বামিবৃন্দ ও আচার্য কৃষ্ণদাস তাঁকে (স্বামীর সন্ন্যাস গ্রহণের পর) কৃচ্ছ্র তপস্যার পথ দেখিয়েই বিরতি নিয়েছেন।

ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় নর-নারীর মিলিত ধর্মাচরণই স্বীকৃত ছিল। বেদের মন্ত্রদ্রষ্টাদের মধ্যে তাই মহিলা ঋষিও আছেন। উপনিষদেও ব্রহ্মবিদ্যা-পরায়ণা নারীর সাক্ষাৎ যথেষ্ট পাওয়া যায়। তারপর কবে ও কি কারণে নারী ধর্মপথের অন্তরায় বলে গণ্য হলেন এবং কেন তাঁকে বর্জন করেই, একক পুরুষ এগিয়ে যেতে অভ্যস্ত হলেন মুক্তি ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের পথে, তা বলা শক্ত। সম্ভবত কৃচ্ছ্রতা ও আত্মপীড়নবাদী বৌদ্ধ-জৈনেরাই প্রথম একক সন্ন্যাসের প্রথা প্রবর্তন করেন, আর হঠযোগী, তান্ত্রিক ও কপাল-সিদ্ধাইরাই নিষ্কলুষ ব্রহ্মচর্যকে মুক্তির উপায় বলে প্রথম বোঝান। তারপর থেকেই ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস পরস্পরের পরিপূরক রূপে সমাজ-জীবনে চল হয়েছে এবং নির্বাণবাদী বুদ্ধ, অদ্বৈতবাদী শঙ্কর, প্রেমবাদী চৈতন্য, সকলেই ব্রহ্মচর্যাশ্রিত সন্ন্যাসকে জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করেছেন। এঁদের মধ্যে এক শঙ্করই ছিলেন চিরকুমার। বুদ্ধ ও চৈতন্য উভয়েই বিবাহিত ও পত্নীত্যাগী। বুদ্ধের পত্নী পরে ভিক্ষুণী সঙ্ঘে গৃহীতা হয়ে, স্বামীর সাধনার সমাংশভাগিনী হয়েছিলেন, কিন্তু চৈতন্য পত্নী নবদ্বীপেই নির্বাসিতা হয়ে থেকেছেন সারা জীবনের জন্যে।

বস্তুত ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসের নির্বিশেষ কোন মূল্য আছে কি না এবং তা-ই মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায় কিনা, তা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। এখানে শুধু এই কথাই বলতে চাইছি যে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসের খড়্গে নিরপরাধ কোন নারীকে উৎসর্গ করা বড়ই নিষ্ঠুর। আর সে নিষ্ঠুরতা বোধহয় প্রয়োজনও নয়। আমাদের আদি কালের ঐতিহ্যসম্মতও ", নয়! জড় ও চেতনা, প্রকৃতি ও পুরুষ, এ দুই নিয়েই সংসার এবং বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে স্থূল রূপে যা জড়, দিব্য রূপে তাই চেতনা। এরা একে অন্য হতে অভিন্ন এবং অচ্ছেদ্যও। কাজেই পুরুষকে নারীর ও নারীকে পুরুষের সংস্রব থেকে মুক্ত করা ত প্রাণ-ধর্ম সম্মত

নয়, তার প্রতিকূলই। এরা দুইয়ে মিলেই এক এবং সেই একত্বই প্রয়োজন যে-কোন বৃহৎ বা মহৎ কাজের জন্যে। চিদানন্দময় পরম পুরুষ কৃষ্ণের সঙ্গে হ্লাদিনী শক্তি রাধার মিলনকে মুক্তিতত্ত্ব রূপে দর্শনায়িত করে, মহাপ্রভুই ত মানুষকে তা সব চেয়ে ভালো করে শিক্ষা দিয়েছেন। সেই প্রেমাবতার ও প্রেম-দার্শনিকই কেন যে আপন পরমা প্রকৃতি বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিজ জীবন থেকে পৃথক করে রাখলেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবরাও কেন যে তাঁকে সেই অনাদৃত অন্ধকার থেকে কোন দিন আর আলোয় আনলেন না, সে প্রশ্নের উত্তর 'উজ্জ্বল নীলমণি', 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু', 'ষট্‌সন্দর্ভ', 'চৈতন্যচরিতামৃত' কোথাও পাই নি! অনুগা ভাবের এত বড় দৃষ্টান্ত উপেক্ষিত হয়েছে।

আসলে বোধ হয় পাওয়ার সাধনাকে প্রকৃত পাওয়ার চেয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা চিরদিন বড় করে দেখেন বলেই, বিরহকে তাঁরা শাশ্বত ভাব রূপে প্রচার করেন। আর এই শাশ্বত বিরহের প্রতিমূর্তি রূপেই তাঁরা সৃষ্টি করেছেন রাধাকে। কর্মময় পুরুষ কর্মের তপস্যায় মথুরায় চলে গেলেন, রসের বৃন্দাবনে ভাবময়ী রাধা আরাধনার দীপ জ্বালিয়ে করতে লাগলেন তাঁর সুচির প্রতীক্ষা. এই ত হল বৈষ্ণব ভক্তি-সাধনার মূল ভিত্তি। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে ভক্তেরা এই ভাব-সাধনারই মূর্ত বিগ্রহ বা 'রাধাভাব-দ্যুতিচোরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলেন। কাজেই তাঁর যিনি রাধা, সেই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াও শ্রীমতী রাধার অনুকল্পা রূপেই গৃহীতা না হবেন কেন? প্রভু চৈতন্য পুরুষোত্তমে চলে গেলেন প্রেমের মন্ত্রে মানব-জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে, আর মায়াপুরে মায়ারূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া অশ্রুর অর্ঘ্য সাজিয়ে বসে রইলেন, সেই লোকপাবনকে চিরদিনের জন্যে চিত্তের মণিকোঠায় জাগরূক রেখে! এই শাশ্বত প্রতীক্ষা, এই অনন্ত বিরহ যুগ থেকে যুগান্তরে বয়ে চলেছে, এর ছেদ নেই। তাই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া কোন দিন বড় হন না, তিনি চিরদিন বিষণ্ণ বেদনার প্রতিমূর্তি অশ্রুমুখী বালিকা। কেন না তিনি ত মানবী নন, দেবীও নন, তিনি একটি মানবায়িত ভাব, আর সে ভাব হচ্ছে নিত্য সিদ্ধ, তদ্গতচিত্ত তপস্যার ভাব। এই ভাব ব্যাহত হত বোধহয় বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রটি আরো অধিক দূর অঙ্কিত করে দেখানো হলে।

কিন্তু আগেই বলেছি, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী দেখলে, বিষ্ণুপ্রিয়াকে আমার বড়ই অনাথিনী, বড়ই অবিচারিতা মনে হয়। মনে হয়, যিনি সমস্ত জগৎকে ত্রাণ করলেন, আপন সহধর্মিণীকে হৃদয়ভেদী বিরহ ব্যথা থেকে

কেন ত্রাণ করলেন না তিনি ? আদ্বিজ চণ্ডালে প্রেম দিলেন যিনি, তিনি প্রেম-পিপাসু এক মুগ্ধা তরুণীর শুষ্ক হৃদয়ে কেন কয়েক বিন্দু প্রেমামৃত সিঞ্চন করলেন না ? প্রভু নিত্যানন্দের মনে আসক্তি আছে জেনে, যিনি তাঁকে সন্ন্যাসাশ্রম থেকে সংসারে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই দয়ার অবতারের কাছে সংসারের অজস্র কামনা নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন যে সরলা বালিকা, তাঁরি একান্ত আশ্রিতা রূপে, তাঁর নারী-হৃদয়ের নিভৃত সংসার-বাসনা কেন এতটুক সম্মান পেল না ?

আগেই বলেছি, বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় বাল্যের সেই দেওয়ালের ছবি থেকে, আর শিবনাথ শাস্ত্রীর সেই কবিতা থেকে। তাই সমস্ত অধ্যয়ন, চিন্তন ও বাদ-বিতর্ক অতিক্রম করেই, চিত্তে তাঁর সেই করুণ-মধুর রূপটি আমার আজও গুঞ্জরণ করে ফেরে। মনে হয়, বিষ্ণুপ্রিয়ার হয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে কলহ করার জন্যে কেন আমি সে-যুগে জন্মগ্রহণ করলাম না ?

রামপ্রসাদ : জীবনে ও সাহিত্যে

॥ ১ ॥

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবন ও রচনা এবং তাঁর সমসাময়িক কালের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নূতন করে চর্চার প্রয়োজন আছে। রামপ্রসাদই একমাত্র কবি, যাঁর স্বীকৃতির আসন বাংলার ঘরে ঘরে বিছানো। গ্রামের চাষী ও কারিগরের কুটীরে, মাঝির নৌকায়, গাঁয়ের হাটে ও গঞ্জের মেলায় যেমন তিনি গানের মাধ্যমে দেখা দেন, তেমনি দেন সহুরে গানের মজলিসে, গৃহস্থ বাড়ীর শান্ত পরিবেশে, সংস্কৃতি-সেবীর আলোচনা বৈঠকে। সাধু-সজ্জন তাঁর রচনায় পান মহৎ তত্ত্ব, শোকার্ত ব্যথাহত সংসারী পান সান্ত্বনা। শিল্প-রস সন্ধানী যুবা পান অভিনব একটি সুর, আর পান খাঁটি বাংলা বাক-ভঙ্গীর এবং ঘরোয়া প্রবাদ-প্রবচন ও শব্দ-পর্যায় গঠনের অভিনব নিদর্শন।

একাধারে এমন তেতলা বটতলায় সমান সম্মানিত সর্বজন গৃহীত কবি বাংলা ভাষায় আর কে? কৃত্তিবাস, কাশীদাস ও মুকুন্দরাম প্রভৃতির মাধ্যমে ছড়িয়েছেন সর্বজনের মধ্যে, এ কথা ঠিক এবং বাংলার সামাজিক ও নৈতিক গঠনে এ তিন কবির দানও অপরিসীম, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এঁদের রচনা দীর্ঘ এবং পুঁথি-নিবদ্ধ, তাই পঠনশক্তি হীন সাধারণ মানুষ তার প্রভাব পেয়েছেন, কবিদের অন্তরঙ্গ করে পাননি। এই জায়গায় পদাবলীকার চণ্ডীদাসই একমাত্র কবি, যাঁকে রামপ্রসাদের মতো সর্বজনাদৃত বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের প্রবল কচকচি চণ্ডীদাসের ব্যক্তি-স্বরূপটিকে প্রায় ধূমাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তর্ক বেধেছে চণ্ডীদাস এক জন, না দুজন, না তিন জন, তা নিয়ে এবং আজও সমাধান হয়নি তার। তাছাড়া চণ্ডীদাস সুবৃহৎ পদাবলী সাহিত্যের মালায় অদ্বিতীয় একটি ফুল, তবু তাঁর দোসর আছেন জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, শেখর ও লোচন। আছেন আরো অনেক পদকর্তা।

রামপ্রসাদ এ জায়গায় একমেবাদ্বিতীয়। তাঁর পাশে কমলাকান্ত বা দাশরথি বা নরচন্দ্র বা নন্দকুমারের শ্যামাসঙ্গীত ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক সঙ্গীত নিতান্ত সাধারণ স্তরের মনে হয়। যে প্রাণের আবেগে উৎসারিত হয়েছে রামপ্রসাদের গান, গ্রাম্য শব্দ, দেশজ অলঙ্কার ও ঘরোয়া চিত্র-প্রতীক আশ্রয়

করে স্নিগ্ধ সহজতায় বয়ে এসেছে যা গ্রামের নদীটির মতো, তা পরবর্তীদের অনুকরণ সঞ্জাত আড়ষ্ট গানে পাওয়া যাবে কোথায় ?

এই জন্যেই আজ লোক-সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের এবং সাধারণ মানুষ ও উঁচু পদবীর মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার সেতু-বন্ধনের দিনে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদকেই নির্বাচন করেছি আমরা খাঁটি বাংলার প্রতিনিধি কবি রূপে এবং যে প্রীতির পটভূমিতে সমাসীন রয়েছেন তিনি বাঙালীর মনোলোকে, তার পরিচয়টি স্পষ্টতর ও সজীবতর করে তুলতে চাইছি। এ কাজ সুরু করেছিলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম পথিকৃৎ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর আমল থেকে আমাদের আমল পর্যন্ত চলেছে সাহিত্যিক বাঙালীর রামপ্রসাদ-চর্চা। সেই শতাব্দীব্যাপী অনুশীলনের নিষ্কর্ষ তুলে ধরাই হচ্ছে এই নিবন্ধের প্রধান লক্ষ্য ; সেই সঙ্গে যেটুকু নূতন আলোকপাত করা যাবে, সেইটুকু উদ্বৃত্ত লাভ।

॥ ২ ॥

রামপ্রসাদ জন্মেছিলেন নবাবী আমলের শেষে ও কোম্পানী আমলের সূচনা কালে। জাতীয় জীবনের দিক থেকে সেটা ছিল একটা অন্ধকার যুগ। মধ্যযুগে নিগম, নব্যন্যায় ও গৌড়ীয় দর্শনের স্তন্যরসের তৈরী হয়েছিল বাঙালীর যে মননশীলতার কাঠামো, নৃত্যে, গীতে, ছবিতে, ভাস্কর্যে, কারু-কর্মে উৎসারিত হয়েছিল যে মনের সৃজনশীল রূপটি, তাকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে আনছিল মুসলীম শাসনের অকর্মণ্যতা। সামাজিক অবিচার-প্রপীড়িত নিম্নবর্গের হিন্দুরা রাজশক্তির পীড়নে প্রলোভনে মুসলমান হয়ে যাচ্ছিলেন দলে দলে। উঁচুবর্গের হিন্দুরা এক দিকে যেমন প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের জাত-ধর্ম আচার-সংস্কার বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, অন্য দিকে তেমনি ফর্সি টেনে ও ফার্সী পড়ে আধুনিক হবার সাধনায় তৎপর হয়েও উঠেছিলেন।

অর্থাৎ সংস্কৃতির রাজ্যে সেদিন দেখা দিয়েছিল চরম একটি অধঃপতনের অবস্থা। সেই সর্বদিকে অধঃপতিত শতকের মুখ্য কবি হলেন ভারতচন্দ্র, যাঁর কবি-কর্মে বাক-চাতুর্য ও অলঙ্কার নৈপুণ্য নিছক নাগরিক চটুলতা ও অশালীন সমাজ-চেতনার বাহন রূপেই মূর্তি ধরেছে। কিন্তু আশা ও বিস্ময়ের কথা যে তাঁরি পাশাপাশি ছিলেন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ, যিনি দায়ে পড়ে একদিন নাগরিক ন্যাকামি, বোকামি ও বয়াটেপনার কাহিনী লিখলেও, বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্

অকৃত্রিম নিষ্ঠায় আঁকড়ে রেখেছিলেন, তাকে অকপট আন্তরিকতায় ভাষা দিয়েছিলেন। ন্যায়শাস্ত্র, তন্ত্র ও গৌড়ীয় দর্শন, তিনেরই পাঠ নিয়েছিলেন তিনি। আবার এ তিনকে অতিক্রম করে নিয়েছিলেন প্রাণ ও প্রকৃতির স্কুলের পাঠ। তাই এই ঘোরতর নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যের দিনে তিনিই একমাত্র আশার বাতি রূপে একা জ্বলেছেন!

দুঃখের কথা যে সাম্রাজ্যবাদী বণিক জাতি সারা দেশে সেদিন তুলেছিল চরম এক বিপর্যয়ের ঝড় এবং সাংস্কৃতিক-নোঙরহীন জাতীয় তরী তার ধাক্কায় দিক-বিদিক হারিয়ে ভেসে গিয়েছিল অকূলের মুখে! কেউ তাকে ঠেকাতে পারেনি। রামপ্রসাদের শুদ্ধ-দীপের দ্যুতিটুকু অবশ্য রক্ষা পেয়েছিল, সম্বলহীন সামর্থ্যহীন সাধারণ মানুষদের চেষ্টায়। কিন্তু তা মেলে ধরতে পারেনি কোন পথের দিশা, সঞ্চার করতে পারেনি কোন আশা বা পৌরুষের প্রেরণা, বিভ্রান্ত দেশবাসীর সামনে। যদি তা পারত, শক্তি-উপাসক রামপ্রসাদের শাক্ত-চেতনা যদি উদ্বুদ্ধ করত দেশকে, তাহলে হয়ত ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য ভাবে লেখা দরকার হত। কিন্তু যা হয়নি, তা হয়নি! তবু আনন্দের কথা যে রামপ্রসাদের গানগুলি শুভ্র শতদলের মতো মহাকালের স্রোতে ভেসে আমাদের কাল পর্যন্ত চলে এসেছে। না যদি আসত, তাহলে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রই একা হাজির থাকতেন ইতিহাসের সিংহ-দুয়ারে সেই নবাব ও কোম্পানী যুগের অনন্ত সাক্ষী রূপে!

॥ ৩ ॥

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের জীবন বৃত্তান্ত দীর্ঘ নয়, তাতে নূতন আলোকপাতও বেশী হয়নি এই দুশো বছরে। মোটামুটি তথ্য, হালিসহরে তাঁর জন্ম। পারিবারিক বৃত্তি ছিল চিকিৎসা। তারি প্রয়োজনে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদ পড়েছিলেন। আবার তখনকার সরকারী ভাষা ফার্সীও শিখেছিলেন। কিন্তু নবাবের পতন হল পলাশীর যুদ্ধে এবং বিজয়ী কোম্পানী পত্তন করল তার নূতন বাণিজ্য-নগরী কলকাতার, যা আসলে আদি কালিঘাটারই রূপান্তরিত উচ্চারণ। ফলে দেশের জীবন-ধারাই গেল আমূল পাল্টে। গ্রামের বৃত্তি-ব্যবসা ও বিষয়-আশয় ফেলে বহুজন চলে এল কলকাতায়, কোম্পানীর সওদাগরি কারবারে বানিয়ান, মুৎসুদ্দি ও দুভাষী হতে। বহু জন এল সাধারণ রুজি-

রোজগারের ধান্দায়। পুরানো সমাজ ভেঙে দেখা দিল নূতন কলকাতিয়া সমাজ। ধীরে ধীরে তৈরী হতে লাগল নূতন শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবন-দর্শনের বনিয়াদ।

এই নূতন সমাজে এসেছিলেন রামপ্রসাদও। হাটখোলার কোন গোলায় হিসাব পরীক্ষক হয়েছিলেন। সে কাজে মন টি ঁকল না। ফিরে গেলেন হালিসহরে, সাহিত্য ও সঙ্গীত-চর্চায় মন দিলেন। কৃষ্ণনগর রাজসভায় ডাক পড়ল। গেলেন সেখানে। ভারতচন্দ্র, রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ও গোপাল ভাঁড় অধ্যুষিত সভায় বসে লিখলেন তিনিও এক বিদ্যাসুন্দর কাব্য। কিন্তু না, মন টি ঁকল না এখানেও। বেরিয়ে চলে এলেন তিনি সভা থেকে, দাঁড়ালেন মাঠের মাঝে, নদীর ধারে, নীল আকাশের নীচে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সমৃদ্ধি, পদগৌরব, সব সরে দাঁড়াল দূরের পর্দায়। জাগ্রত জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠল চোখের সামনে পৃথিবীর সত্য রূপটি। জীবনের সব রহস্য ধরা পড়ে গেল তাঁর জিজ্ঞাসু মনের আয়নায়। নির্মুক্ত নির্মল আত্মতৃপ্তিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি নিজের আগেকার সব রচনা—

গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি
গানে হব মত্ত!

সেই মত্ত রামপ্রসাদের গান শুনেছিলেন নবাব সিরাজদ্দৌল্লা। শুনেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র, ক্লাইভ, শুনেছিলেন ভারতচন্দ্র। আজও সেই আর্তি, আকুতি ও আন্তরিকতা ভরা সুর শোনা যাচ্ছে বাংলার মাঠে ঘাটে, গ্রামে সহরে। এ যুগে রবীন্দ্রনাথ ও সে-যুগে রামপ্রসাদ, বাঙালীর প্রাণ-লোককে পূর্ণ করে রেখেছেন এই দুজনেই গানের পরম পথ্য জুগিয়ে। এত বড় দুজন গীতকার ও সুরকার কবি বাংলার কেন, পৃথিবীর কোন দেশেই বোধ হয় এত অল্প সময়ের ব্যবধানে জন্মাননি। আরো লক্ষণীয় যে রামপ্রসাদ যেমন নিজেই একটা ধারা, রবীন্দ্রনাথও তাই এবং রবীন্দ্রনাথ শততন্ত্রী হলেও, একটি তন্ত্রী তাঁর অনুরণিত হয়েছে রামপ্রসাদের সুরেও। এ ঋণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেই দুটি যুগকে গানের সাঁকোয় সংযুক্ত করে গেছেন মহাকবি।

অনেকে রামপ্রসাদকে বলেন সাধক এবং বলেন বালিকা বেশে কালিকা এসেছিলেন তাঁর ঘরে। সাধক ত বটেনই তিনি। কোন মহৎ কবি সাধক নন? জীবন ও জগৎকে সার্থক উপলব্ধিই ত সাধনা। আর বালিকাকে

কেউ কালিকা, কেউ রাধিকা রূপেই ত দেখেন কবিরা। এ দুই ছাড়া আর কোন রূপ আছে আদ্যাশক্তির, যা কবিকে, শিল্পীকে, ভাবুককে আকর্ষণ করেছে যুগে যুগে ? দান্তের বিয়াত্রিচে, চণ্ডীদাসের রামী, রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি এক দিকে, আর এক দিকে কালিদাসের উমা, র‍্যাফেলের মাদোনা, রামপ্রসাদের কালিকা···এঁরা কি একই সত্তার নানা মুখী প্রকাশ নন ? তন্ত্রও ত এই কথাই বলেছেন—

আমি সেই এক, যাকে নানা জন দেখে নানা রূপে,
পূজা করে নানা নামে !

পর্যটন সাহিত্য

অতি পুরানো কাল থেকেই এক দেশের মানুষ আর এক দেশে গেছেন হয় বণিক রূপে, নয় অভিযাত্রী সৈনিক রূপে, নয় ধর্মপ্রচারক রূপে। ফিনিসিয়ান ও আরবরা দেশে দেশে জাহাজ ভাসিয়ে গেছেন বাণিজ্য করতে। গ্রীকরা, হূণরা, তাতাররা গেছেন রাজ্য স্থাপন করতে। বৌদ্ধ, জৈন ও খৃষ্টানরা গেছেন ধর্মপ্রচার করতে।

এই ভাবেই দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে যোগাযোগ হয়েছে। পরস্পরের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। গ্রীকদের শিল্প-প্রভাব পারস্য, আফগানিস্থান ও উত্তর-ভারতে ব্যাপ্ত হয়েছে। কাশগড়, সিংকিয়াং দিয়ে মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করেছে। দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা ও আজতেক মুল্লুকে এবং পূর্ব-এশিয়ার আনাম, কম্বোজ, জাভা, মালয়ে হিন্দুধর্ম ছড়িয়েছে। ইসলাম সমগ্র পশ্চিম-এশিয়া প্লাবিত করে, উত্তর-আফ্রিকা পর্যন্ত হাত বাড়িয়েছে। খ্রীষ্টান সংস্কৃতি ছায়াপাত করেছে সারা দুনিয়াতে। আর এই ভাবেই হিন্দুর দর্শন, বীজগণিত, রসায়ন, চীনের রেশম-শিল্প, বারুদ, কাগজ, গ্রীকের নাট্যমঞ্চ, যুদ্ধ-ব্যূহ, আরব-মুসলমানের বাণিজ্য রীতি তামাম পৃথিবীতে মানব সভ্যতার আদি বনিয়াদ গড়েছে।

এই যে বহু-বিস্তৃত আনাগোনার ইতিহাস, উন্নত জলযান, বিমান, বেতার ইত্যাদি জন্মের শত শত বৎসর আগে গড়ে উঠেছে, এ প্রমাণ করে যে মানব জাতি একে অন্যকে জানতে, বুঝতে ও ভালোবাসতে চেয়েছে স্মরণাতীত কাল থেকেই এবং সেই জানার আগ্রহ ও ভালোবাসার স্পৃহাই প্রেরণা জুগিয়েছে তার সভ্যতার মূলে। এই বিপুল আনাগোনার ভেতর দিয়েই গড়ে উঠেছে মানবজাতির আর একটি মহৎ সম্পদ, সে হল তার পর্যটন সাহিত্য।

বাল্যে মেগাস্থিনিস, ফা হিয়ান, ইউয়ান চুয়াং, ইৎসিন, ইবন বতুতা, আল বরুণী, হকিন্স, বার্ণিয়ার, ট্রাভার্নিয়ার প্রমুখের ভারত-বিবরণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সবাই পড়েছেন ইতিহাসের পাঠ্য হিসাবে। আলেকজেন্দারী ফৌজের সঙ্গে এসেছিলেন মেগাস্থিনিস। ফা হিয়ান এসেছিলেন গুপ্ত আমলে, ইউয়ান চুয়াং হর্ষবর্ধনের সময়। ইবন বতুতা ও আল বরুণী পাঠান নামে ভ্রমক্রমে

পরিচিত তুর্কীদের আমলে এবং বাকীরা মুঘলদের আমলে। এঁদের ভারত বিবরণ সমসাময়িক কালের বৃত্তান্ত হিসাবে মূল্যবান দলিল ত বটেই, বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি, মননশীলতা ও জীবন-দর্শনের আলেখ্য হিসাবেও উল্লেখযোগ্য। যদিও অবশ্য অলীক এবং আজগুবি জিনিষও আছে এঁদের অনেক বিবরণে। যেমন মেগাস্থিনিস বলেছেন, দক্ষিণ-ভারতে এক জাতির মানুষ আছে, যারা ঘুমোবার সময় দু-দিক থেকে দুটি কান বাড়িয়ে নাক-চোখ ঢেকে রাখতে পারে। ইবন বতুতা বলেছেন, নরমাংস ভোজীর বৃহৎ একটা অংশ আছে হিন্দুদের মধ্যে এবং তারা পুরুষের চেয়ে নারীর মাংস বেশী পছন্দ করে।

প্রাচীন কালের পৃথিবীতে যখন বিজ্ঞান-বোধ মানুষের পরিস্ফুট হয় নি, যান-বাহন ব্যবস্থাও ছিল নিতান্ত অনগ্রসর, তখন গাল-গল্প ও কিম্বদন্তীর ওপর নির্ভর না করে ত উপায় ছিল না মানুষের! তাই মার্কো পোলের হাঁটাপথে চীন যাত্রা এবং জলপথে কলাম্বুসের আমেরিকা যাত্রার বা ভাস্কোদাগামার গোয়া অভিযানের কাহিনীর সঙ্গেও অনেক অলৌকিক কাহিনী সংযুক্ত হয়েছে। হয়েছে হকলয়েট, ড্রেক, র‍্যালে প্রভৃতির ভ্রমণের সঙ্গেও। দিগ্বিজয়ী •বীরদের এলডোরোডোর স্বর্ণমুল্লুক বা স্বর্ণ-পালক যুক্ত বার্ড-অব-প্যারাডাইস খোঁজার এবং সে জন্যে দেশে দেশে নানা বিচিত্র মানুষের সঙ্গে লড়াই করার কাহিনী নিয়ে ত ইউরোপে কত কাব্য-গাথাই লেখা হয়েছে যুগে যুগে। এই সব কাহিনী যে নেহাৎ কল্প-কথা, সেদিন তা কেউ ভাবেন নি। তাই আমাদের শ্রীমন্ত সওদাগরের কমলে কামিনী দেখার মতো জলে লেভিয়াথান, স্থলে ড্রাগন, স্যাংটুর ইত্যাদি দেখার গল্প বলে সেদিন বিপন্ন হয়েছেন অনেকে। কেউ কেউ প্রাণ পর্যন্ত হারিয়েছেন।

তবু এই অনগ্রসর পুরনো দিনেই মানব ইতিহাসে জ্ঞানের এমন অনেক বৃহৎ ও মহৎ সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে, যার কথা ভাবলে বিস্ময় লাগে। আর তা হয়েছে এই পর্যটনের মাধ্যমেই। অশোকের সনদ নিয়ে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা গেছেন সিংহলে। শৈলেন্দ্রেরা স্থাপন করেছেন পূর্ব-এশিয়ায় হিন্দু উপনিবেশ। আগে আরব মপিল্লারা, তারপর সেন্ট টমাসের অনুগামীরা মালাবারে পদক্ষেপ করেছেন। জিঙ্গীজ খাঁ, কুবলা খাঁ মুঙ্গলিয়া থেকে পূর্ব-ইউরোপ পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছেন হাঙ্গারীতে। শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর গেছেন তিব্বতে। দক্ষিণ-ভারতের শঙ্করাচার্য এসেছেন উত্তর-ভারতের কেদারবদরী পর্যন্ত। স্পেন, গ্রীস, আলবানিয়া পর্যন্ত চলে গেছেন আরবরা। মানবেতিহাসের এক-একটি নূতন

দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে এই সব আনাগোনার ভেতর দিয়ে। যদি চীন-ভারত, ভারত-ইউরোপ, ইউরোপ-আরব এবং আরব-পূর্ব-এশিয়ার সাংস্কৃতিক সাহিত্য আদ্যন্ত মন্থন করা যায়, তাহলে পাওয়া যাবে কি-কি জ্ঞানের সমৃদ্ধি লাভ করেছে মানুষ এই পর্যটনের পথে। এখনো সামান্য কিছু যা মানুষের হাতে এসেছে, সে ঐ মেগাস্থিনিস, ইউয়ান চুয়াং, আল বরুণী, ইবন বতুতা প্রমুখের ভ্রমণ কাহিনী। হয়ত আরো আছে, যা আজও আবিষ্কৃত হয়নি।

ইতিহাসের যে অধ্যায়কে আমরা প্রাচীন বলি, তার কীর্তি মোটামুটি এই। মধ্যযুগের শেষপাদ থেকে চাকা উল্টো মুখে ঘুরল। উন্নত জলযান ও দিগ-দর্শন যন্ত্র, সেই সঙ্গে প্রবল আগ্নেয়াস্ত্রের পুঁজি নিয়ে দিকে দিকে বেরুলেন অভিযাত্রীরা। তাঁরা সবাই ইউরোপীয়। স্প্যানিস, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ, কেউ পিছিয়ে থাকলেন না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে জলপথে আনাগোনার দ্বার খুলে গেল। আবিষ্কৃত হল আমেরিকা, হল আফ্রিকা। এশিয়ার সোনা-রূপা, মশলা, গজদন্ত, রেশম আকর্ষণ করল ইউরোপীয় সওদাগরকে। ঘাটে ঘাটে ঘাঁটি স্থাপন করলেন তাঁরা, গড়ে উঠল বড় বড় সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ এবং তা শোষণ চলতে লাগল নির্মম ভাবে। প্রথম অধ্যায়ে প্রাচ্য গিয়েছিল প্রতীচ্যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতীচ্য এল প্রাচ্যে।

সে দুর্দৈবের কথা থাক্। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির নানা দিকও উন্মুক্ত হল এই সঙ্গে, এ কে অস্বীকার করবেন? ভারতবর্ষের বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র, মহাভারত, রামায়ণ, কালিদাস, ভবভূতির সাহিত্য, অজন্তা, ইলোরা, এলিফেন্টার শিল্প-কলা, ভারতবর্ষের বৌদ্ধ, জৈন ও বৈষ্ণব জীবন-দর্শন ইউরোপে প্রচারিত হল। ইউরোপের রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা ও যান্ত্রিক সভ্যতা এল ভারতে, চীনে, জাপানে, মিশরে এবং আরো কোন-কোন মুল্লুকে। প্রাচ্য জেগে উঠল প্রতীচ্যের ধাক্কা খেয়ে। প্রতীচ্যও থমকে দাঁড়াল পরাভবের মধ্যেও প্রাচ্যের মননশীলতার মহত্ত্ব দেখে।

এই পটভূমিতে গড়ে উঠল একটা সম্প্রদায়, যাঁদের বলা যাবে ভ্রমণকারী বা ট্যুরিষ্ট। এঁরা অভিজেতা নন, যোদ্ধা নন, ধর্মপ্রচারক নন, বণিক নন, সদিচ্ছা সম্পন্ন অনুসন্ধিৎসু ভদ্রলোক। বিভিন্ন দেশ দেখা, বিভিন্ন জাতির জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করা, বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাণ-বস্তু সংগ্রহ করা, এ-ই হল এঁদের লক্ষ্য। এঁদের মধ্যে কেউ কবি, কেউ শিল্পী, কেউ আইনবিৎ—

কেউবা অবসরভোগী সাধারণ মানুষ। জাহাজ থেকে বিমানে যাত্রাপথের ক্রমোন্নতি, যাতায়াতের সময় ও ব্যয়ের প্রচুরতা হ্রাস এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি এক দিকে, অন্য দিকে বিদেশী ভ্রমণকারীদের খাওয়া, থাকা ও বেড়ানোর জন্যে উন্নত দেশগুলিতে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার ফলে এ যুগে এই সম্প্রদায়ের সংখ্যা খুব বেড়েছে ঠিকই। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই এঁদের দেখা পাওয়া গেছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুই মুল্লুকেই।

এই নূতন যুগের পর্যটক হিসাবে ভারতবর্ষে প্রথম প্রখ্যাত লোক হলেন রামমোহন রায়। তাঁর আমল থেকে কেশব সেন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও নেহরুজীর আমল পর্যন্ত, ভারতবর্ষে স্মরণীয় পর্যটক কম দেখা দেন নি। তিব্বতে শরৎ দাস, ব্রেজিলে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস, রাশিয়া ও মেক্সিকোয় মানবেন্দ্র রায় যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তার কথা কে না জানেন? ছোটখাটোর মধ্যে ইন্দুমাধব মল্লিক এবং রামনাথ বিশ্বাসের কথাও ভুলে গেলে চলবে না। এঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের দর্শন ও মননকে সাহিত্যের মধ্যে রূপ দিয়েছেন, যা আমাদের ভাষার সম্পদ বলে গণ্য হবার যোগ্য।

ইউরোপীয়দের নামের তালিকা দিয়ে শেষ করা যাবে না। ভ্যান হেডেনের মধ্য-এশিয়া সম্বন্ধীয় এবং লরেন্সের পশ্চিম-এশিয়া সম্বন্ধীয় রচনাগুলির সঙ্গে কার না পরিচয় আছে? উইলসন, উইলিয়াম জোন্স, মনিয়ার উইলিয়মস, উড্রফ প্রমুখের আমল থেকে পার্সি ব্রাউন, ভ্যান মেনন, উইণ্টারনিৎস, সিলভাঁ লেভী, ফর্মিকি, লেজনী, এণ্ড্রুজের আমল পর্যন্ত, ভারতে যে-সব পণ্ডিত প্রতীচ্য ভ্রমণকারীর আবির্ভাব হয়েছে, তার ইতিহাসও শিক্ষিত ব্যক্তিকে বলতে হবে না। চীন, জাপান, পারস্য, মিশর এবং আফ্রিকার দুর্গমতম মুল্লুকের নানা স্থানেও প্রখ্যাত ভ্রমণকারীর আনাগোনা ঘটেছে প্রচুর। তার কিছু-কিছু বিবরণও সবাই জানেন। যে বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছে দেশে দেশে এই বিচিত্র মানুষের পর্যটনকে কেন্দ্র করে, তার সমগ্র ইতিহাস সংগৃহীত এবং আলোচিত হবার মতো। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে এই যে এতটা জানাজানি, এর মূলে আছে এঁদেরই দর্শন ও মনন জাত রচনার প্রভাব।

কিন্তু চলতি বাজারে আর এক রকম বই প্রতিনিয়ত লেখা হয়, তার নাম ট্রাভেল লিটারেচার বা ভ্রমণ সাহিত্য, যা শুধু ওপর-ওপর ঘোরা ও দেখার কাহিনীই পরিবেশন করে, দৃষ্ট স্থানের আত্মাকে উদ্ঘাটন করে দেখাতে পারে

না। রসেটা ফরবেসের বা বেভার্লি নিকলসের লেখা বা এই রকম আর যে-সব লেখা হর-হামেশা হাতে পড়ে, আমি বলছি তার কথা। তাই বলে অলডাস হাক্সল্যের 'জেষ্টিং পাইলেট'কে কেউ যেন এই পর্যায়ভুক্ত করবেন না। তা সত্যিকার সাহিত্য, বাজার-চলিত ভ্রমণ সাহিত্য নয়। ইদানীং আমাদের দেশেও এই জাতের লেখা বেরোয় প্রচুর। এক মাস দু-মাস তিন মাসের ছক-বাঁধা দর্শন ও ভ্রমণের পুঁজি নিয়ে ও তার সঙ্গে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে লেখকরা সরস কাহিনী লেখেন। লোকেও তার তারিফ করেন। কিন্তু সে-কাহিনী না দেয় মনকে কোন জ্ঞানের সঞ্চয়, না করে বুদ্ধির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ। এ জিনিষ হল সেই বহু-নিন্দিত শর্ট-কাটের মতো, যাতে লেখক মূল বই না-পড়া পরীক্ষার্থীকে পাশের হদিশ বাৎলে দেন, নিজেও বিষয়টি সম্যক না বুঝে। সে-কালের ইউয়ান চুয়াং, আল বরুণী, এ কালের ভ্যান হেডেন, লরেন্স ও শরৎ দাস এ কাজ করেন নি, তাই তাঁরা পর্যটক। তাঁদের রচনা মানুষের কাছে প্রামাণ্য দলিল। এ রকম পর্যটন সাহিত্য আমাদের ভাষায় প্রচুর লেখা হক, এই কামনা করি।

রহস্য ও রোমাঞ্চ রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

রহস্য ও রোমাঞ্চের আকর্ষণ মানুষের বোধ হয় জন্মগত। যা স্পষ্ট, যা প্রত্যক্ষ, যা রয়েছে বা ঘটছে চোখের সামনে, মানুষ তার মধ্যে হয়ত স্বস্তি পায়। কিন্তু তার স্বপ্ন ধাবিত হয় অবাস্তব, অসম্ভব ও অসচরাচরের দিকে। সাহিত্য ও শিল্পের রাজ্যে মানুষ স্রষ্টা রূপে এই অসম্ভব, অলৌকিক ও অসচরাচরকে অনেক সময় যে সযত্নে রূপ দেয়, সে তার এই অন্তর্নিহিত অবাস্তবতা-প্রীতি থেকেই এবং পাঠক রূপে বা দর্শক রূপে মানুষ যে তা উপভোগ করে, সে-ও এই অসম্ভবের ক্ষুধা চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই।

সাহিত্যের রাজ্যে রহস্যজনক খুন, ডাকাতি ও জালিয়াতির এবং সেই জটিল রহস্য ভেদের জন্যে বুদ্ধিমান মানুষের বিচিত্র কল-কৌশলের কাহিনী সারা পৃথিবীতেই দরাজ হাতে লেখা হয়েছে, আজও হচ্ছে। দুর্গম, দুরধিগম্য, বিপদ-সঙ্কুল মুল্লুকে দুঃসাহসী মানুষের অভিযানের কাহিনী সত্য-অসত্যের বাঁধা সড়ক লঙ্ঘন করেই ব্যাপক সমাদরে গৃহীত হয়েছে ও হচ্ছে গোটা দুনিয়াতে। ভৌতিক ও অর্ধ-ভৌতিক আজগুবি গল্পও সত্যের মতো সহজ অনুরাগে স্থান করে নিয়েছে ও নিচ্ছে বিচারশীল পাঠকের মনে।

কোনান ডয়াল, আগাথা ক্রিষ্টি, এডগার ওয়ালেস রচিত গোয়েন্দা কাহিনী ইংরেজী ভাষাভাষী দুনিয়ায় বাইবেলের চেয়ে কম সংখ্যায় পঠিত হয় না। ষ্টিভেনসনের 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' এবং রাইডার হ্যাগার্ডের 'শী' অথবা 'সলোমনের রত্নাগার' প্রভৃতি য়্যাডভেঞ্চার কাহিনী মাত্র সেদিনও লাখ লাখ লোকের আনন্দ বর্ধন করেছে। এড্‌গার য়্যালান পো এবং তিওফেল গতিয়ের ভৌতিক কাহিনীর অনুরাগী ছিলেন জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত থেকে স্থরু করে হিটলার-মুসোলিনীর মতো বিশ্বত্রাস যোদ্ধারাও। এ-থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, সাহিত্যের যে বিভাগটির উদ্দেশ্য প্রমোদ পরিবেষণ করা, তার বৃহৎ একটা অঙ্গই হল রহস্য-রোমাঞ্চ ও দুঃসাহসিক কাহিনী। প্রাচীন যুগে, মধ্য যুগে ও আধুনিক যুগে তার ভোল বদল হয়েছে হয়ত, কিন্তু জিনিষটা স্বীকৃত হয়েছে সব যুগেই।

এই বিভাগে বাংলা সাহিত্যের পুঁজি কি ও কতটা, তার একটা খতিয়ান সংক্ষেপে বানানো যেতে পারে। বাংলা ভাষায় গোয়েন্দা কাহিনী লিখে

খ্যাতিমান হয়েছেন পাঁচকড়ি দে, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ প্রাগাধুনিক যুগের লেখকরা। হাল আমলে এঁদের ধারা রক্ষা করেছিলেন শশধর দত্ত। দীনেন্দ্রকুমারের রচনা সবই বিদেশী বইয়ের মর্মানুবাদ, যদিও পরিচ্ছন্ন বাংলায় লেখা সুখপাঠ্য বই তাঁর প্রত্যেকটাই। আর সকলের লেখারই যা-হক একটা স্বদেশী চেহারা আছে, যদিও এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে আখ্যান-বস্তুর রহস্যময়তায়, জটিলতার জাল উন্মোচনের কৃতিত্বে এ-সব বইয়ে সেই জাতীয় জম-জমাট ভাব নেই, যা মেলে শারলক হোমস্‌-এর অত্যাশ্চর্য গল্পগুলিতে।

দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প বাংলা ভাষায় বিশেষ লেখাই হয় নি কিছু আজ পর্যন্ত। ছোটদের উপযোগী উপভোগ্য গল্প লিখেছেন কিছু-কিছু হেমেন্দ্রকুমার রায়, যেমন 'যখের ধন', 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি। আর লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। বাঙালী লেখকের পর্যটন ও অভিজ্ঞতার পুঁজি সীমাবদ্ধ বলেই বোধ হয় মালয়ের জঙ্গল, সাহারার মরু অঞ্চল, বা আফ্রিকার কঙ্গো মুল্লুক নিয়ে প্রবীণ পাঠকের উপযোগী সার্থক বই লেখা সম্ভব হয়নি আজও।

ভূতের গল্পের অবস্থাও প্রায় একই। ছোটদের উপযোগী ভুতুড়ে গল্প প্রচুর আছে। ভালোও হয়েছে অনেক গল্প। কিন্তু 'ম্যমির পা' কিংবা 'কবর থেকে বেরিয়ে' জাতের সত্যিকার রোমাঞ্চকর ও সাহিত্যধর্মী গল্প আজও লেখার অপেক্ষায় আছে। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় 'দেবযান', 'দৃষ্টিপ্রদীপ' প্রভৃতিতে প্রেত অপেক্ষা প্রেততত্ত্বকে দিয়েছেন প্রাধান্য, তাই তা সে-অর্থে হয়নি ভূতের গল্প, যে-অর্থে আমরা নিই য়্যালান পোর বা গতিয়ের লেখাকে। কল্পনা-কুশলী হলেও, বাঙালী সাহিত্যিকের উদ্ভাবনী মেধা বোধ হয় অত বেশী সজাগ নয়।

সুতরাং ভূতের গল্প, দুঃসাহসের গল্প ও গোয়েন্দা গল্প লিখে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভের সুযোগ রয়েছে দেশে। গতানুগতিক পথে নিষ্ফল সামাজিক উপন্যাস লিখে জনতায় হারিয়ে না গিয়ে, কেউ কেউ এদিকে মন দেন, এ-ই আমার ইচ্ছা। মুস্কিল হয়েছে এই যে এই শ্রেণীর রচনাকে অনেকে উঁচু জাতের সাহিত্য-কর্ম বলে মনে করেন না। সাহিত্য বলতে তাঁরা বোঝেন উদ্দেশ্যপূর্ণ ভারী জাতের লেখা, যা ইংরেজীতে সীরিয়াস লিটারেচার নামে

অভিহিত। আসলে চিত্ত-বিনোদন ও রস-বোধের উজ্জীবনও যে সাহিত্যেরই অঙ্গ এবং স্বয়ং সেক্সপীয়ার ও গ্যেটে পর্যন্ত যে ভূতের প্রভাব কাটাতে পারেন নি, বিজ্ঞান-যুগের সাহিত্যিকরা তা ভাবতেই ভুলে গেছেন। প্রকৃত কল্পনা-শক্তি ও রস-সৃজন ক্ষমতার সংযোগ হলে যে এই পথেও স্থায়ী সাহিত্য করা যায়, তার পরিচয় ত আগেই দিয়েছি। সুতরাং কেজো লেখার নামে এই ছুঁৎমার্গ অর্থহীন।

বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠতম তিনজন সাহিত্যিক—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র কিন্তু এই শ্রেণীর রচনাকে উপেক্ষণীয় মনে করেন নি কোন দিন। ঠিক রোমাঞ্চ কাহিনী যাকে বলে, বঙ্কিম তা লেখেন নি অবশ্য। কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা'য় নির্জন সমুদ্রতীরবর্তী বালিয়াড়ির বুকে বিচরণশীল সেই ভয়ঙ্কর কাপালিক ও তার প্রতিপালিতা রহস্যময়ী কপালকুণ্ডলা কি এক আশ্চর্য রোমাঞ্চ কাহিনী নয়? এই বিচিত্র পটভূমিতে কত অনায়াসেই আরো জম-জমাট গল্প গড়ে তোলা যেত, যদি তা শিল্পীর অভিপ্রেত হত! ক্ষুদ্রকায় 'ইন্দিরা'র মধ্যেও বঙ্কিম দেখিয়েছেন দুঃসাহসিক ডাকাতি কি ভাবে একটি মনোরম রোমাঞ্চের অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে। এ গল্পকেও অনায়াসেই অন্য পথে নেওয়া যেত। বঙ্কিমের অসামাপ্ত 'নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয় ক্ষোভ করেছেন অমন সম্ভাবনাপূর্ণ রোমাঞ্চ রচনাটি শেষ হয়নি বলে।

রবীন্দ্রনাথ ত সরাসরি ভূত, য়্যাডভেঞ্চার এবং গোয়েন্দা গল্পই লিখেছেন। 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'নিশীথে' রহস্য-গল্প হিসাবে শুধু তাঁর নয়, পৃথিবীর সাহিত্যেই প্রায় অতুলনীয়। অদ্ভুত রহস্যাবৃত রোমাঞ্চে ও কাব্যময় জীবন-জিজ্ঞাসায় গল্প দুটি আজও রবীন্দ্রনাথের সেরা রচনা রূপে সকলের মন ভরে আছে। 'গুপ্তধন' তাঁর য়্যাডভেঞ্চার-ধর্মী গল্প। গোপনে রক্ষিত ধন-ভাণ্ডার আবিষ্কারের দুঃসাহসিক অভিযানকে তিনি একটি রূপকের আড়ালে প্রচ্ছন্ন রেখে পরিবেষণ করেছেন। মনে হয়, ইচ্ছা করলে 'সলোমনের রত্নাগার' জাতীয় বই লেখাও অসম্ভব হত না তাঁর পক্ষে। সঞ্চিত অর্থে যক্ষ-প্রহরী নিযুক্ত করার জন্যে আপন পৌত্রকে ভুলক্রমে ভূপ্রোথিত করার ভয়ঙ্কর গল্পটিও তাঁর সুবিদিত। আর গল্পগুচ্ছের 'ডিটেকটিভ' কে না পড়েছেন?

শরৎচন্দ্র কথা-প্রসঙ্গে একদা বলেছিলেন, গোয়েন্দা কাহিনী লেখার নাকি বিষম সখ ছিল তাঁর। কার্যত তা তিনি লেখেন নি অবশ্য কোন দিন। ভূতের

গল্প বা ভৌতিক পরিবেশের গল্পও জন্মায় নি কোন দিন তাঁর কলম থেকে। কিন্তু দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী লিখেছেন তিনি। (শ্রীকান্তের) ইন্দ্রনাথের সেই বিচিত্র নৌকা-বিহারের রোমাঞ্চক অথচ ভয়ঙ্কর কাহিনী কাকে না মুগ্ধ করেছে ?

এ থেকেই ধারণা করি, বঙ্কিমের মতো শরচন্দ্রও অনুভব করতেন রহস্য-রোমাঞ্চকে সাহিত্যে রূপ দেওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু দেশের শিষ্ট সাহিত্যে সে ধারা না থাকায়, তেমন উৎসাহ পান নি তাঁরা এ পথে। শুধু এই পথের আভাসই দিয়ে গেছেন এক-আধটু, যাতে অন্তত এইটুকু প্রমাণ হয় যে এদিকটাকে তুচ্ছ বা অকুলীন মনে করতেন না তাঁরা। সুতরাং আজকের লেখকদের দু-চারজনকে আমি নিঃসঙ্কোচে এই রাজ্যে কলম চালাতে পরামর্শ দিচ্ছি। অবশ্য আমার পরামর্শের অপেক্ষা না রেখেই আজ অনেকে এই পথে আগুয়ান হয়েছেন, সামর্থ্যে কুলালে যাঁদের সহযাত্রী হতে আমি সানন্দে প্রস্তুত ছিলাম।

ছোট গল্পের গুণ ও গোত্র

॥ ১ ॥

আজকের দিনে পৃথিবীর সব দেশেই সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় যা লেখা হয়, তা হল ছোট গল্প। গল্পের পরেই স্থান ছোট কবিতার। বলতে গেলে এই দুটো জিনিষই আজ সাহিত্য নামে অভিহিত এবং যাঁরা এই দুই বিভাগে কলম চালান, তাঁরাই সাহিত্যিক বলে পরিচিত। যাঁরা নাটক লেখেন, তাঁরা হলেন নাট্যকার। যাঁরা জীবনী, ইতিহাস বা দর্শন-বিজ্ঞানের বই লেখেন, তাঁদের বলা হয় প্রবন্ধকার, অথবা ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক। তাঁদের রচনাকে সাহিত্য পদবাচ্য মনে করা হয় না, সেই জন্যেই তাঁরা সাহিত্যিক আখ্যা লাভ করেন না!

এক হিসাবে এটা অযথার্থ হয়ত নয়। বিশুদ্ধ সাহিত্যের কারবার মানুষের হৃদয় নিয়ে। মানুষের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার যে জটিলতাকে জীবন বলে, সাহিত্য করে তারই ওপর আলোক পাত। তা বর্তমানের জীবনকে যেমন ব্যাখ্যা করে, ভবিষ্যতের জীবনকে তেমনি আনে স্বাগত করে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটক তৈরী হয় এই লক্ষ্য-বস্তু নিয়েই। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভাগ চলে বস্তু-বিচার আশ্রয় করে। সে বস্তু প্রাকৃতিক, নৈতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, নানা বিভাগের হতে পারে এবং কোথাও গবেষণা, কোথাও বিশ্লেষণ, কোথাও পরীক্ষণের মাধ্যমে পৌছানো হয় তাতে নিরূপিত এক-একটি সিদ্ধান্তে। কাজেই তার সঙ্গে থাকে মস্তিষ্ক-বৃত্তির যোগ, হৃদয়-বৃত্তির নয়। পরিভাষায় বললে বলা যেতে পারে সাহিত্য হল Subjective বা ভাবকেন্দ্রিক, আর অন্যান্য রচনা হল Objective বা বস্তুকেন্দ্রিক।

আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা এই প্রথম পর্যায়ের সমস্ত রচনাকেই বলতেন কাব্য। তাঁদের বিচারে কবিতা, নাটক, গল্প, আখ্যান, সবই ছিল কাব্য। তাঁরা কাব্যের লক্ষণ হিসাবে প্রাধান্য দিতেন রসকে এবং রস হল বস্তুকে আশ্রয় করে হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তি। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের এই শ্রেণী-বিন্যাসটি মানেন ফরাসীরাও। তাঁরাও কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প,

এ সমস্তকেই কাব্য পর্যায়ে ধরেন। আমরা এই কাব্যের নাম দিয়েছি সাহিত্য এবং সাহিত্য শব্দটি ইংরেজী Literature কথাটির প্রতিশব্দ বলে গ্রহণ করেছি, আর ইংরেজী অলঙ্কার শাস্ত্রের শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে কাব্য, নাটক ও কথা-সাহিত্যকে Literature নাম দিয়েছি। অন্যান্য শ্রেণীর রচনাকে আমরা সেই-সেই বিষয় অনুযায়ী নামে চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত হয়েছি। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে ইংরেজী Literature কথাটিও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই ইন্সিওরেন্স বা চিকিৎসা বিষয়ক পুঁথি-পত্রকেও Literature-ই বলা হয়। তবে সে ব্যবহারটা নির্দিষ্ট অর্থে। সচরাচর সাহিত্য অর্থাৎ হিন্দু আলঙ্কারিকদের কাব্যই Literature।

কিন্তু সাহিত্যের এই শ্রেণী-বিভাগকে শক্ত দেওয়াল তুলে পরস্পর থেকে ষোল-আনা বিচ্ছিন্ন করে রাখা সহজ নয়। দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস লেখার গুণে রীতিমতো সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে। ওঠেও, তার প্রমাণ বার্গসোঁ, মমসেন ও অয়কেনের সাহিত্যের জন্যে নোবেল প্রাইজ পাওয়া। রাসেল, জীনস, জেসপারসন ও জুলিয়ান হাক্সল্যের তত্ত্ববিচার মূলক লেখাও উপাদেয় সাহিত্য বলেই নেওয়া যেতে পারে। আনাতোল ফ্রান্স, টলষ্টয়, রঁলা ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে আবার গভীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা যথেষ্ট আছে, যা সাহিত্যের এলাকা থেকে তত্ত্ববিদ্যার এলাকায় গিয়ে পড়তে পারে। সুতরাং সাহিত্য ও অ-সাহিত্যের গণ্ডী বেঁধে দেব মনে করলেই সব সময় তা দেওয়া যায় না। একটা অন্যটাকে বহু ক্ষেত্রে স্পর্শ করে থাকে এবং বহু জনের মতে সেটাই শ্রেষ্ঠ রচনার বিশেষত্ব। আজকের দিনে নিছক ভাবাবেগাশ্রিত কোন রচনাকে লোকে সুকবিতা বা সংগল্প মনে করেন না। প্রকৃত আধুনিক সাহিত্যে মননশীলতার ছাপ সবাই খোঁজেন এবং মননশীলতা মানেই বস্তু-জ্ঞান ও বিচার-শক্তি। অবশ্য নিছক কাজের কথা চাঁছা-ছোলা সোজা ভাষায় বললেও লোকে শুনতে চান না। বক্তব্য যতই মূল্যবান হক, বাক-ভঙ্গিমায় শিল্পগুণ না থাকলে তা কারো মনে ধরে না। অর্থাৎ কাজের কথাও সাহিত্য করেই বলতে হয়।

॥ ২ ॥

ছোটগল্প দিয়ে বক্তব্য সুরু করেছি, আবার গল্পতেই ফিরে যাই। বিশেষ করে ছোট গল্পই যে এ যুগের সব চেয়ে সমাদৃত সাহিত্য, তা অকারণ

নয়। কবিতার আবেদন সকলের মনে সমান ভাবে পৌঁছায় না। যে-সব কবিতার বাচ্য-বস্তু অস্পষ্ট, ভঙ্গীর জটিলতায় বা প্রতীক-প্রধান শব্দের আতিশয্যে যে-সব কবিতা অনেকটা টেলিগ্রাফের কোর্ডের মতো—যার কিছুটা কবি বলেন, বেশীর ভাগটা পূরণ করে নিতে হয় পাঠককে আপন কল্পনা দিয়ে, তার ত কথাই নেই। সাধাসিধা সুরেলা বা চিত্রধর্মী কবিতাও অনেকের পরিপাক হয় না। প্রবন্ধের পাঠক আরো কম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্ব সবার জন্যে নয়। এমন কি, কাজের কথাও বিরস ভাষায় বললে শুনতে চান না অনেকেই। কাজেই গল্পের মধ্যে দিয়ে কাব্যের রস ও প্রবন্ধের পাণ্ডিত্য চালাতে পারলে, তা সহজগ্রাহ্য হয় সকলের কাছে। তাই বহু বিজ্ঞ লেখক ভেবে-চিন্তেই গল্পের পথ বেছে নেন, অধিক শ্রোতা পাবার আশায়।

পুরানো সমাজে এই গল্পের রাজ্যটা ছিল প্রলম্বিত। পাতার পর পাতা, অধ্যায়ের পর অধ্যায় পাড়ি দিয়ে পাঠক সানন্দে চলতেন নায়ক-নায়িকার সঙ্গে, তাদের সুখ-দুঃখ ও ভালো-মন্দের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে। কাহিনীর রসটাই তাতে থাকত মুখ্য স্থান অধিকার করে, যদিও তার আড়ালে লেখক চাইতেন একটা কিছু বলার কথা—মনুষ্যত্ব, ধর্ম, দেশপ্রেম, নারী-কল্যাণ, সমাজ গঠন, যা-হক কিছু বলে নিতে। সেই কথাটা যাঁরা ধরতে পারতেন, তাঁরা রসের সঙ্গে বস্তুও পেতেন কম নয়। যাঁরা ধরতে পারতেন না, গল্প-রসটাই হত তাঁদের পাওনা। জোলা, ব্যালজাক, ফ্লবেয়ার, আনাতোল ফ্রান্স, টলষ্টয়, হার্ডি, মেরিডিথ, বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, সবাই নিয়েছেন এই ধারাটি। একদিন তাঁদের রচনা বিমুগ্ধ নিষ্ঠায় পড়েছেন হাজার হাজার নর-নারী। উপভোগ করেছেন সবাই, উপলব্ধি হয়ত করেছেন অল্প লোক। কিন্তু বঞ্চিত হননি কেউ।

আজ সময় বদলেছে, পাঁচশো-সাতশো পৃষ্ঠা পাড়ি দেবার ধৈর্যও মানুষের আজ নেই। এই কর্মব্যস্ততার যুগে সে সময়ই বা কোথায় মানুষের? লোকাল ট্রেণে, ট্রামে, বাসে, অফিস, আদালত, ক্লাব, লাইব্রেরীতে শত খণ্ডে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে প্রত্যেকের জীবন। এই হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ির দুনিয়ায় War and Peace, Crime and Punishment, Madam Bovary, Thais পড়া সম্ভবও নয়, তার সুযোগও নেই। যাঁরা সমাজ-সৌধের উঁচু তলার বাসিন্দা, অর্থ ও অবসর যাঁদের প্রচুর, তাঁরা হয়ত বা পারেন পড়তে। কিন্তু পড়ার কাজটা

তাঁরা চাপিয়ে দিয়েছেন নিম্নবিত্তদের ঘাড়ে, তাঁদের আহৃত বিদ্যা নিজেদের সুবিধার পথে নিয়োজিত করবার জন্যে, ঠিক সেই ভাবে, যে-ভাবে পলিটিশিয়ানরা বেতনভুক সৈনিকের কাঁধে বন্দুক চাপিয়ে দেন, লড়াই লড়ে তাঁদের ক্যারিয়ার প্রশস্ত করে দেবার জন্যে। কাজেই পড়ুয়া সমাজের অনবকাশই দীর্ঘ কাহিনী পড়ার পথে হয়েছে আজ প্রধান অন্তরায় এবং পড়ুয়া না যদি থাকেন, লিখিয়ে লিখবেন কার জন্যে ?

যদিও এখানে প্রলম্বিত আকারের কাহিনীকে আমি গল্প-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছি, আসলে কিন্তু এই শ্রেণীর রচনার পারিভাষিক নাম উপন্যাস। উপন্যাস আর গল্পের মধ্যে মোটা পার্থক্য আকারে, তাই অবশ্য এই ভূমিকা করেছি। কিন্তু গল্পে ও উপন্যাসে মস্ত পার্থক্য আছে প্রকারে, এটা মনে রাখতে হবে। উপন্যাস মেলে ধরে সমগ্র জীবনকে, তার আদি আছে, মধ্য আছে, অন্ত আছে। পূর্বাপর যোগসূত্র রেখে তা বহু ঘটনা ও চরিত্রের খণ্ড-খণ্ড অংশ নিয়ে গিয়ে পৌঁছায় এক অখণ্ড পরিণতিতে। তাই তার ধরণ অনেকটা এপিক বা মহাকাব্যের মতো। গল্পে এ অবকাশ নেই। তা আরম্ভ হয় একটা-কিছুর মধ্য-পর্ব থেকে এবং পূর্ণ পরিক্রমার আগেই যাত্রা শেষ হয় তার। এক ঝলকে একটা বা কয়েকটা জীবনকে বেষ্টন করে একটা-কিছু দ্বন্দ্ব বা সমস্যা বা চিন্তা যা দেখা যায়, তাই রূপ পায় ছোট গল্পে। আদ্যোপান্ত মেলে ধরার বা আনুপূর্বিক এঁকে দেখানোর জায়গা নেই। কঠোর মিতব্যয়ই হল ছোট গল্পের আর্ট। যা বলা হল, যতটুকু দেখানো হল, তার আড়ালে থেকে গেল আরো ঢের কথা। সেই না-বলা কথার ইঙ্গিতই সার্থক করে ছোট গল্পকে। কাজেই আর্ট হিসাবে ছোট গল্প লেখা যেমন সহজ নয়, বোঝাও তেমনি সহজ নয়।

তবু সমস্ত পাঠক যে তারই ওপর ঝুঁকে পড়েন এবং বেশীর ভাগ লেখকই যে তার আশ্রয় নেন, এর কারণ ত আগেই বলেছি। মানুষের সময় নেই, অথচ সে সুখপাঠ্য কিছু পড়তে চায়, জানতে চায় এবং লেখকও কিছু বলতে চান, শোনাতে চান। আজকের পৃথিবীতে তাই ছোট গল্পের আবাদ অনিবার্য কারণেই ব্যাপক হয়েছে এবং যেহেতু এটাই হয়েছে সাহিত্যের মুখ্য মাধ্যম, সেই হেতু এর মধ্যেই যা-কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধ্যান-ধারণা ঠেসে দেবার চেষ্টা হচ্ছে আজ।

॥ ৩ ॥

বলা বাহুল্য গল্প বলা ও শোনার আগ্রহ মানুষের শুধু আজকের নয়, চিরকালের এবং গল্পের প্রলেপে ঢেকে কাজের কথা শোনাবার রীতিও খুব পুরানো। আমাদের দেশে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে মূল আখ্যানের সঙ্গেই গাঁথা হয়েছে অজস্র গল্প। তাই বোধ হয় তাদের নাম উপাখ্যান। পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎকথা, কথা-সরিৎসাগর, জাতক, গল্প-পুস্তকের অভাব নেই এদেশে। রূপকথা, ব্রতকথা, বীরগাথা, মঙ্গল কাহিনী, নানা আকারের লোক-গল্পও আছে বিস্তর। অন্যান্য দেশেও গল্পের তুনিয়া জম-জমাট। গ্রীকদের ঈসপের কাহিনী, ইহুদীদের পুরানো পুঁথি, আরবদের আরব্য উপন্যাস, ভাইকিংদের বড় এড্ডা, ছোট এড্ডা, প্রাচীন কাহিনী ঢের আছে। গ্রীম-এর পরীর গল্প, হান্স এণ্ডারসনের কাহিনী, টলষ্টয়ের কাহিনী, এ-যুগের ঐশ্বর্য হিসাবেও কম উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু আজকের দিনে যাকে আমরা বলি গল্প বা ছোট গল্প, তা এই সাবেকী ধারার আধুনিক অনুবৃত্তি নয়। এ একান্ত ভাবেই এ-কালের সৃষ্টি। তাই রূপকথা, উপকথা, কাহিনী, কোন পর্যায়ের সঙ্গেই তার জাত ও ধাতের মিল নেই।

আগেই বলেছি, এ-কালের ছোট গল্প শিল্প হিসাবে জটিল বস্তু। তাতে গল্পের অংশ, বক্তব্যের অংশ, অবতারণা ও বিশ্লেষণের অংশ, অনেক ভগ্নাংশ এক সঙ্গে জড়ানো। অথচ তা ব্যাপ্ত বা বিস্তৃত নয়, সংহত এবং সর্বাঙ্গীন মিতব্যয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাজেই গল্প কোথা থেকে আরম্ভ হবে, কোথায় শেষ হবে, কতটুকু বলা হবে, কতটুকু অনুক্ত থাকবে, তার কোন ব্যাকরণ বেঁধে দেওয়া যায় না। জিনিষটা হয়ে উঠলে আপনিই বোঝা যায় অবশ্য। যেখানে কোন একটা অঙ্গ অস্বাভাবিক প্রাধান্য নিয়ে ঠেলে ওঠে, সেখানে গল্প অসার্থক হয়েছে বুঝতে হবে। বিশিষ্ট লেখকদেরও অসার্থক গল্প আছে প্রচুর, আবার অল্পখ্যাত বা অখ্যাতরাও লিখেছেন বহু সার্থক গল্প। ছোট গল্পের প্রাণ-বস্তু বিচারের মাপকাঠি তাই অনেকে ঠিক করতে পারেন না—সে লেখকরাও, পাঠকরাও।

তুনিয়ার যাঁরা সেরা গল্প লিখিয়ে, যেমন মোপাসাঁ ও চেকভ, হারম্যান জুডারম্যান ও সোমারসেট মম, তাঁদের বিখ্যাত গল্পগুলো মন দিয়ে পড়লেই ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য কি এবং কোথায়, তা অনেকটা বোঝা যাবে।

কিন্তু বিদেশী নামের আর তালিকা বৃদ্ধি না করে, বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগটি নিয়েই দু-চারটি কথা বলা যাক। খাঁটি ইতিহাস ধরলে, বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা-সম্মত ছোট গল্পের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। তাঁর পর উল্লেখযোগ্য, প্রভাত মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের গল্পে কাব্য-ধর্মের এবং প্রভাতকুমারের গল্পে প্লটের প্রাধান্য আজকের দিনে একটু বেশী রকম সাবেকী লাগে সন্দেহ নেই, তবু খাঁটি গল্প-রসের পুঁজি তাঁদের সমান আর কারো লেখাতেই পাওয়া যায় না সে সময়ে। শরৎচন্দ্র ছোট গল্প লেখেন নি বললেই চলে, মহেশই তাঁর একমাত্র সেরা গল্প।

আসলে ছোট গল্প লেখা হয়েছে এ-যুগেই এবং এ-বিভাগে কৃতী লেখক অনেক। তার মধ্যে তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বিশেষ একটা স্থান আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের আশে-পাশে ভালো গল্প লিখিয়ে উঠেছেন এবং উঠছেন আরো অনেকে। জীবনের নানা অভাবনীয় দিককে, সমাজের নানা অবহেলিত বিভাগকে যেমন তাঁরা গল্পে রূপ দিয়েছেন, তেমনি গল্পের গ্রন্থন-শিল্পকেও তুলেছেন উঁচু মানে। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে বাংলা গল্পের গতি-পথ ছোট। তা বহু-ব্যাপ্ত জীবনের ক্ষেত্রে পরিক্রমা করেনি, আশপাশের দুনিয়ার মধ্যেই তা মোটামুটি চেনা ফসলের কারবার করেছে। এই তুলনায় মোপাসাঁ, চেকভ, গোর্কী বা মমের জগৎ কত বড়, তাঁদের অভিজ্ঞতা ও আহরণের ঐশ্বর্য কত বেশী! এই স্তরে বাংলা গল্প আজও আসেনি। অবশ্য আসেনি আরো অনেক দেশেই, যদিও সবদেশেই পত্র-পত্রিকা জুড়ে পাইকারি হারে গল্প উৎপন্ন হচ্ছে প্রতিদিন এবং পাঠকরাও নির্বিচার গ্রাসে গলাধঃকরণ করছেন তা।

একাঙ্ক নাটক

বাংলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটকের পুঁজি আজও আমাদের বেশী নয়। বাংলা দেশে নাট্যশালা তৈরি হয়েছে একশো বছরের ওপর এবং এই এক-শতাব্দী ধরেই বাংলা ভাষায় নাটক লেখা হয়েছে, হচ্ছে। কিন্তু সব নাটকই লেখা হয়েছে মঞ্চের দিকে নজর রেখে, তাই অভিনয়যোগ্য নাটকই আমাদের একমাত্র সম্বল। বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবে পড়া ও উপভোগ করা যায়, এমন নাটক লিখেছেন শুধু রবীন্দ্রনাথ। বিশেষ করে সাঙ্কেতিক নাটক-পর্যায়ে তাঁর দানই একান্ত ভাবে স্মরণীয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সর্বতোগামী লেখনীও একাঙ্ক নাটক সৃষ্টি করেনি। বোধ হয় সাহিত্যের এই এ-কালীন ফসল তাঁর মনোযোগই আকর্ষণ করেনি। তা না হলে কি আর এ দিকটা উপেক্ষা করতেন তিনি? যাই হক, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নাট্য সাহিত্য আজ স্পষ্ট দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে: মঞ্চনাট্য, যা অভিনীত হয়, আর সাহিত্য নাট্য, যা পড়া হয়। একাঙ্ক নাটক পড়ে এই শেষোক্ত বিভাগে। অবশ্য মহৎ শিল্পীর হাতের স্পর্শে মঞ্চনাট্যও সার্থক সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, যেমন সাহিত্যিক নাটকও অভিনয়ে সাফল্য মণ্ডিত হতে পারে গুণী প্রয়োগ-শিল্পীর প্রভাবে।

তবু সাধারণ ভাবে এই শ্রেণীভেদ টুকু মেনে চলাই রীতি এবং তার কারণও আছে। অভিনয় হল প্রয়োগাত্মক শিল্প, তার আবেদন প্রত্যক্ষ, তাই তার আঙ্গিকও স্বতন্ত্র। আর সাহিত্য হল অনুশীলনাত্মক শিল্প, তার নিয়ম-কানুন একেবারে আলাদা। মঞ্চে যা চলে, সাহিত্যে তা চলে না সেই জন্যেই। যে নাটক সাহিত্য হবে, তাকে হতে হবে সর্বতোভাবে সংযত, সুনিয়ন্ত্রিত, পরিমিত ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ। এই রকম সর্বগুণান্বিত নাটক একমাত্র একাঙ্ক নাটকের কাঠামোতেই সম্ভব।

একাঙ্ক নাটকে আনুপূর্বিকতা থাকে না, তার সুরু ও শেষ থাকে দৃশ্যপটের অন্তরালে। তার ঘটনা ও চরিত্র দেখা দেয় আকস্মিক বিদ্যুৎ-চমকের মতো এবং সেই ক্ষণিক দীপ্তিতেই তা তুলে ধরে এক-একটা সামগ্রিক চিত্র। কাজেই

ঠাসবোনা বাহুল্যবর্জিত রচনা হতে হয় একাঙ্ক নাটককে। অর্থাৎ শিল্প হিসাবে তার জাত মঞ্চনাট্যের চেয়ে উঁচু।

একাঙ্ক নাটক সম্বন্ধে অনেকের ধারণা যে পাত্র-পাত্রীর কথা-বার্তার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত একটি ঘটনার আলোয় একটা কোন তত্ত্ব বা সমস্যা ফুটিয়ে তোলাই তার প্রধান কাজ এবং ছোট গল্প যেমন 'ছোট' আখ্যায়িকা, এ-ও তেমনি ছোট নাটক। আর গল্পেরই অভিন্ন দোসর এ, কেন না পঠনীয়। বলা বাহুল্য, এটা ভুল। একাঙ্ক নাটকও নাটকই এবং নাট্যরীতির মাপকাঠি ধরেই চলতে হয় তাকে। দরকার হলে তাকে মঞ্চস্থও করা যেতে পারে। পারে কেন, যায়ও এবং এ-যুগের বহু বিখ্যাত একাঙ্ক নাটক (চেকভ, আন্দ্রিয়েভ, স্ট্রীণ্ডবার্গ, বেনাভাঁতে প্রভৃতির লেখা) মঞ্চাভিনয়ে পর্যাপ্ত সাফল্য লাভও করেছে।

আসলে কর্মব্যস্ত বিংশ শতাব্দীর মানুষ নাট্যাভিনয় অপছন্দ করে না, কিন্তু সারারাত্রি ব্যাপী বা মধ্যরাত্রি পর্যন্ত প্রসারিত অভিনয় উপভোগের আগ্রহ নেই তার। তাই সেক্সপীয়ারের যুগের পঞ্চাঙ্ক নাটক, ইবসেন, বার্নাড´ শ'র যুগে তিন অঙ্ক হয়েছে। তিন অঙ্ক আবার সংক্ষিপ্ততর হতে হতে এসে ঠেকেছে একাঙ্কে। এই বিবর্তনে দেহ তার যত সঙ্কুচিত হয়েছে, আত্মা হয়েছে ততই জটিল ও রহস্যঘন। একাঙ্ক নাটক তাই লেখাও কঠিন, পড়ে আয়ত্ত করাও কঠিন। আর মঞ্চে রূপ দিতে হলে, যত খানি নাট্যকৃতিত্ব প্রয়োজন, তা ত এ-দেশে অলভ্য বললেই চলে।

জানিনা প্রধানত এই জন্যেই কি না আমাদের লেখকেরা কেউ বড়-একটা একাঙ্ক নাটক লেখেন না। কিংবা ব্যবসায়িক সফলতার দিক থেকে গল্পের দুনিয়াটা যতখানি প্রশস্ত, এর তা নয় বলেই, তাঁদের নজর আকৃষ্ট হয় না এদিকে। মোটকথা সাহিত্যের বৃহৎ এই বিভাগটা প্রায় অনধিকৃতই পড়ে রয়েছে বাংলা দেশে। অল্প-স্বল্প সংযোজনের চেষ্টা যা হয়েছে, তার মধ্যে কিছু লক্ষণীয় কাজ করেছেন মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত, রবীন্দ্র মৈত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসু। বর্তমান লেখকও আছেন এই দলে এবং ১৯৩৮ থেকে '৫৮-এর মধ্যে অনেক একাঙ্ক নাটক লিখেছেন তিনি সাময়িক পত্রে। কিরণ মৈত্র, রমেন লাহিড়ী, সোমেন্দ্র নন্দী প্রভৃতির নামও সাম্প্রতিক লেখক হিসাবে এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য।

॥ ২ ॥

অনেকেই জানেন আশা করি যে বাংলা ভাষার প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' অভিনীত হয় ১৮৫৭ সালে, তখনকার এক বিদ্যোৎসাহী ধনীর ঘরোয়া মঞ্চে। এর পর মঞ্চায়িত হয় মাইকেল ও দীনবন্ধুর নাটকগুলি এবং সে-ও কোন-না-কোন ঘরোয়া মঞ্চে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাবের পর সৃষ্টি হয় সাধারণ বা পেশাদার রঙ্গমঞ্চ এবং দেশে নাট্য রচনা ও অভিনয় সুরু হয় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তখন থেকেই। অনিবার্য কারণেই নাট্যকার ও নট-নটীর আবির্ভাব হতে থাকে পর্যাপ্ত সংখ্যায় এবং গত শতাব্দীর ধর্ম-পুনরুজ্জীবন ও জাতীয়-জাগরণের আন্দোলন জনপ্রিয়তার খাতে প্রবাহিত করে দেয় বাংলা নাট্যশালার প্রবাহকে।

এই পেশাদারী নাটকের দুনিয়া থেকে সরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব উচ্চ নাট্যরীতি প্রবর্তন করেন প্রথম ঠাকুরবাড়ীর ঘরোয়া মঞ্চে, তারপর বিশ্ব-ভারতীতে। দেশের মানুষ সেই নূতন নাট্য-শৈলীর সৌন্দর্য একেবারে উপলব্ধি করেন নি তা নয়, কিন্তু তার প্রভাব ব্যাপ্ত হয়নি নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে। তাই চলতি বাজারকে তা অল্পই স্পর্শ করেছে। ডাকঘর, রক্তকরবী, বা নটীর পূজার প্রভাব ব্যাপ্ত হয়নি এটা অবশ্য আশ্চর্য। আরো আশ্চর্য যে শিশির ভাদুড়ীর মতো নট এবং নাট্যশিল্পী দেশে রবীন্দ্র-প্রভাবিত নূতন নাট্যধারা পরিব্যাপ্ত না করে, পুরানো রীতির রোমান্টিক নাটক নিয়েই জীবন শেষ করে গেলেন। অথচ এটা করতে পারতেন একমাত্র তিনিই।

যাই হক, ১৮৫৭ থেকে ১৯৬০ এই একশো তিন বছরের পথ-পরিক্রমা করে আমরা দেখছি আজ যে কতকটা ছায়াচিত্রের প্রতিযোগিতায় হঠে গিয়ে, কতকটা বা প্রতিভা সম্পন্ন প্রযোজকের অভাবে, পেশাদার মঞ্চগুলি সবই মুমূর্ষু দশায় উপনীত। তাঁরা চলতি দিনের জনপ্রিয় নভেলকে নাটকায়িত করে, নয়ত বহু পরীক্ষিত পুরানো পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের ছকে চলনসই নূতন নাটক লিখিয়ে, তাই মঞ্চস্থ করছেন এবং এই ভাবেই অস্তিত্ব ও ব্যবসা রক্ষা করেছেন। যুগ ও জীবনের প্রবহমান গতির সঙ্গে তাঁদের লক্ষণীয় কোন সম্বন্ধ নেই। তাই রুচি-সম্পন্ন গুণী দর্শক তাঁরা আকর্ষণ করতে পারেন না বড়-একটা, যেমন পারেন না রবীন্দ্রনৃত্য-নাট্যের অনুকরণে গজিয়ে ওঠা অকুলীন নৃত্য-নাট্য গোষ্ঠীগুলিও।

কিন্তু ষোল-আনা নিরাশ হবার কারণ বোধ হয় নেই। দেশে নূতন নাট্য-আন্দোলনের পূর্বাভাষ দেখা দিয়েছে একটা। চতুর্দিকে নূতন নূতন নাট্য-সংস্থা তৈরী হচ্ছে, নূতন নূতন নাটক লিখে প্রতিনিয়ত রূপও দিচ্ছেন তাঁরা। এই সব নাটকে আজকের যুগ-সমস্যা ও জীবন-বেদনাই ভাষা পাচ্ছে এবং অভিনয়ে যে উন্নত মানের পরিচয় মিলছে, তা পেশাদার মঞ্চে অলভ্য। মনে করতে বাধা নেই যে এঁদের হাত দিয়েই আবার জোয়ার আসবে আমাদের নাটক ও নাট্যকলার মুল্লুকে। লক্ষ্য করার বিষয় যে এঁরা তিন অঙ্ক থেকে এখন অনেকেই এসে দাঁড়িয়েছেন দু-অঙ্কে, কেউ কেউ একাঙ্কেও এবং কয়েকটি প্রতিযোগিতায় বিচারক রূপে কোন-কোন নাটক ও অভিনয়ে যে সুচিহ্নিত অভিনবতার পরিচয় পেয়েছি, তা ভীড়ে হারাবার মতো নয়।

এই আশাপ্রদ বিবর্তনের পথে একাঙ্ক নাটকের পুনরুজ্জীবনটাই সম্ভবত সব চেয়ে বড় কথা। আগেই বলেছি, একদিন আধুনিকদের অগ্রজ রূপে আমরাই প্রথম এই নাট্য-ধারার পত্তন করেছিলাম। কিন্তু অনুকূল পরিবেশের অভাবে তা দানা বাঁধতে পারেনি। আজ সুযোগ এসেছে, সুতরাং সর্ব-প্রযত্নে সুরু হক সাহিত্য ও শিল্পের এই সম্ভাবনীয়তাপূর্ণ বিভাগটির চর্চা। কিন্তু সব চর্চাই সার্থক হয় অনুশীলনের পটভূমি মজবুত ও সুপরীক্ষিত হলে। কাজেই আধুনিকদের খুব ভালো করে পড়তে হবে, খুঁজতে হবে, তারপর ভাবতে এবং বুঝতে হবে।

সন্দেহ নেই, ছোট গল্পের মতো একাঙ্ক নাটকও সম্পূর্ণ একালের ফসল। তবু পুরানো সাহিত্যেও হঠাৎ মিলে যাবে এমন দু-একটা নিদর্শন, যা বিশুদ্ধ একাঙ্কিকার পর্যায়ভুক্ত: যেমন ভাসের মধ্যম ব্যায়োগ (ব্যায়োগ এক অঙ্কে সমাপ্ত নাটকেরই নাম) নাটিকাটি। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর এটি একটি একাঙ্ক নাটক এবং কৌতুক রসাশ্রিত এই নাটিকাটি একটি আশ্চর্য রচনা। এমন রচনা গ্রীক, ল্যাটিন এবং ফরাসীতেও মিলবে, যদি এরিষ্টোফিনিস, প্লোটিয়াস, মলেয়ার ও রাসিনের পুঁজি-পাটা আমরা আদ্যোপান্ত যাচাই করে দেখি।

বলা বাহুল্য, এই আদি উৎস থেকেই একাঙ্ক নাটকের উদ্ভব হয়নি। কিন্তু এই রকম ক্ষুদে নাটকের প্রয়োজন প্রাচীনেরাও হৃদয়ঙ্গম করতেন, এটাই লক্ষণীয় এই প্রসঙ্গে।

রম্য রচনা

আজকের দিনে বাংলা ভাষায় যা সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় লেখা হয়, তা হল ছোট গল্প ও গল্প-ধর্মী ছোট প্রবন্ধ, যাকে বলা হয় রম্য রচনা। সাহিত্যের এই বিভাগটা নিয়েই একটু আলোচনা করি। অনেক দিন, বোধ করি সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে কাদম্বরী, রামের রাজ্যাভিষেক, টেলিমেকস প্রভৃতি কয়েক খানি পুরানো গদ্য বইয়ের বিজ্ঞাপনে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন কোন সাহিত্য মন্দির। তারপর দীর্ঘকাল পরে সেই বাজার-চলতি শব্দটা হঠাৎ জলাচরণীয় হয়ে আজ সাহিত্যসেবীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বসেছে দেখতে পাচ্ছি।

বলা বাহুল্য শব্দটা অসার্থক। কারণ রচনা রম্য না হলে, তা সাহিত্য-পদবাচ্যই হয় না। কাজেই রম্যতা শুধু বিশেষ শ্রেণীর প্রবন্ধের জন্যে নয়, গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, সব রকম সাহিত্য-কর্মের জন্যেই দরকার। আসলে এই যে রম্যতা, একেই সাবেকী পণ্ডিতেরা বলতেন রস, একেলে পণ্ডিতেরা বলেন শিল্প-গুণ, যা না থাকলে লেখা লেখাই থাকে, আর্ট হয় না, যেমন মুখ থেকে নির্গত হলেই হয় না, অর্থ-যুক্ত না হলে শব্দরা বাক্য হয়ে ওঠে না। তাই আমি মনে করি, বিষয়াত্মক বা ভারী জাতের আলোচনাকে প্রবন্ধ, আর হাল্কা চালের বা বৈঠকী জাতের আলোচনাকে নিবন্ধ বললেই দুইয়ের পার্থক্যটা বোঝানো যায় এবং রম্য রচনার মতো একটা খেলো ও অপ-প্রযুক্ত শব্দ অকারণ চালাতে হয় না।

এখন কেউ যদি বলেন, মানে ধরে বিচার করলে নিবন্ধ কথাটাই কি খুব সার্থক বলে গণ্য হবার যোগ্য? সে আমি বলতে পারব না। কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করে নেবেন। তবে দেখেছি, মহাভারতকার কাশীরাম তাঁর রচনাকে প্রবন্ধ আখ্যা দিয়েছেন: পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস। হিতোপদেশে ধূর্ততাপূর্ণ মতলবকে বলা হয়েছে কপট প্রবন্ধ। কাজেই প্রবন্ধ কথাটাও অর্থের বিচারে নিখুঁত নয়। তা সত্ত্বেও সেটাই যখন চলছে, তখন নিবন্ধ কথাটাকেও নির্দিষ্ট অর্থে চালালেই বা দোষ কি হবে, তা আমি বুঝি না।

মোটের ওপর বিচার, বিতর্ক, বিশ্লেষণ, উপদেশ, আক্রমণ ইত্যাদির উদ্দেশ্য নিয়ে যে বিষয়াত্মক গদ্য লেখা হয়, উনবিংশ শতাব্দী থেকে তাকেই আমরা প্রবন্ধ বলে আসছি। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বঙ্কিম-গোষ্ঠীর লেখকরা এক দিন এই জাতীয় লেখায় উৎকর্ষ দেখিয়েছিলেন যথেষ্ট। তাই জিনিষটার অতি-প্রচলনের দরুণই হয়ত তার নামের সার্থকতা নিয়ে কেউ মাথা ঘামানোর অবসর পাননি। এই সুযোগে নামটা ভাষার ভাণ্ডারে নিজের কায়েমি আসন করে নিয়েছে। বঙ্কিমের বিবিধ প্রবন্ধ থেকে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধ পর্যন্ত, সব বড়-আদালতেই দেখি কথাটা প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে।

কিন্তু তবু প্রবন্ধ কথাটার মধ্যে যে বেশ একটা সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে, তা বিচারশীল সমালোচকের চোখ এড়ায় না। প্রবন্ধ বললেই যেন মনের সামনে জজের রায় বা আচার্যের ধর্মোপদেশ, সম্পাদকের সমালোচনা বা শিক্ষকের ভর্ৎসনার মতো একটা-কিছু কঠিন কটকটে জিনিষের ছবি ভেসে ওঠে। কাজের দুনিয়ার পক্ষে জিনিষটা মূল্যবান হয়ত এবং যেহেতু সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশীর ভাগই হয় বিচারপ্রার্থী, নয় শিক্ষার্থী, নয় স্নেহভিক্ষু, সেই হেতু এই শ্রেণীর রচনা পরিবেষণ করেন যাঁরা, তাঁদের দেশে বিদ্বান বলে কদর হয় খুব। কেতাবী ভাষায় তাঁরা অভিহিত হন মনীষী অথবা বিদগ্ধ জন নামে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আগে যাঁদের নাম করেছি তাঁরা এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রিয়নাথ সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা গদ্য সাহিত্যে এই রকম বিদগ্ধ লেখক কম হননি এ পর্যন্ত। প্রমথ চৌধুরীর কথা না-হয় নাই বললাম।

কিন্তু যা পাঠক সমাজে অকুলীন সাহিত্য বলে উপেক্ষিত হয়েছে এবং লেখক সমাজে লাভজনক শ্রম বলে গণ্য হয়নি, সেই রকম আর এক জাতের গদ্যও লেখা হয়েছে বাংলা ভাষায় একেবারে সুরু থেকেই। জ্ঞান বিস্তার, সমাজ সংস্কার, ধর্মপ্রচার, কোন মহৎ উদ্দেশ্য নয়—অন্যায়ের প্রতিকার, কুব্যবস্থার প্রতিবাদ, দুর্বৃত্তের স্বরূপ উদ্ঘাটন, কোন সাংগ্রামিক উদ্দেশ্যও নয়—নিছক খুসীর হাওয়ায় কলমকে বইয়ে দেওয়ার জন্যেও প্রচুর পরিমাণে গদ্য লেখা

হয়েছে এবং খ্যাত-অখ্যাত বহু লেখকই হাত মিলিয়েছেন সে কাজে। হয়ত সামাজিক বিরূপতার জন্যেই এ-রকম লেখাকে খুব একটা কাজের কাজ বলে মনে হয়নি আগেকার লেখকদের। তাই গুরু-গম্ভীর লেখাগুলোর মতো মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা করেননি তাঁরা এই সব লেখার। তবু একই ছাদের তলায় মনিব পুত্রদের সঙ্গে পরিচারিকা পুত্রদের টিঁকে থাকার মতো, এরাও ভাগ্যক্রমে একই প্রবন্ধ পরিবার-ভুক্ত হয়ে থেকে গেছে একই মলাটের নীচে।

আজ দেখছি, এ-দেশে বিলেতী কাপড় প্রথম আমদানি হলে সুতা-কাটুনীর পত্র বলে যে রচনা সমাচার-দর্পণে বেরিয়েছিল, হুতোম মাহেশের রথে বাবুদের বেলেল্লামি নিয়ে যে কৌতুক করেছিলেন, গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত ও মক্তবের আখনজী সাহেবের যে ছবি রাজনারায়ণ বসু এঁকেছিলেন সেকাল-একালে, বিদ্যাসাগর চটিজুতার দুর্ভাগ্য নিয়ে লিখেছিলেন যে ব্যঙ্গপ্রবন্ধ, তার মতো সরস, সুন্দর, ঝরঝরে গদ্য সেদিনের বাংলা ভাষায় আর কেউ লেখেন নি। বঙ্কিম কমলাকান্তে ও লোক-রহস্যে এই ধারাকেই আরো প্রসারিত করেছিলেন, করেছিলেন অক্ষয় সরকারও তাঁর পিতা-পুত্র নামক চমৎকার স্মৃতি-কথায়। রবীন্দ্রনাথ ও বীরবলের আর কোনটা রেখে কোনটার কথা বলব? আসলে বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত এবং বঙ্কিমের গুরু বিষয়ক লেখা যেগুলো, তাতে তাঁরা সাধুভাষার নামে অনুসরণ করেছেন একটা কৃত্রিম রচনা রীতি, যা হয় সংস্কৃতের নয় ইংরেজীর নকল এবং এ তাঁরা করেছেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে সার ও ভার-সম্পন্ন লেখায় হাল্কা চলতি ভাষা বসানো দামী পাথর পেতলের আংটিতে বসানোর মতো অনুচিত ব্যভিচার!

মত তাঁদের যাই হক, এই চেষ্টাকৃত কৃত্রিম অলঙ্কার-বাহুল্য ও রীতি-গাম্ভীর্যের বিপাকে গদ্য তাঁদের এমনই খোঁড়া হয়ে গেছে যে আজ তা পড়তে গেলে পদে পদে হোঁচট খেতে হয়। ভয়ে ভয়ে বলছি, এ বিপদ হয় মধ্য-জীবনে লেখা রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধ পড়তে গেলেও। মনে হয় যেন বাচ্যের চেয়ে বাক-ভঙ্গীর দিকে তিনি মন বেশী দিয়েছেন, যার ফলে ভঙ্গীটা ঐশ্বর্যশালী হয়েছে হয়ত, কিন্তু অনেকটুকু গতি-বেগ হারিয়েছে। এটা ধরতে পেরেছেন যেদিন তিনি, সেদিনই চলতি ভাষার দেশী নৌকাকে সাহিত্য-যাত্রার একমাত্র বাহন করে নিয়েছেন, যা করতে পারেন নি তাঁর পূর্বজেরা, কেন না জিনিষটা ধরতেই পারেননি তাঁরা।

কিন্তু নিজেদের অজান্তেই তাঁদের হাত দিয়েও বেরিয়ে এসেছে এমন কতকগুলো সহজ সুন্দর ঝরঝরে গদ্য লেখা, যা তাঁরা হয়ত বাঁ হাত দিয়ে লিখেছিলেন, হয় সম্পাদকী তাগিদ এড়ানোর জন্যে, নয় খেলা হিসাবে কলমবাজী করার খেয়ালে। শুধু খাঁটি বাংলা ভাষা ও তার নিজস্ব বাক-ভঙ্গীর জন্যে নয়, অকপট একটা আয়েসী বা বৈঠকী মেজাজের জন্যেও লেখাগুলো অপূর্ব।

বিষয়ের দিক থেকে বেশীর ভাগই হয়ত এমন কিছু নয়। কোনটা আত্ম-স্মৃতি রোমন্থন, কোনটা বিশেষ একটা মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ, কোনটা বা সোজা জিনিষে তির্যক রেখায় আলোক পাতন—গল্প, উপ-কথা, প্রবন্ধ, কাব্য, সব-কিছুর সমাবেশ, অথচ কোনটাই নয়···বাস্তবিকই মনোরম লেখাগুলো। এদের কি বলে অভিহিত করবেন? প্রবন্ধ? না মশায়, আগেই বলেছি, প্রবন্ধের গায়ে একটা গুরুগিরির গন্ধ আছে। তা কাজে লাগে, কিন্তু ভোগে লাগে না। কাজেই এদের প্রবন্ধ বলতে পারেন না, আর রম্য রচনা কেন বলা উচিত নয়, সে ত বলেছি আগেই। সুতরাং নিবন্ধই বলা যাক এদের, কি বলেন?

আধুনিক বাংলা লঘু প্রবন্ধ

সর্বাগ্রে লঘু প্রবন্ধ বলতে আমরা কোন শ্রেণীর রচনা বুঝি, সেটা বলতে হবে। তারপর বলা দরকার, আধুনিক বলতে আমরা কোন সময়-সীমা থেকে আলোচনা স্নুরু করব।

প্রবন্ধ কথাটা আজ আমরা ইংরেজী Eassy-র প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করি, যদিও আদিতে প্রবন্ধের অর্থ অন্য রকম ছিল। কাশীরাম দাস তাঁর মহাভারতের ভণিতায় বলেছেন, পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস। হিতোপ-দেশে এই শব্দটি মৎলবের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হতেও দেখেছেন আশা করি সকলেই।

যাই হক, শব্দ জিনিষটা যখন চলন্ত, তখন চলতে চলতে প্রবন্ধ আজ যে ব্যঞ্জনায় এসে পৌছেছে, সেটাই তার আসল অর্থ হিসাবে নেওয়া যাক। এই যে প্রবন্ধের অর্থ, এই অর্থে বোঝায় গদ্যে লেখা কোন বিষয়াত্মক রচনা এবং বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর রচনা লেখা স্নুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দী থেকেই। অর্থাৎ বাংলা গদ্যের জন্মকাল থেকেই।

অবশ্য ইংরেজীতে যাকে Eassy বলে, ঠিক সে জিনিষ প্রথম আমলের গদ্য লেখক যাঁরা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, রামমোহন রায়, তাঁরা কেউ লেখেননি। তাঁরা প্রধানত ইতিহাস, সমাজ-সমস্যা ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং ইংরেজীতে যাকে Discourse বা বাদানুবাদমূলক লেখা বলে, তাঁদের লেখা মূলত তাই। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তই প্রথম সত্যকার প্রবন্ধ রচনা স্নুরু করেন এবং তাঁদের পাশাপাশি রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকও দেখা দেন, যাঁরা উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধ লেখক।

কিন্তু ওপরে উল্লিখিত পাঁচজন প্রবন্ধকারের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু ছাড়া আর সকলের লেখাই শিক্ষামূলক। দেশ ও জাতির কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে, নানা প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা। তাতে পাণ্ডিত্য আছে, চিন্তা ও মননশীলতা আছে, ভাষা ব্যবহারের নিপুণতা আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা জিনিষের অভাব সকলেরই চোখে পড়ে, সে হল

সাহিত্যিক মেজাজের অভাব। এই মেজাজ কিছুটা পাই রাজনারায়ণ বসুর লেখায়, বিশেষ করে তাঁর সেকাল ও একাল রচনাটির মধ্যে।

আসলে উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-যুগে বাংলা গদ্যের জন্ম হয়েছিল এবং দেশকে নানা দিকে জাগিয়ে তোলাই সেদিন চিন্তানায়কদের প্রধান কাজ ছিল। বাংলা গদ্যের চেহারায় তাই এসেছিল সুস্পষ্ট একটা শিক্ষকতার রূপ এবং এ-রূপটা তার বঙ্কিমচন্দ্রের আমলেও বজায় ছিল অনেকটাই। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে ষোল-আনা সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত করেন। তিনি একদিকে ভারী বিষয় নিয়ে যেমন লিখেছেন ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, অন্য দিকে লঘু বিষয় নিয়ে তেমনি লিখেছেন কমলাকান্তের দপ্তর ও লোক-রহস্য। প্রকৃতপক্ষে বাংলা লঘু প্রবন্ধের আদি-উৎস কমলাকান্তই।

পূর্বেই বলেছি, লঘু প্রবন্ধে সব চেয়ে বড় জিনিষ হল তার সাহিত্যিক মেজাজ। পাঠককে লেখক তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ বা বয়স্য হিসাবে নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন, সে আলোচনায় কখনো থাকবে একটু তর্কের আঁচ, কখনও আসবে একটু কৌতুকের আমেজ, কোথাও থাকবে ছুটো জ্ঞানের কথা, কোথাও বা কিছুই থাকবে না, শুধু থাকবে একটু বাক-ভঙ্গীর মুন্সীয়ানা, এই হল সার্থক লঘু প্রবন্ধের লক্ষণ। এ রকম প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় বঙ্কিমেরই সৃষ্টি। বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ এই ধারার একটি অপূর্ব রচনা। ভ্রমণ ও চিন্তনের মিলিত মাধুর্যে তা একান্ত উপভোগ্য।

বঙ্কিম সমসাময়িক চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট গদ্য লেখকদেরও কিছু-কিছু এই রকম মেজাজী লেখা আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে এসেই আমরা আবার প্রবন্ধ সাহিত্যের বলিষ্ঠ একটি রূপান্তর দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের বিশাল গদ্য রচনাবলীর অনেক বিভাগ। তাব মধ্যে স্মৃতিচিত্র, ভ্রমণ কাহিনী, আত্ম-জল্পনা, তত্ত্বোপদেশ, বিষয়াত্মক আলোচনা, নানা জিনিষ আছে। আবার অতি সাধারণ জিনিষকে দেখার গুণে অসাধারণ করে তুলেছেন,, অতি গভীর কথাকে বলার অভিনবতায় হাল্কা ও হৃদ্য করে তুলেছেন, এমন সরস প্রবন্ধও আছে তাঁর অনেক।

রবীন্দ্রনাথের পর প্রমথ চৌধুরী এবং প্রমথ চৌধুরী থেকেই আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্যের সত্যকার আরম্ভ। সুরুতেই বলেছি, প্রাবন্ধিক এ-দেশে বরাবর

থেকেছেন গুরু, অভিভাবক ও বিচারকের আসন অধিকার করে। তাঁর চিন্তা ও চলন বলনে কোথাও ঢিলে-ঢালা হাল্কা ভাব থাকবে না, কোথাও তিনি যুক্তি-প্রমাণ ও বিচার-বিশ্লেষণ থেকে এক-পা এদিক ওদিক করবেন না, এই ছিল চলতি রেওয়াজ। কদাচিৎ যে বিশিষ্ট লেখকরা এর ব্যতিক্রম করে অল্প স্বল্প হাল্কা প্রবন্ধ লিখেছেন, তা চুটকি বা চাটনি জাতীয় জিনিষ বলেই গণ্য হয়েছে। কেউ তাতে উঁচু মূল্য আরোপ করেননি। প্রমথ চৌধুরীই প্রথম আমাদের এদিককার দৃষ্টিভঙ্গী আমূল পাল্টে দিলেন।

তিনি দেখালেন, ভারী বিষয়কেও লঘু করে বলা যায়, কাজের কথাকেও রসের কথায় পরিণত করা যায়, পাণ্ডিত্যকেও রঙ্গ-রসের মোড়কে মুড়ে পরিবেষণ করা যায়। বাংলা প্রবন্ধের নবজন্ম লাভ হল এই থেকে। প্রাবন্ধিকের একটা ব্যক্তি-রূপ প্রতিফলিত হতে লাগল রচনায়, যার ফলে লেখার সঙ্গে লেখককেও পাওয়ার সুযোগ হল। আজকের প্রবন্ধকাররা সবাই কম-বেশী অনুপ্রাণিত হয়েছেন এই থেকে। সুরেশ চক্রবর্তীর হসন্তের পত্র, দিলীপকুমার রায়ের ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জী, অন্নদাশঙ্কর রায়ের পথে প্রবাসে, প্রবোধকুমার সান্যালের পায়ে-হাঁটা পথ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের বৃষ্টি এল, বুদ্ধদেব বসুর হঠাৎ আলোর ঝলকানি, সব পেয়েছির দেশে, জ্যোতির্ময় রায়ের দৃষ্টিকোণ, আধুনিক বাংলা প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য বই সবগুলিতেই পাওয়া যাবে কোন-না-কোন ভাবে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব।

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন ফরাসী সাহিত্য-রসে আকণ্ঠ মগ্ন। ফরাসী গদ্য থেকেই তিনি আমদানি করেছিলেন প্রবন্ধ লেখার এই বিশেষ ভঙ্গীটি। ইংরেজের প্রাবন্ধিক হাত প্রধানত ভারীর দিকে, যদিও অবশ্য অ্যাডিসন ও ল্যাম্ব থেকে চেস্টারটন পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল লঘু প্রবন্ধের ঐশ্বর্যও ছড়িয়েছেন তাঁরা প্রচুর। ইংরেজীর যাঁরা সেরা গদ্য লিখিয়ে, জনসন, হেজলিট, কার্লাইল, মেকল্যে, রাস্কিন, ম্যাথু আর্নল্ড, সবাই গুরু পদবীর মানুষ, বয়স্য হিসাবে মেশা যায় না তাঁদের সঙ্গে। পক্ষান্তরে ফরাসী গদ্য লেখকরা কেউ এমন ব্যাপ্ত খ্যাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত না হলেও, তাঁদের সাধারণ-অসাধারণ সকলেই অনায়াসে হয়ে ওঠেন পাঠকের কাছের মানুষ। যেহেতু সকলেরই আছে একটা মেজাজ, একটা অন্তরঙ্গ ঢং, যা মনকে টানে।

আধুনিক বাংলা গদ্য লেখকরা অনেকেই হয়ত অনুশীলন করেন নি ফরাসী গদ্যের, কিন্তু এই মেজাজ ও ঢংটা তাঁদের হাতে এসে গেছে। কতকটা এসেছে ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে, কতকটা বা যুগ-ধর্মে। কিন্তু বেশীর ভাগটাই পেয়েছেন তাঁরা প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র থেকে। পূর্বে যে আধুনিক বাঙালী প্রাবন্ধিকদের কথা উল্লেখ করেছি, কেউ কেউ তাঁরা ভারী প্রবন্ধও লিখেছেন সাহিত্য বা সমাজ নিয়ে। কিন্তু সেখানেও রচনা তাঁদের সাহিত্য-ধর্ম স্খলিত হয়ে নিছক তত্ত্ব আলোচনা বা সম্পাদকীয় অভিমতে পর্যবসিত হয়নি! তার কারণ মানসিকতার গঠন তাঁদের তৈরি হয়ে গেছে, এ-কালের মাল-মশলা দিয়ে।

অবশ্য তেমন জিনিষ বেশী লেখেননি তাঁরা। দৃশ্যত যা খুব কাজের জিনিষ নয়, এমন কি ষোল-আনাই অকাজের জিনিষ, যেদিকে চোখ পড়ে না কারো, অথবা পড়লেও যা অল্পই মনযোগ আকর্ষণ করে মানুষের, এমন সমস্ত ব্যাপারের মধ্যেও যে ভাব ও ভাবনার, চিন্তা ও জল্পনার বস্তু থাকতে পারে, এটাই বিশেষ করে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন তাঁরা। হয়ত সোজাকে বাঁকা করে দেখানো, মেকিকে খাঁটি বলে বোঝানো এবং করুণকে কৌতুক দিয়ে ভোলানোর চেষ্টা থাকে, ভঙ্গী হিসাবে যার নাম দেওয়া যেতে পারে mock heroic, তবু পরিবেষণের গুণে পরম উপভোগ্য হয়ে ওঠে এই সব রচনা। সেই জন্যেই এ-যুগে এই শ্রেণীর রচনার প্রাদুর্ভাব একটু বেশী মাত্রায় হতে দেখা যাচ্ছে।

এখনকার পারিভাষিক হিসাবে এদের নাম দেওয়া হয়েছে রম্য রচনা, যা সংজ্ঞা হিসাবে খুব বেশী সার্থক মনে করতে পারবেন না অনেকেই। কারণ রচনা, সে গল্প. কবিতা, প্রবন্ধ যাই হক, রম্য না হলে ত সাহিত্য পদবাচ্যই হয় না। কিন্তু সংজ্ঞা যাই হক, ইদানীং রম্য রচনা বা লঘু প্রবন্ধ যে হারে লেখা হচ্ছে, তার সমস্তই সার্থক বা সাহিত্য-গুণ সম্পন্ন হচ্ছে কি না, সে প্রশ্নের নিশ্চয় অবকাশ আছে। অনেক রচনা দেখি, যা গল্প হয়ে উঠতে পারেনি বলে প্রবন্ধ হয়েছে, কিংবা প্রবন্ধ হতে হতে শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়েছে গদ্য কবিতা, অথবা পুলপিট-বক্তৃতা। অর্থাৎ এই সব লেখায় একটা পরিণত সাহিত্য-রূপ দানা বেঁধে ওঠে না। ভাঙা-ভাঙা আলাদা-আলাদা সরস উক্তিগুলি যদিও ভালোই লাগে বেশ।

হয়ত এই জাতীয় রচনার সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে লেখকরা নিজেও নিঃসন্দেহ নন। তাই অধিকাংশই সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন ছদ্ম নামে। তাঁদের মধ্যে প্রিয়দর্শী, যাযাবর, ইন্দ্রজিৎ, রঞ্জন, শঙ্কর ও নীলকণ্ঠ দৃষ্টির নূতনত্ব ও ভঙ্গীর সজীবতায় অনেকের মনোহরণ করেছেন। সাহিত্যের এই বিভাগটি এঁদের হাতে আরো সমৃদ্ধ হক, এই কামনা করি।

নূতন যুগের জীবনী

অল্প দিন আগেও বাংলা ভাষায় জীবনীগ্রন্থ লেখার বেশ একটা ঝোঁক দেখা যেত। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আধুনিক বাংলার যাঁরা স্রষ্টা, জ্ঞান ও কর্মের বিচিত্র বিভাগ যাঁদের দানে সমৃদ্ধ, তাঁদের সকলেরই জীবন-চরিত বিষয়ক বহু বই বাজারে চলিত ছিল। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রামমোহন জীবনী, বিহারীলাল সরকার বা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাসাগর জীবনী, অজিত চক্রবর্তীর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী, নগেন্দ্রনাথ সোম বা যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেল জীবনী, সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়ের রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনী, গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর বিবেকানন্দ জীবনী আশা করি ছাত্র-জীবনে সবাই পড়েছেন। এ ছাড়া প্রভাত মুখোপাধ্যায়েব রবীন্দ্রজীবনী, জগদানন্দ রায়ের আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনী, অনাথনাথ বসুর শিশিরকুমার ঘোষের জীবনী, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের দেশবন্ধু জীবনী এবং প্রমোদকুমার সেনের অরবিন্দ জীবনীও আশা করি অনেকের দেখা ও পড়ার সুযোগ হয়েছে।

বিগত শতাব্দীর যাঁরা যুগ-পুরুষ, যাঁদের বহুমুখী প্রয়াস-প্রচেষ্টার ফলেই বাংলাদেশ মধ্যযুগীয় অনগ্রসরতা থেকে বর্তমান কালের সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাঁদের জীবন ও কর্মের সব দিক শ্রদ্ধা সহকারে বোঝা এবং বোঝানোর আন্তরিক আগ্রহ থেকেই যে এই বইগুলি জন্মেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য এ কথা ঠিক যে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী বা বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার মাপকাঠিতে বিচার করলে, এ সব বইয়ের বেশীর ভাগকেই আজ বকেয়া ধারার রচনা হিসাবে বাতিল করতে হয়। তবু তথ্যাহরণে বা বস্তু-বিশ্লেষণে এ সব বইয়ের রচয়িতাদের শ্রম এবং নিষ্ঠার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

সত্যকার কাজের কাজ হত, আজকের ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠা ও মনো-বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ধারা অনুসরণ করে, এই সব বইয়ের বস্তুপুঞ্জ আবার নূতন আকারে নূতন বইয়ের মাধ্যমে পরিবেষণ করা হলে। দুঃখের বিষয়, এই সব যুগস্রষ্টা বাঙালী সম্বন্ধে নূতন বই ত এ-কালে লেখা হয়ই নি, পুরানো বইগুলিও প্রকাশ এবং প্রচারের অভাবে বাজারে অলভ্য হয়েছে। এখন একমাত্র সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে, নয়ত ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে অনুসন্ধান করেই

গবেষক-লেখকদের এই সব বইয়ের হদিশ করতে হয়। তবে সে প্রয়োজন কমই হয়, কেন না আধুনিক কালের লেখক সমাজ মূলত লেখেন গল্প-উপন্যাস, সাহিত্যের অপরাপর বিভাগ, যথা নাটক, আখ্যান কাব্য, ভ্রমণ কাহিনী, জীবনী ইত্যাদিতে তাঁদের মনোযোগ দেবার ইচ্ছাও নেই, অবকাশও হয় না।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কিন্তু এ অবস্থা নয়। একই জীবনকে তাঁরা প্রতি যুগের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যমান অনুযায়ী নূতন করে যাচিয়ে দেখেন। এই-ভাবেই পুরানো দিনের পুরুষ-প্রধানরা তাঁদের চোখের সামনে বার বার নূতন আলোকে, নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এক নেপোলিয়ান, গ্যেটে ও ভলতেয়ারকে আশ্রয় করে কত বার কত নূতন ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে, হচ্ছে, তা এমিল লুডভিগ, আঁদ্রে মুরো, স্তেফান জুইগ, এরিকা মান ও লিটন স্ট্র্যাচির রচনা অনুসন্ধান করলেই বোঝা যাবে! আমাদের দেশেও ঠিক এই ভাবেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, হরিশ মুখুজ্যে, কেশব সেন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার পুনর্বিচার হতে পারে। হওয়া উচিত। কিন্তু কে করবেন সে কাজ? কাজটা অবশ্য শ্রম ও সময়সাপেক্ষ এবং সে জন্যে সমুচিত প্রতিদান লাভের আশাও কম। প্রধানত সেই জন্যেই সাহিত্য-সাধকের এ ব্যাপারে আগ্রহ আসে না। তা ছাড়া, আমাদের সাম্প্রতিক সংস্কৃতির মধ্যেই কোথায় যেন অদৃশ্য ভাবে একটা অশ্রদ্ধাবাদ কাজ করছে, যা পুরানোকে খালি অস্বীকার করতেই শেখায়।

বাংলা ভাষায় খোঁজ করলে আজ ফ্রয়েড, আইনষ্টাইন, বার্গসোঁ, ক্রোচে ও বোসাঙ্কে সম্বন্ধে দু-চারখানা করে বই পাওয়া যাবে। মার্ক্স সম্বন্ধে এবং মার্ক্সীয় মতবাদের আলোকে ইতিহাস, অর্থনীতি ও সমাজ-বিকাশের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে ত সত্যিকার ভালো বই-ই পাওয়া যাবে অনেকগুলি। এমন কি, কেয়ার্ড, ডিউয়ী, হোয়াইটহেড, ম্যাকডুগাল, প্যাভলভ, মিচুরিণ, লাই-সেঙ্কো প্রভৃতি সম্বন্ধেও কিছু-কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। বলা অনাবশ্যক, এতে বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যই বেড়েছে। বাঙালী মননশীলতায় আন্তর্জাতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক বিস্তারে এ-সব রচনা যথেষ্ট সহায়তাই করেছে। সে-দিক থেকে এ-সব রচনাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাবেন প্রত্যেক সংস্কৃতিমান ব্যক্তিই। কিন্তু তবু এ-কথা দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হবে যে আমাদের জ্ঞানানুশীলনের ধারাটা ক্রমেই যেন-ষোল আনা বহির্মুখী হয়ে পড়ছে। তার

ফলে আপন প্রাণ-মৃত্তিকার মর্মপরিচয় নেবার প্রয়োজন আমাদের শিথিল হয়ে যাচ্ছে, আর নানা দিক-দেশের নভশ্চারী মত ও আদর্শ আমাদের মনের মুল্লুকে সজোরে চেপে বসছে। এর ক্ষতির দিকটাও উপেক্ষা করলে চলবে না।

এ কথা ঠিক যে, দেশ ও জাতীয়তার নিরূপিত সীমানার বাইরে মানুষের একটা সার্বভৌম সত্তা আছে, যেখানে সে সর্ব-মানবের অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাকে সেই সর্ব-মানবিক বোধে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন কম নয়, এ কথাও স্বীকার্য। কিন্তু তবু সত্যকার বিশ্বমানবতা একটা ভাব মাত্র, যার স্থিতি ভৌগোলিক আত্মস্বতন্ত্রতা ও সাংস্কৃতিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতার ওপর। এই মূল বনিয়াদটা মুছে দিয়ে কোন কিছু গড়ার চেষ্টা করলে, গড়ার কাজ সার্থক ভাবে অগ্রসর হবে না, কিন্তু ভাঙার কাজ অনিবার্য ভাবেই শক্তি সঞ্চয় করবে। সেই ভাঙনের হাওয়াই আজ যেন প্রবল হয়েছে। তার ফলেই ব্যাপক একটা অস্বীকৃতির আদর্শ আজ সর্বাধিক আধুনিকতার লক্ষণ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

এটা দুর্লক্ষণ এবং বাংলা ভাষায় জীবনীগ্রন্থের অভাব ও অনাদরই এই দুর্লক্ষণের মুখ্য পরিচয় বলে মনে করি। কেন বলছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ যখন এ-দেশ দখল করেছিল, তখন দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম দৈন্যদশা চলছে। হিন্দু সংস্কৃতি তার গতি-শক্তি হারিয়েছিল অনেক আগেই, মুসলিম সংস্কৃতিও তখন মরণাপন্ন। সেই জরাজীর্ণ পটভূমিতে ইংরেজ বসাল তার বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদের কারবার এবং এই কারবার সার্থক ভাবে চালানোর জন্যে এক দিকে গড়ল কিছু নগর, বন্দর, আর এক দিকে গড়ল কিছু সংখ্যক ইংরেজী শিক্ষিত কেরাণী, বানিয়ান, মুৎসদ্দি। সেই সুকৌশল শোষণের মধ্যে থেকেও ভারতবাসী যে আলজিরিয়া, টিউনিস, মরক্কো বা পূর্ব-আফ্রিকার উপনিবেশগুলির মতো হৃত-সভ্যতার ভগ্নস্তূপ হয়ে ওঠে নি, সে শুধু ভারতবাসীর জাতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির গুণে।

এই শক্তিই বিদেশী শিক্ষার অনুপ্রেরণা পেয়ে স্বদেশীয় অগ্রগতির পথ খুঁজে বের করেছিল। রাষ্ট্রনীতিক পরাজয়ের মধ্যেই এখানে হয়েছিল ভারতের জয়। সেই সংগ্রামের যাঁরা সেনাপতি, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, হরিশ মুখুজ্যে, বঙ্কিম প্রভৃতি, তাঁদের জীবন ও কর্মের পরিচিতি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে। তবেই অতীত থেকে ভবিষ্যতের পথে সম্ভব হবে আমাদের যাত্রা।

বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা

গত শতাব্দীর তুলনায় আজকের বাংলা গল্প-উপন্যাসে বিষয় ও পরিবেশের বৈচিত্র্য বেড়েছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গণ্ডী ছাড়িয়ে সাহিত্য আজ ছড়িয়ে পড়েছে অখ্যাত, ধিক্কৃত ও অবহেলিত মানুষের মুল্লুকে। বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে বৃহৎ ভারতবর্ষে, এমন কি, আন্দামানে, সিংহলে, ব্রহ্মদেশেও ব্যাপ্তি হয়েছে তার। নিঃসন্দেহে এটা স্বাগত করার বস্তু, কারণ প্রথম পর্যায়ের সৃজনী প্রতিভা এলে এই পটভূমিতেই সোনা ফলবে।

কিন্তু বিষয় ও বস্তু-বৈচিত্র্যের সঙ্গেই ভাষাগত বৈচিত্র্য সাধনের পরীক্ষাও সুরু হয়েছে বাংলা কথা-সাহিত্যে। পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর-বঙ্গের গ্রামাঞ্চলীয় কথ্যভাষার নির্বিচার ব্যবহার হচ্ছে বাংলা লেখায় এবং একে বলা হচ্ছে বাস্তবানুগামিতা। আমি এর ঘোর বিরোধী। আমার জন্ম পশ্চিমবঙ্গে। বৈষয়িক প্রয়োজনে দু-একবার পূর্ববঙ্গে গিয়েছি বটে, কিন্তু কোন জায়গাতেই দিনের পর দিন থাকিনি। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আদান-প্রদানের সুযোগও পাইনি। পূর্ব-বাংলার চলতি ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় তাই নিতান্ত ওপর-ওপর।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন পূর্বাশায় 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাস লেখা সুরু করলেন এবং অধিকাংশ পাঠক তার বিষয় ও বাচন-ভঙ্গীর অভিনবতাকে উচ্চ সাধুবাদে সম্বর্ধিত করতে লাগলেন, আমি তখন তার পূর্ববঙ্গীয় কথ্য ভাষার ওপর বার বার হোঁচট খেতে লাগলাম। অথচ লজ্জায় সে কথা ব্যক্ত করতে পারলাম না কারো কাছে, কেন না সমসাময়িক কালের এমন একখানা সর্বজন প্রশংসিত বই আগাগোড়া বুঝতে পারছি না, এতে নিজেরই দীনতা প্রকাশ পায়। অন্তত সেদিন তাই ভেবেছিলাম।

সেদিনই আমার মনে হয়েছিল, নাটক, উপন্যাস বা গল্পে সার্থক বাস্তবতা বিধানের জন্যে স্থানিক নাম, শব্দ বা রীতি-নীতির প্রসঙ্গ দু-চারটি আমদানি করা প্রয়োজন হলেও, দরাজ হাতে আঞ্চলিকতার আবাদ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। সমগ্র জাতির লেখা-পড়ায় বা শিষ্ট সমাজের আলাপ-আলোচনায় যে

ভাষা ব্যবহৃত হয়, সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত সেই ভাষাতেই, কেন না তা গোটা জাতির জন্যে।

মনে আছে, সাহিত্য সেবক সমিতির এক বৈঠকে এই আলোচনা যেদিন হয়েছিল, সেদিন স্বয়ং মানিক হাজির ছিলেন আত্মপক্ষ সমর্থন করতে। তিনি বলেন, এই বৃহৎ ও বিচিত্র বাংলা দেশকে পুরোপুরি সাহিত্যে ফোটাতে হলে, তার মাটি, মানুষ, গাছ-পালা ও কলা-কৃষ্টির সব দিককেই সাহিত্যায়িত করতে হবে। এখানে ছুৎমার্গ এক রকম 'শহুরে স্নবারি', যা গণ-সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান অন্তরায়। (সভাপতি) বর্তমান লেখকের অনুরোধে মানিক 'স্নবারি' কথাটা শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করে বলেছিলেন 'বড় মানুষীয়ানা'।

বস্তুত কথাটা যাই হক, জনতার বন্ধু মানিকের বক্তব্য ছিল এই এবং এত খানি দরদ ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন নন যে-সব লেখক, তাঁদের অনেকের মুখেও শুনেছি এবং শুনি একই কথা, গল্পে উপন্যাসে অবাধে আঞ্চলিক ও অভিধান-বহির্ভূত ভাষা ব্যবহারের সমর্থনে। কিন্তু বহু জনের সমর্থন পুষ্ট হলেও, আঞ্চলিকতার বিরুদ্ধে আমার যে মত, তা আজও অপরিবর্তিত আছে। বরং যত দিন যাচ্ছে, ততই আপন প্রত্যয়ে আমার নিষ্ঠা বেড়ে চলেছে। কেন বলছি। বছর দুই আগে বন্ধু মনীশ ঘটকের একটি গল্প পড়েছিলাম। এতে শুধু পাত্র-পাত্রীর কথোপকথন নয়, লেখকের বক্তব্যও আদ্যোপান্ত পূর্ববঙ্গের ভাষায় পরিবেষণ করা হয়েছে। মনীশ তাঁর বহরমপুরের বাসায় এক মাধ্যাহ্নিক ভোজনের আসরে কথায় কথায় বললেন, কেমন লাগল বলো ত গল্পটা ? বললাম, চমৎকার, যেহেতু একবর্ণও বুঝিনি তোমার ঐ সযত্ন গ্রথিত বাঙাল ভাষার।

মনীশ মানিকের মতো বলিষ্ঠ যোদ্ধা নন, তিনি তাই প্রচুর কৌতুক-হাস্য করলেন। কিন্তু যুক্তি তাঁরও একই। বাস্তবতা যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহলে বাংলা দেশের যে-কোন অঞ্চলে মানুষ যে ভাষা বলে, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-কল্পনা প্রকাশ করে যে ভাষায়, বাংলা সাহিত্যের বৃহৎ পরিবেশে কেন তার স্বীকৃতি থাকবে না ? ইংরেজরাও কি স্ল্যাং বা ককনি বুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট নিষ্কুণ্ঠ নন ? যথেষ্ট নিষ্কুণ্ঠ নন কি পাত্র-পাত্রীর মুখে অনিংরেজী ভাষা বসানোর ব্যাপারে ? বলা বাহুল্য, ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম যা, ইংরেজ করুন, আর ফরাসী করুন, আর বাঙালীই করুন, তা সমান অবাঞ্ছনীয়।

আসলে মনে রাখতে হবে, জীবনে মানুষ যা বলে, যা করে, সাহিত্য তার হুবহু টেপ-রেকর্ড বা ফটোগ্রাফ নয়। জীবনের বাস্তব ভিত্তি আশ্রয় করে জন্মালেও, তা হল কল্পনার সৃষ্টি। তাই খোঁচা দিলে রক্ত পড়ার মতো বাস্তবতা তাতে খুঁজলে চলবে কেন? আর তেমন জলজ্যান্ত বাস্তব কি শিল্প-পদবাচ্যই হবে?

ধরা যাক একটি বিহারী বা মাদ্রাজী চরিত্র, বাংলা নভেলে এসে সে কি হিন্দী বা তামিল বলবে, না বাংলা? যদি বাংলা বলাই মঞ্জুর হয় ত নিশ্চয় তা ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা। বাঙালীই বা তাহলে বহু জনের অবোধ্য আঞ্চলিক বাংলা বলবে কেন? সেক্সপীয়ারের গ্রীক, রোমান, ইতালীয়ান, ডেন, সব চরিত্রই বিশুদ্ধ এলিজাবেথীয় ইংরেজী বলে। ডিকেন্স, থ্যাকারে, হার্ডি, মেরিডিথ, লরেন্স, গ্যালসওয়ার্দি, শ' বা মমের কোন পাত্র-পাত্রীই বেপরোয়া ককনি বা স্ল্যাং বলে না। সিঙ্গের নাটকের জেলেরা অবশ্য আইরিশ স্ল্যাং বলে। কিন্তু সিঙ্গের ওটা কেল্টিক বায়ুরোগ ছাড়া কিছু নয়। প্রধান লিখিয়ে যাঁরা ইংরেজী ভাষার, তাঁরা সবাই জানতেন ও জানেন যে গোটা জাতির জন্যেই লিখছেন তাঁরা। এটা জানেন না বলেই, আমাদের কোন কোন ঔপন্যাসিক তাঁদের পাত্র-পাত্রীর মুখে অনর্গল ইংরেজী, হিন্দী এবং দেশজ বাংলা বসান।

এটা জানতেন না বলেই, আমাদের আগেকার নাট্যকাররা ইংরেজ ও ফরাসীকে দিয়ে 'ডেকো রাজা, টোমার স্বডেশবাসী টোমাকে রসাটলে টলিয়ে ডিচ্ছে' গোছের বিকৃত বাংলা বলাতেন, তথাকথিত বাস্তবতার নামে, যা সুপথ্য নয় ইংরেজ বাঙালী, কারো রসনাতেই। কাজেই বাস্তবতা কথাটা একটু ওজন করে নেওয়া দরকার। চোখ বুঁজে নিতে গেলেই বিপত্তি হবে। সুখের কথা যে আমাদের নামী লেখকেরা তা নেন নি।

বাংলা দেশের বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিক যাঁরা, তাঁরা যদি প্রত্যেকে আপন আপন আঞ্চলিক ভাষার 'ঐশ্বর্য' দু-হাতে ছড়াতে বদ্ধপরিকর হন, ধরুন, তারাশঙ্কর বীরভূমের, শৈলজানন্দ বর্ধমানের, মনোজ যশোরের, বুদ্ধদেব ঢাকার, নারায়ণ জলপাইগুড়ির এবং সুশীল (জানা) মেদিনীপুরের দেশজ শব্দই যদি সাহিত্যে নির্বিচারে ব্যবহার করতে লেগে যান, অচিন্ত্যকুমার নোয়াখালির, অমরেন্দ্র ঘোষ বরিশালের, প্রমথনাথ বিশী রাজসাহীর এবং সরোজকুমার মুর্শিদাবাদের কথ্য ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষাকেই যদি পাত্র-পাত্রীর মনোভাব প্রকাশের সার্থক মাধ্যম মনে না করেন, তাহলে বাংলা সাহিত্যটা

কি রাতারাতি একটা টাওয়ার অব ব্যাবেল হয়ে উঠবে না? বাংলা দেশে জন্মানোর অক্ষয় পুণ্য বলেই ত কেউ এত রকম আঞ্চলিক ভাষায় অধিগতবিদ্য হন না। একটা-না-একটার ওপর হোঁচট খেতে হবেই প্রত্যেককে। কাজেই বাংলা সাহিত্য যদি সমগ্র বাঙালী জাতিকে পড়ানো এবং বোঝানোর জন্যে হয়, তাহলে ভাষাগত সর্ব রকম আঞ্চলিকতা পরিহার করে ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাংলাতেই তা লিখতে হবে। তবে গল্পে ভূমিভিত্তিক বাস্তবতা সৃষ্টির জন্যে এখানে সেখানে এক-আধটু ফোড়ন দেওয়া হয়ত দরকার। তেমন ফোড়ন দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরীও, আবার আগের ধাপে মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমও। দীনবন্ধু নিয়ে হয়ত আপত্তি আছে অনেকের, আছে কতকটা আমারও। কিন্তু তবু ঐ পর্যন্তই সীমা-রেখা, ওর বেশী নয়।

তাহলে আমার বক্তব্য কি দাঁড়াল? কলকাতা সারা ভারতের সংক্ষিপ্ত-সার, সারা বাংলার রাজধানীও। সুতরাং কলকাতার ভাষাই কি তাহলে ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা? খাস কলকাত্তিয়া ভাষা নিশ্চয় নয়। তবে নানা জেলা থেকে আগত শিক্ষিত বাঙালীর আদান-প্রদানের ভেতর দিয়ে যে ভাষাটা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে কলকাতায়, সেটা নিশ্চিতই ষ্ট্যাণ্ডার্ড এবং সাহিত্য রচনায় তার ব্যবহারই অভিপ্রেত। অর্থাৎ আজকের গাঙ্গেয় বাংলাই বাংলা এবং যতদূর দেখেছি, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, অন্নদাশঙ্কর, আগে যাঁদের নাম করেছি তাঁরা এবং আমি আপনি সবাই, এই বাংলারই আনুগত্য করি। দু-এক জন যাঁরা জোর করে ব্যতিক্রম করেন, কম্যুনিষ্ট অভিধায় তাঁরা এক ধরণের শোধনবাদী এবং আমার মতে তাঁরা ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতা-বিরোধী কাজ করেন।

বাংলা সাহিত্যে কলিকাতা : রস-রচনায়

ইংরেজ কুঠিয়াল জব চার্ণক সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কালিঘাটা, এই তিনখানি গ্রাম একত্র করে যেদিন কলকাতা নগরীর পত্তন করেন এবং বিদেশী রসনায় বিকৃত হয়ে কালিঘাটা নামই ক্যালকাটা হয়, যার বঙ্গানুকরণ হয় কলকাতা, সেদিন কে জানত, ভারতের সর্বপ্রধান নগরী হবে এই নূতন শহর ? কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, মথুরা, দিল্লী ও আগ্রার মতো প্রাচীন শহর নয় কলকাতা। শাস্ত্রে সাহিত্যে কোথাও নেই তার সম্মানজনক স্বীকৃতি। তবু দুশো আড়াই-শো বছরে কলকাতা ভারতের ইতিহাসে যে জায়গা দখল করেছে, তার পাশে দাঁড়ানোর শক্তি হল না কারো। বাংলা সাহিত্যেও কলকাতা যে রাজকীয় মর্যাদার আসন লাভ করেছে, এমন আর করেছে ভারতের কোন শহর ?

গল্প, উপন্যাস, নাটক ও রসরচনায় কলকাতা যতখানি জায়গা অধিকার করেছে বাংলা সাহিত্যে, ইংরেজের সাহিত্যে লণ্ডন এবং ফরাসীর সাহিত্যে প্যারীর স্থান বোধ হয় তার চেয়ে বেশী নয়। কলকাতাই বাঙালী সাহিত্যিককে দিয়েছে সর্বাধিক হাসি-কান্নার খোরাক, দিয়েছে সর্বাধিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভাবনা-চিন্তার অনুপ্রেরণা। বরং এটাই অনেকে অনুযোগের সঙ্গে বলেন যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য এত বেশী কলকাতাকেন্দ্রিক যে কলকাতার বাইরে সমগ্র বাংলার রূপ তাতে যথেষ্ট স্বচ্ছ ও সহজলভ্য নয়। এ অভিযোগ ষোল-আনা সত্যি না হলেও, এর মোটামুটি ভিত্তিটা সত্যি এবং তার ইতিহাস-সম্মত কারণও আছে।

পুরানো আমলে বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্প-বাণিজ্যের ছোট-বড় অজস্র কেন্দ্র সারা দেশে ছড়ানো ছিল। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, খড়দা, এই সব জায়গা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতির এক-একটি স্বয়ং স্বচ্ছল কেন্দ্র, মুর্শিদাবাদ, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম, মগরা, এই সব যেমন ছিল বাণিজ্য-কেন্দ্র। ইংরেজ আমলেই প্রথম কলকাতা হয়ে উঠল একাধারে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও শিল্প-বাণিজ্যে সারা বাংলার, শুধু বাংলার কেন, ভারতের প্রধান প্রাণ-কেন্দ্র এবং দেশের মফঃস্বল অঞ্চলগুলি ফাঁকা করে ধন-শক্তি ও জন-শক্তির বাছাই করা অংশ সমস্তটাই এসে জড়ো হতে লাগল কলকাতায়। ফলে কলকাতাকে আশ্রয় করে

জন্মাল যে নূতন যুগের সাহিত্য, তাতে অনিবার্যভাবেই কলকাতা নিল মুখ্য স্থান। শিক্ষিত বাঙালীর মন থেকেই যেখানে বাংলা দেশ গেল আস্তে আস্তে পিছু হঠে, সেখানে সাহিত্যে তার ছায়া ত প্রতিফলিত হবেই। তাছাড়া কলকাতার জন্মসূত্র ধরেই জন্ম হয়েছিল বাংলা গদ্য লেখারও। তাই কলকাতা ও বাংলা গদ্য রচনা সুরু থেকেই যাত্রা আরম্ভ করল যেন পরস্পরের পরিপূরক রূপে। আধুনিক সাহিত্যের একেবারে প্রথম আমলের নিদর্শনগুলি থেকেই সাহিত্যে কলকাতার এই রূপায়নের ইতিহাস সুরু করা যেতে পারে এবং নাটক, উপন্যাস, গল্প, রঙ্গচিত্র, প্রবন্ধ নিবন্ধ, সকল বিভাগ থেকেই টানা যেতে পারে এই ইতিহাসের ধারা।

সূচনা কালের অন্যতম প্রধান গদ্যলেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নক্সাজাতীয় একখানি বই লেখেন, তার নাম 'কলিকাতা কমলালয়'। এই বইয়ে এবং এঁরি লেখা 'নববাবু বিলাস' নামক বইয়ে প্রথম নূতন শহর কলকাতার জীবন ও সমাজের বিশদ ছবি দেখতে পাই আমরা। এর পর পাই টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় এবং মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'তে। এর মধ্যে 'নববাবু বিলাস' ও 'আলালের ঘরের দুলাল' দৃশ্যত উপন্যাস এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'সধবাব একাদশী' নাটক আকারে লেখা হলেও, আসলে এরা সবই রঙ্গচিত্র ও রস-রচনার পদবীভুক্ত এবং সেদিক থেকে হুতোম প্যাঁচারই সমগোত্রীয়। কারণ উপন্যাসের ব্যাপ্তি বা পরিণতি নেই প্রথম বই দুটিতে, দ্বিতীয় দুটিতে নেই নাটকের সমগ্রতা। চলতি সমাজের ন্যাকামি, কাপট্য, আতিশয্য ও অনাচারকে উদ্ঘাটিত করার জন্যে বইগুলি লেখা এবং নাটক উপন্যাস বা গল্পের ছক এগুলিতে অনুসরণ করা হয়েছে শুধু নামে মাত্র। যেমন পদ্যাকারে ঈশ্বর গুপ্ত নূতন নগরী ও নাগরিক ও নাগরিকাদের নিয়ে যে রঙ্গ-ব্যঙ্গ করেছেন, তা ছন্দোবদ্ধ হলেও আসলে রস-রচনাই।

তবে প্রথম আমলের এই পর্যাপ্ত পরিমাণ রচনার মধ্যে হুতোমের নক্সাটিরই সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। রঙ্গ-রচনার চলতি প্রয়োজনে জন্ম হলেও, এর বেশীর ভাগ নক্সাই রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের কোঠায় পৌঁছেছে।

আগে যে বইগুলোর কথা বলা হয়েছে, তার সবগুলোতেই একটা জিনিষ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে: সে হল, নূতন কলকাতিয়া সমাজ ও সভ্যতার

সমালোচনা। সব কটি বইয়ের মতেই কলকাতার মারাত্মক প্রভাবে বাঙালীর ছেলে তার পুরানো হাল-চাল ভুলছে, বয়াটেপণা করে ঘর-সংসারের শান্তি ও সমাজের শালীনতা রসাতলে দিচ্ছে। নূতন নগরী, তার নূতন শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে কোথাও লেখকরা দেখেন নি কোন ভাবী কল্যাণের সম্ভাবনা। তাই তাঁদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ দৃশ্যত যতই কৌতুককর হক, আসলে তার তলায় তলায় প্রচ্ছন্ন থেকেছে তীব্র শ্লেষ ও তীক্ষ্ণ অসূয়ার বিষ-দংশন। হুতোম রচয়িতা একমাত্র কালীপ্রসন্নই বোধ হয় কলকাতাকে দেখেছিলেন প্রথম প্রসন্ন দৃষ্টিতে। তাই তাঁর সমস্ত রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও কথা-কৌতুকের আড়ালে মিষ্টি একটি মমতার ছোঁয়া পাওয়া যায়। এ কথা ঠিক যে আক্রমণ তিনিও করেছেন এবং তা করেছেন 'কালেজে পড়া এজুকেটেড' যুবাদের এবং 'গায়ে বালাপোষ ও পায়ে ভটচার্যি চটিওয়ালা' বকেয়া পন্থীদেরও, যাঁরা সদ্য গ্রাম থেকে শহরে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন এবং এক দিকে নূতন শহরের টাকার জোয়ারকে খাল কেটে নিজের নিজের তহবিলে এনে ঢোকানো, অন্য দিকে সনাতনীয়ানাকে সমস্ত শহুরে পরিবর্তনের মধ্যেও জোরালো গলায় জাহির করা ছিল যাঁদের নিত্য কর্ম। কোন পক্ষেই ছিল না তার স্পষ্ট কোন পক্ষপাত। তাছাড়া কোন সত্যিকার হতাশাও ফুটে ওঠেনি তাঁর লেখায়, যা হয়েছে অন্যগুলিতে।

এর পর এলেন বঙ্কিম এবং তিনিই যেমন আমাদের প্রথম সার্থক গদ্য লিখিয়ে, তেমনি প্রথম রস-রচয়িতাও। 'কমলাকান্ত' ও 'লোক-রহস্য' তাঁর এই বিভাগের বিখ্যাত রচনা সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর সমস্ত রচনাতেই রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও হাস্য-কৌতুক এবং ঝাল-নুন মেশানো বাঁকা টিপ্পনী যেখানে সেখানে পাওয়া যায় অজস্র পরিমাণে। এক কলকাতাকেই তিনি দেখেছেন কত রকমে! কখনো দেখেছেন কলকাতাকে বখামির নব বৃন্দাবন রূপে, যেখানে দু-কলি ইংরেজী বুলি বলতে অভ্যস্ত হয়েই বাঙালী সন্তান জাতীয় চাল-চলন জলাঞ্জলি দিয়ে সুরা উপাসক ইয়ং বেঙ্গলে পরিণত হয়েছেন এবং বধূকে বিবি বানানোর দুষ্কর পরীক্ষায় শক্তি ও সময়ের অপব্যয় ঘটাচ্ছেন! আবার দেখেছেন, সদ্য গজানো ধনতন্ত্রের শ্রীধাম জগন্নাথ রূপে, যেখানে সামলা মাথায়, পিঠে তাকিয়া ও হাতে সটকার নল নিয়ে পুরানো ভূম্যধিকারীর বংশধর নূতন শ্রেষ্ঠী রূপে লাভের কড়ি গুণে দিন গুজরান করছেন। কখনো তিনি দেখেছেন কলকাতাকে নূতন যুগ ও জীবনের রাজধানী এবং নব্য সংস্কৃতির পুণ্যপীঠ রূপে, কখনো

বা কালা নেটিভের পরাজয় ও আত্মাবমাননার অন্ধ কারাগার রূপে। কখনো তিনি তাকে করেছেন ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে উপহাস, কখনো বা করেছেন তপ্ত মাথায় তীব্র গালাগালি। কিন্তু ভালোবাসতে ভোলেন নি কোন সময়েই!

কালীপ্রসন্ন ও বঙ্কিমে কলকাতার যে প্রাণ-রূপটি দেখা যায়, তাতে রয়েছে হিন্দু কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত নূতন বাঙালী-মনের রংটুকু ষোল-আনাই। এঁদের রচনা আসলে হৃদ্য স্যাটায়ার বা রস-রচনার স্তরেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, নির্মম আক্রমণের রূপ ধরেনি কোনখানে। বোধ হয় উন্নততর পর্যায়ের শিল্পের বিশেষত্বই তাই। তা আপন বক্তব্য অকপটেই ব্যক্ত করে, আক্রমণ যা করার ঠিক্‌ই করে, কিন্তু এমন ভাবে করে যে আক্রান্তও তাতে হাসতে ভুলে যান না। রঙ্গরসিক দীনবন্ধুরও এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান হয়েছে অনেক রচনায়। কিন্তু বর্তমান রচনায় উপন্যাস বা নাটকের প্রসঙ্গ তোলা হচ্ছে না। তাই বঙ্কিম থেকে আমাদের এসে হাজির হতে হবে একেবারে রবীন্দ্রনাথে।

বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে আছেন যে বৃহৎ লেখকগোষ্ঠী, তাঁদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিক এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু প্রমুখ নাট্যকারের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই রসের পথ্য বিলিয়েছেন কিছু-না-কিছু। পঞ্চানন্দ রূপে ইন্দ্রনাথই প্রথম কলকাতার রাজনৈতিক চেহারাটা সম্যক ফুটিয়ে তুলেছিলেন ব্যঙ্গ-দর্শনের বিদ্যুত ঝলকে। আশ্চর্যের কথা যে আজকের অনেক জটিল সমস্যার আদি-বীজ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর পঞ্চানন্দ পর্যায়ের লেখায়। মনে হয়, যেন পুরানো দিনের আর এক প্রমথ চৌধুরীর লেখা পড়ছি! ত্রৈলোক্যনাথে বস্তুর চেয়ে রসের ঐশ্বর্য বেশী, তবু কলকাতার কলা ও কলুষ দুটোকেই রূপ দিয়েছেন তিনি, যেমন দিয়েছেন যোগেন্দ্রচন্দ্রও তাঁর 'মডেল ভগিনী'তে।

রবীন্দ্রনাথ যদিও খাঁটি কলকাতার মানুষ এবং তাঁর মননশীলতা কলকাতার প্রাণ-রসেই পুষ্ট, তবু কবি-দৃষ্টি তাঁর আবদ্ধ ছিল না মোটেই কলকাতার নাগরিক আবেষ্টনীতে। বরং 'ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষ কীট' এই মহানগরীর কারাগার এড়িয়ে দিগন্তে ব্যাপ্ত অসীমতার মধ্যেই তিনি পেয়েছেন প্রকৃত রূপ, রস ও আনন্দের স্পর্শ। কিন্তু কলকাতার সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব, তার নাগরিক

সমৃদ্ধি, সর্বোপরি তার জীবদায়িনী সজীবতাকেও তিনি অস্বীকার করেন নি। ইঙ্গিতে আভাষে কলকাতা সম্পর্কে বাঁকা টিপ্পনী ও চোখা মন্তব্য অবশ্য ঢেরই করেছেন এবং তাঁর বহু কৌতুক নাট্যে, দু-চারটি ছোট গল্পে এবং বিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা'য় কলকাতার পটভূমিই মূর্তি ধরেছে মহিমময়ী ভারত-মাতার সংক্ষিপ্তসার রূপে, আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত 'পালছেঁড়া হালভাঙা হতশ্রী অভাগা'র আশ্রয়ভূমি রূপেও। একখানি চিঠিতে তিনি বলেছেন, কলকাতা হল প্রয়োজনের শহর। সেখানে রয়ে বসে বৈঠকী আয়েসে দিন যেত যেদিন, সেদিন হয়েছিল আমার জন্ম। আজকের কলকাতায় পা দিলে মনে হয়, নিজের স্বধর্ম ভুলেছি। হয়ত এ উক্তির মধ্যে কিছুটা অত্যুক্তি আছে, কিন্তু কলকাতার সম্বন্ধে আন্তরিক প্রেম যে ছিল না তাঁর, তার প্রমাণও এই কথাই!

ঠিক এরি বিপরীত দৃষ্টি ছিল প্রমথ চৌধুরীর। তিনি কলকাতার চালচিত্র বর্জন করে ভাবতেই পারতেন না কোন কিছু। কালীপ্রসন্ন ও বঙ্কিমের পর কলকাতার রূপদক্ষ রস-রচয়িতা রূপে 'বীরবলের হালখাতা' ও 'চার-ইয়ারী কথা'র লেখকই বোধহয় সর্বাগ্রগণ্য। কলকাতা নিয়ে রঙ্গ করেছেন কম না তিনিও। কিন্তু সে হল প্রিয়জনকে নিয়ে প্রীতি-মিশ্রিত কৌতুকের আলাপ। কলকাতা সম্বন্ধে তাঁর সেই প্রসিদ্ধ উক্তি উদ্ধৃত করেই বক্তব্য শেষ করছি: কলির সহর কলকাতা, আর কলা ও কলেই ত কালচার, তাই কলকাতাই হল কালচারের সহর!

একালের কয়েকটি সাময়িক পত্র

বছর ত্রিশ আগে যখন আমি প্রথম সাময়িক পত্রে রচনা প্রকাশ সুরু করি, তখন নূতন লেখকের পক্ষে সাহিত্যে আত্ম-প্রকাশ এখনকার চেয়ে সহজ ছিল। বাজারের বড় ও বিখ্যাত কাগজগুলি অবশ্য নবাগতকে ঢোকবার সুযোগ দিত না। কিন্তু ছোট-ছোট মাসিক ও সাপ্তাহিক ছিল অনেক এবং তার বেশীর ভাগই চালাতেন সাহিত্যিকরা। তাঁরা নূতন লেখকের মধ্যে শক্তির সন্ধান পেলে, সানন্দে তাঁকে লুফে নিতেন। আর ছোট ও অনিয়মিত সময়ে প্রকাশিত এই সব কাগজে লেখা ছাপা হলেও, লেখকের খ্যাতিমান হওয়া দুষ্কর ছিল না। কারণ সাময়িক পত্রিকার তখন ক্রেতা কম থাকলেও, পাঠক বেশী ছিলেন। তাঁরা পড়তেন, উপভোগও করতেন।

দেশ থেকে সাহিত্যের সেই মেজাজটা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। এখন পড়ুয়া বেড়েছে, বইয়ের বিক্রীও বেড়েছে, কিন্তু পত্রিকার আদর কমেছে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় চালিত পত্র-পত্রিকা অবশ্য বেশ চলছে, চলবেও। কিন্তু নিছক সাহিত্যনিষ্ঠা ও যৎসামান্য পুঁজি নিয়ে আজ কোন কাগজ টিঁকিয়ে রাখা কঠিন। প্রথমত লেখককে আজ কিছু পারিশ্রমিক না দিলে চলে না, যা সেদিন চলত। মুদ্রণ ও উৎপাদনের ব্যয়ও আজ অতিশয় বেড়েছে। এই খরচ কুলাতে হলে যে পরিমাণ বিজ্ঞাপন পাওয়া দরকার, তা ছোট কাগজরা পায় না। দ্বিতীয়ত সংবাদপত্রের সাহিত্য বিভাগ আজ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে সাময়িক পত্রের। তাই সাময়িক পত্রিকার জগৎ ক্রমে কৃশ হয়ে আসছে।

এমন কালে বিগত দিনের যে-সব 'ছোট' কাগজ বড় লেখক সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে, তার কাহিনীর একটু আলোচনা করে দেখা মন্দ কি? বলা বাহুল্য আমি ইতিহাস লিখছি না। একটু স্মৃতি-কথার অবতারণা করছি মাত্র। কাজেই সাল-তারিখ ও তথ্য-বিচার কিছু থাকবে না এ লেখায়। হাতের কাছে যে কথাগুলো আসছে, তাই লিপিবদ্ধ করে রাখছি এখানে। উপযুক্ত সময় ও সুযোগ মিললে ভবিষ্যতে এই প্রসঙ্গ নিয়ে একটু ইতিহাসই লিখতে চেষ্টা করব। কারণ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সে ইতিহাস অনেকটা জড়িত।

অনেকে বোধ হয় জানেন, শরৎচন্দ্রের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা 'বড়দিদি' ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং লেখার সঙ্গে লেখকের নাম না থাকায়, অনেকে তা রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে ভুল করেছিলেন। অনামী প্রথম লেখার ব্যাপার যাই হক, শরৎচন্দ্রের প্রথম নাম সম্বলিত লেখা প্রকাশিত হয় যমুনা পত্রিকায়। তখনকার দিনে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, সবুজপত্র এই তিনখানি খ্যাতনামা পত্রিকা থাকতে, যমুনার মতো স্বল্পখ্যাত ও ক্ষীণায়তন কাগজে শরৎচন্দ্রের লেখা প্রথম প্রকাশিত হল কেন, এ প্রশ্ন হয়ত মনে হবে অনেকের।

কারণ আর কিছুই নয়, প্রথম আমলে শরৎচন্দ্রের লেখায় অনেকে দুর্নীতির গন্ধ আবিষ্কার করতেন। তখনকার ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশে তাঁর লেখায় যে সমস্ত ব্যঙ্গ ও বক্রোক্তি নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তা-ই সম্ভবত প্রবাসীতে তাঁর প্রবেশের পথ বন্ধ করে। আর শুনেছি, ভারতবর্ষ পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়ে যখন ব্যস্ত ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, সেই সময় অনুমোদনের জন্যে তাঁর হাতে আসে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি এবং তা পড়ে তিনি নাকি বলেন, যে-বইয়ের নায়িকা একজন হোটেলের ঝি, আমার সম্পাদিত কাগজে তা ছাপা হবে? প্রমথ চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং শরৎচন্দ্রের অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁর মুখেই শুনেছি, উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে পত্রালাপ চলত। কিন্তু সবুজপত্র গোষ্ঠীর আর সকলে শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট পরিমাণ বিদগ্ধ লেখক মনে করতেন না!

কাজেই যমুনা ছাড়া উপায় কি ছিল তাঁর? কিন্তু জন-প্রীতি ও ব্যাপক পরিচিতি লাভে বাধা হয় নি তাঁর, ক্ষীণস্রোতা যমুনাতে নৌকা ভাসিয়েও। এই যমুনা পত্রিকা বাংলা দেশের আর একজন বিশিষ্ট কবিকেও পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছে। তিনি হলেন এঞ্জিনীয়ার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রথম মফস্বলের এঞ্জিনীয়ার যতীন্দ্রনাথের কবিতার খাতা আবিষ্কার করেন এবং তিনিই তা থেকে জোর করে যমুনার পৃষ্ঠায় একে একে অনেকগুলি কবিতা প্রকাশ করেন। সম্পূর্ণ নূতন ভাষা ও নূতন সুরে লেখা এই সব কবিতার রচয়িতাও নজর এড়িয়ে যাননি বাঙালী পাঠকের।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরবর্তী কালের সমস্ত কবিতাও প্রকাশিত হয়েছে আর একখানি ক্ষীণায়তন ও স্বল্পতর খ্যাতির অধিকারী পত্রিকায়, সে হল

কবি সাবিত্রীপ্রসন্নের উপাসনা পত্রিকা। যতীন সেনগুপ্তের একমাত্র গদ্যগ্রন্থ কাব্য পরিমিতিও প্রথম প্রকাশ করে উপাসনা-ই। আর একজন আজকের বিখ্যাত লেখক প্রথম খ্যাতিমান হন উপাসনাতে লিখেই। আমি বলছি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। তাঁর প্রথম উপন্যাস চৈতালী ঘূর্ণী এবং পরবর্তী কালের বহু প্রশংসিত রাইকমল (প্রথম প্রকাশকালে এর নাম ছিল মালা-চন্দন) উপাসনাতে-ই প্রকাশিত হয়।

১৯২৫-৩০ এর মধ্যে যে নূতন লেখকদলের আবির্ভাব হয়, তাঁদের প্রধান পত্রিকা ছিল কল্লোল এবং কল্লোলের পাশাপাশি ছিল কালি-কলম ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রগতি। শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, জীবনানন্দ দাশ সবাই ছিলেন এই তিন পত্রিকার লেখক। এঁদের খ্যাতি যতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রচনার গুণে, তার চেয়ে অনেক বেশী সহায়তা করেছে এদের খ্যাতি বৃদ্ধিতে শনিবারের চিঠি, যা দিনের পর দিন বেছে বেছে প্রতি লেখকের রচনা থেকে তথাকথিত অশ্লীল বা দুর্নীতিপূর্ণ অংশ খুঁজে বের করত এবং সরস টীকা-টিপ্পনী সহ তা প্রকাশ করত। অর্থাৎ ঐতিহাসিক দিক থেকে শনিবারের চিঠি আধুনিক সাহিত্য প্রচারে সহায়তা করেছে বিরোধিতার ছদ্মবেশে। বলা যেতে পারে, তার এই ভূমিকা ছিল অনেকটা নেতিমূলক। তবে শনিবারের চিঠি-ও বাংলা ভাষায় প্রধান একজন সমালোচককে উপস্থিত করেছে। সত্যসুন্দর দাসের ছদ্মনামে কবি মোহিতলাল মজুমদার শনিবারের চিঠি-তেই প্রথম ধারাবাহিক সাহিত্য সমালোচনা সুরু করেন।

এই সময়ের দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, যাদের কথা আজ অনেকের মনে নেই। প্রথমটি হল বিজলী, আর দ্বিতীয়টি হল আত্ম-শক্তি। বিজলী নজরুলের প্রচারণায় যেমন বিশেষ সহায়তা করেছে, তেমনি নলিনীকান্ত গুপ্ত, সুরেশ চক্রবর্তী প্রমুখের রচনাও ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেছে দেশের সামনে। শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কিছু রচনাও বিজলীর পৃষ্ঠায় প্রথম আত্ম-প্রকাশ করেছিল। আত্ম-শক্তি প্রধানত নবীন দলেরই কাগজ ছিল। অর্ধ-রাজনৈতিক, অর্ধ-সাহিত্যিক এই পত্রিকাটি একদা সাহিত্যাদর্শ নিয়ে তরুণ-প্রবীণের লড়াইয়ে তরুণ পক্ষের যুদ্ধ-শিবির হয়ে উঠেছিল। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে একদা শিবরাম চক্রবর্তী এই আত্ম-শক্তিতেই কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধ লিখে যশস্বী

হয়েছিলেন। পরে তাঁর খ্যাতি প্রসার লাভ করেছে শিশু সাহিত্যিক রূপে। কিন্তু আদিতে তিনি বয়স্কদের সাহিত্যিকই ছিলেন।

একটা কথা এই সূত্রে বলে রাখা দরকার যে তখনকার বড় ও বিখ্যাত পত্রিকা যেগুলি ছিল, নবীন লেখকরা তাতে অধিকাংশই ছিলেন অপাংক্তেয়। বসুমতী ত ছিল আগাগোড়াই রক্ষণশীল পক্ষের কাগজ। প্রবাসী এবং ভারতবর্ষে ছুঁতমার্গ তত প্রবল না থাকলেও, নবীনদের বিশেষ আমল দিতেন না তাঁরাও। কাজেই তরুণেরা নিজেদের কাগজ-পত্র নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু খ্যাতিমান হতে বাধা হয়নি তাতেও। যখন বিচিত্রা প্রকাশিত হল, তখন তা নবীন-প্রবীণের মিলন ক্ষেত্র হবে বলে ঘোষিত হল। কিন্তু কার্যত প্রবীণেরাই বিচিত্রার আসর জাঁকিয়ে বসলেন। নবীনদের মধ্যে অন্নদাশঙ্করের একটু সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ছিল বিচিত্রায় এবং অচিন্ত্যকুমারও যুক্ত ছিলেন তাঁর সঙ্গে। কিন্তু বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কোন নূতন বড় লেখককেই প্রতিষ্ঠিত করেনি বিচিত্রা। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল বিচিত্রায় এবং তা বেরত শেষের দিকে, কেমন যেন একটু অযত্নের সঙ্গে। বোধ হয় বিচিত্রা-গোষ্ঠী রচনাটির গুণপণা সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিলেন না। বিচিত্রার সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য উত্তরার নাম। প্রবাসী বাঙালীর মুখপত্র রূপে উত্তরার দান কম নয়। নবীন সাহিত্যিকদের জন্যেও তার আসর অবারিত ছিল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম লেখা বিচিত্রায় প্রকাশিত হলেও, তাঁর প্রথম বিখ্যাত রচনা কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় পূর্বাশায়। পূর্বাশাই তাঁর 'পদ্মা নদীর মাঝি' প্রকাশ করে তাঁকে বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত করে। কল্লোলোত্তর কালে পূর্বাশা আধুনিক সাহিত্যের ব্যাপ্তি ও প্রচারে নিতান্ত কম সহায়তা করেনি। পূর্বাশার পর একটি স্বল্পস্থায়ী মাসিক ও একটি সাপ্তাহিক কিছুদিনের জন্যে বেশ খানিকটা জনপ্রিয়তা আহরণ করেছিল। আমি বলছি মাসিক ভবিষ্যৎ ও সাপ্তাহিক অগ্রগতির কথা। ভবিষ্যতের কর্ণধার ছিলেন সুভো ঠাকুর। তিনি তখন শিল্পী নন, সাহিত্যিক। অগ্রগতিতে ছিলেন আশু চট্টোপাধ্যায়, বিরাম মুখোপাধ্যায়, দিনেশ দাস প্রভৃতি। দিনেশ দাস কবিখ্যাতি লাভ করেছেন অগ্রগতি থেকেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে বাংলা দেশে এল যে নূতন কাব্য আন্দোলন, তার

প্রভাবে বেরল একে একে তিনখানি কবিতা পত্রিকা: কবিতা, নিরুক্ত, একক। নিরুক্ত অল্প দিনের মধ্যেই নিরুক্ত হয়ে গেল। অন্য দুখানি এখনো আছে। কবিতা পত্রিকা বাংলা দেশে কয়েকজন নবীন কবিকে পরিচিত করিয়েছে, যার মধ্যে সত্যিকার শক্তিমান কবি হলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু সমগ্র ভাবে কবিতা পত্রিকা নূতন কবিতার ভাষা ও কাব্য-বস্তু নিয়ে যে আন্দোলন করেছে, তার দামই বেশী।

ত্রৈমাসিক-এর প্রসঙ্গে পরিচয় পত্রিকার কথাও ভুলে গেলে চলবে না। সবুজপত্রের পর পরিচয়ই একমাত্র কাগজ, যা জনপ্রিয় সাহিত্য পরিবেষণ না করে, সাহিত্যে বিদ্যা-বৈদগ্ধ্যের বনিয়াদ দৃঢ় করার কাজে মন দেয়। ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য, শিল্পতত্ত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিভাগের বহু নূতন দিক উদ্‌ঘাটিত করে দেয় পরিচয়। কিছু ভালো কবিতা ও কয়েকটি গল্পও পাওয়া যায় তার কাছে। ত্রৈমাসিক থেকে মাসিকে রূপান্তরিত হয়েও, পরিচয় তার বৈশিষ্ট্য বেশ কিছুদিন অব্যাহত রেখেছিল। তারপর তা হস্তান্তরিত হল এবং এখনকার পরিচয় আগেকার পরিচয় থেকে স্বতন্ত্র ধারায় চালিত হচ্ছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের যে একটা নূতন মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে, তার মূলে পরিচয়ের দাম কম নয়। যদিও পরিচয়ের অনেক প্রবন্ধকার যত বড় পণ্ডিত ছিলেন, তত বড় লিখিয়ে ছিলেন না এবং সেই জন্যেই সাহিত্যে সম্পদ বলে গণ্য হতে পারে, এমন স্থায়ী রচনা তাঁরা বেশী দিতে পারেন নি, তবু পরিচয় এক দিকে যেমন বাঙালী লেখকের দৃষ্টি বিশ্ব-বৈদগ্ধ্যের দিকে আকৃষ্ট করেছে, অন্যদিকে তেমনি তা রচনা থেকে কাব্যিকতা অপসারিত করে, তার মধ্যে নিরাভরণ পৌরুষের অবতারণা করেছে। এ দান নগণ্য নয়।

আমি এই প্রসঙ্গে গোড়া থেকেই সাহিত্যিকদের স্বকীয় উদ্যমে চালিত ছোট ও মাঝারি কাগজের কথা বলছি। প্রভূত ব্যয়ে ও প্রভূত হৈ-চৈ সহকারে বেরিয়েছে যে-সব কাগজ এবং যার প্রধান লক্ষ্য ছিল সাহিত্য প্রচার নয়, সাহিত্যাশ্রিত ব্যবসা করা, তার কথা বলিনি। আমার ধারণা, সে-সব কাগজে ভালো লেখা যথেষ্ট বেরলেও এবং শক্তিশালী লেখকরা তার কোন-না-কোনটার সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও, সে-সব কাগজ কোন নূতন মত, পথ বা সাহিত্যাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেনি। মানসী ও মর্মবাণী, বঙ্গবাণী, নারায়ণ, পঞ্চপুষ্প, বঙ্গশ্রী,

উদয়ন, অলকা, একে একে অনেক নাম করতে পারি। এর মধ্যে নারায়ণ সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত এই পত্রিকা একদা রবীন্দ্রনাথকে প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই নিষ্ঠুর ভাষায় আক্রমণ করত এবং কৌতুকের কথা, কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে চিত্তরঞ্জনের শ্রেষ্ঠতার কথাই এতে প্রচার করতেন জনৈক বিদগ্ধ সমালোচক।

এই পর্যন্ত এসেই আমি আপাতত পূর্ণচ্ছেদ টানতে চাই। কারণ এর পরের যে অধ্যায়, তা এখনো চলছে এবং যা হালের ও হাতের কাছের, তা পুরানো কথায় স্থান পাবার যোগ্য নয়। তবে একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি যে বাংলা দেশে সংবাদপত্র আজ সর্বগ্রাসী রূপে দেখা দিয়েছে। সপ্তাহ ভোর কোনদিন শিশু বিভাগ, কোনদিন মহিলা বিভাগ, কোনদিন শিল্প-সাহিত্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিভাগ, এই ভাবে সাময়িক পত্রিকার অন্যান্য দিকগুলি গ্রাস করে নিচ্ছে সংবাদপত্র। তার ফলে মাসিক-সাপ্তাহিক আজ আপন জোরে চলে না, তাকে চালাতে হয় গায়ের জোরে। ব্যাপক ভাবে পাঠক সমাজকে তা তাই স্পর্শ করে না।

এর ফল হয়েছে দুটি। বিজ্ঞান ও কারিগরী শিল্পের যুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্রমশ উৎপাদনমূলক শ্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ছে। আর সাহিত্য থেকে ক্রমেই রসের ঐশ্বর্য কমে গিয়ে তাতে বাড়ছে উপযোগিতার অংশ। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সাহিত্য Colourful Journalism বা রং-চঙে সাংবাদিকতা হয়ে দাঁড়াবে, যেমন গান হয়েছে গ্রামোফোনের আওতায় এবং অভিনয় হয়েছে সিনেমেটোগ্রাফীর পাল্লায় পড়ে। অবশ্য এতদূর পর্যন্ত তাকিয়ে দেখছেন না এখনো অনেকে। তাই এখনো ক্ষণজীবী মাসিক-সাপ্তাহিক বেরচ্ছে, উঠে যাচ্ছে। ভালো কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু বৃহৎ শিল্পের দিনে কুটীর-শিল্প কি টিঁকবে বেশীদিন? সে সন্দেহ জেগেছে বলেই, সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে কয়েকখানা উঠে-যাওয়া বা অধুনা মহিমাভ্রষ্ট কাগজের কথা লিখে রাখলাম।

সাহিত্য প্রসঙ্গ : অনুবাদ ও আনুষাঙ্গক

॥ ১ ॥

বাংলা ভাষায় আজ-কাল অনেক বিদেশী বইয়ের অনুবাদ বের হচ্ছে। জোলা, ব্যালজাক, মোপাসাঁ, রলাঁ, মারিয়াক, সার্ত্রের প্রভৃতি ফরাসী এবং তুর্গেনিভ, গোগোল, ডষ্টয়েভেস্কী, টলষ্টয়, গোর্কী প্রভৃতি রুশ সাহিত্যিকদের অনেক রচনাই বাংলা ভাষায় আত্ম-প্রকাশ করেছে। করেছে ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ ইলিয়ট, হার্ডি, মেরিডিথ, গ্যালসোয়ার্দি প্রভৃতি ইংরেজ এবং ভেসারম্যান, পল হেসে, টমাস মান, রেমর্ক প্রভৃতি জার্মাণ সাহিত্যিকের লেখা। এ ছাড়া নরওয়ের জোহান বোয়ের, হামসুন, সুইডেনের ষ্ট্রীণ্ডবার্গ, পোল্যাণ্ডের রেমণ্ট, সিনকিয়েভিচ, স্পেনের আইবেনেজ, ইতালীর দেলেদ্দা, পিরেন্দাল্লো প্রভৃতিরও সাক্ষাৎ মিলছে বাংলা ভাষার আসরে।

বলা বাহুল্য, এটা সুখের কথা। দেশ-বিদেশের সাহিত্য সম্পদ এসে বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হচ্ছে। এতে বাংলা ভাষার প্রকাশ-শক্তি ও শব্দ-সম্পদ যেমন বাড়ছে, বাঙালীর মনের আকাশও তেমনি তার সঙ্কীর্ণ গৃহাঙ্গন ছাড়িয়ে দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। নিজস্ব ভাবে তাই অনুবাদ গ্রন্থের মূল্য যাই হক, ভাবী সাহিত্যের গঠনেও পরিপুষ্টির দিক থেকে তার উপযোগিতা কম নয়। তাছাড়া আর একটা বৃহৎ উপযোগিতার দিকও রয়েছে। বাঙালী পাঠকের শতকরা পঁচাত্তর জনই ইংরেজী জানেন না, অথচ তাঁরা বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা রাখেন। এক সুবৃহৎ পাঠক-গোষ্ঠীর সঙ্গে মাতৃভাষার মাধ্যমে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ লেখকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই সব অনুবাদের সাহায্যে। কাজেই অনুবাদের এই বহু-ব্যাপ্ত হিড়িককে এক হিসাবে আমি শুভ বলে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

কিন্তু আর একটা দিকও আছে এবং সেটাও উপেক্ষা করার মতো নয়। যত মূল রচনা বের হয়, তার চেয়ে বেশী সংখ্যক অনুবাদ বেরনো কি দেশের নবীন লেখকদের কল্পনা ও উদ্ভাবনা-শক্তির দেউলে দশাই প্রমাণ করছে না? আপন আওয়াজ নিয়ে বাজারে দেখা দেওয়ার ভরসা নেই বলেই কি তাঁরা

অন্যের আওয়াজের প্রতিধ্বনি করে, তাঁদের নামের আড়ালে নিজেরা আত্ম-প্রকাশ করতে স্বরু করেন নি? এই সিদ্ধান্তে আমি এসেছি তুটো কারণে: প্রথমত দেখি, সবাই শুধু উপন্যাসই অনুবাদ করেন, কাব্য, নাটক, জীবনী, ইতিহাস, ভ্রমণ কাহিনী, দর্শন ও বিজ্ঞান-বিচার, এ-সব অনুবাদের কোন চেষ্টা কেউ করেন না। দ্বিতীয়ত কোন বৃহৎ বা বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসের আত্মন্ত অনুবাদও তাঁরা করেন না। মূল আখ্যায়িকাটা কোন মতে খাড়া করে, আশ-পাশ থেকে নির্মম হাতে তারা ডাল-পালা ছাঁটাই করতে থাকেন। তাতে উপন্যাসের শোভা ও স্বষমার অনেকটুকু খোয়া যায়, এ ত বলাই বাহুল্য। এমন কি, কোন-কোন ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিচার-বুদ্ধির অভাবে যা অনাবশ্যক বলে বর্জিত হয়, তার সঙ্গে বইয়ের অপরিহার্য সম্পদও অনেকটুকু চুঁইয়ে বেরিয়ে যায়!

আসলে সৃষ্টি-মূলক সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেশে আজ দারুণ বন্ধ্যা-দশা দেখা দিয়েছে, অথচ বইয়ের বাজারে চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে ক্রমেই। কাজেই রাশি রাশি অনুবাদের বই দিয়ে ফাঁক পূরণের চেষ্টা হচ্ছে এবং স্রষ্টা-লেখকরা কলম গুটিয়ে বসে আছেন বলেই, অধ্যবসায়ী লিখিয়েরা প্রকাশক মণ্ডলীর ফরমায়েসে যা-তা লিখে যাচ্ছেন, আর স্বশ্রী ছাপা ও শোভন মলাটে গা ঢাকা দিয়ে তা-ই এসে বাজার দখল করছে। এই যা-তা'র বৃহত্তম অংশ হল অনির্বাচিত বিদেশী বইয়ের যা-ইচ্ছে-তাই অনুবাদ ও তার পরের অংশ হল রম্য রচনা, যা লেখকদের চিন্তা-শক্তি, মননশীলতা ও লিখন-ক্ষমতার অধিকতর দেউলে দশার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যাঁদের গল্প লেখার মতো জীবন-বোধ ও কল্পনা-কুশলতা নেই, আবার প্রবন্ধ লেখার মতো অধ্যয়ন, অনুশীলন ও লিখন-শক্তি নেই, তারাই গল্প-প্রবন্ধের জগাখিচুড়ি এই সব অপাংক্তেয় পথ্য তু-হাতে পরিবেষণ করে যাচ্ছেন।

কিন্তু রম্য রচনার কথা আপাতত থাক। অনুবাদের সম্বন্ধেই আর তু-একটা কথা বলি। অনুবাদের কোন প্রয়োজন নেই, এমন কথা কোন পাগলেও বলবেন না। অনুবাদ ছাড়া বিশ্বসাহিত্যের অলি-গলির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার উপায় কি মানুষের? ইচ্ছা বা চেষ্টা করলেও মানুষ এক জীবনে ক-টা ভাষা শিখতে পারেন? কাজেই বেদ, উপনিষদ, অবেস্তা, তালমুদ, বাইবেল, কোরাণ-হাদিসই হক, আর বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি, হোমর, সোফোক্লিস, ভার্জিল, দান্তে, সেক্সপীয়ার, মলেয়ার, গ্যেটে, টলষ্টয়ই হন, সবই ত মানুষকে আয়ত্ত করতে হয়েছে এবং হচ্ছে অনুবাদের মাধ্যমে। অনুবাদের তুনিয়াতেই

আরিস্ততল, লাউৎজে, লিপ্পো, হাফেজ, সাদি, রুমীরা এক হয়েছেন কপিল, কণাদ, শঙ্কর, নিম্বার্ক, অভিনব গুপ্ত ও চণ্ডীদাস, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। অনুবাদই যে বিশ্ববিদ্যায়তনের একমাত্র সোনার চাবি, সে আমি কারো চেয়ে কম জানি না, কেননা ইংরেজী ছাড়া অন্য কোন বিদেশী ভাষা জানা নেই আমারও।

কিন্তু অনুবাদের জন্যে সমুচিত প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা চাই। বিষয় অনুযায়ী বিভাগ করে কোন-কোন ভাষার কি-কি বই অনুবাদ যোগ্য, কারা কোন বইটা অনুবাদ করবেন, তা ঠিক করার জন্যে একটি স্বচ্ছল ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে, তারই অন্তর্ভুক্ত একটি দায়িত্বশীল সমিতির হাতে ধারাবাহিক ভাবে অনূদিত গ্রন্থগুলি প্রকাশের ভার ন্যস্ত করতে হবে। অর্থাৎ কাজটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, সাহিত্য পরিষদ, এমনি কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের করণীয়। অন্যান্য দেশে তাই করা হয়ে থাকে। কোন-কোন দেশে সরকারী প্রচার দপ্তরও এ-কাজ করেন। এত বড় কাজ একক প্রচেষ্টায় কিছুতেই হতে পারে না, এজন্যে চাই এক দল বেতনভুক অনুবাদক গোষ্ঠী এবং তাঁরা মৌলিক সাহিত্য-প্রতিভা সম্পন্ন লেখক না হলে ত চলেই, এমন কি, না হলেই ভালো হয়। কারণ অনুবাদককে হতে হবে লিখন-শক্তি সম্পন্ন, অথচ পরিশ্রমী, বস্তুনিষ্ঠ এবং যথাসম্ভব যশোলাভশূন্য, যা স্রষ্টা-সাহিত্যকরা কদাচিৎ হতে পারেন।

কিন্তু এই ভাবে সাহিত্যানুবাদের প্রয়াস আমাদের দেশে আজও হয়নি। তাই বিশ্বসাহিত্যের বিশিষ্ট গ্রন্থ যেগুলি, তার সামান্যই আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় আত্ম-প্রকাশ করেছে। গত শতাব্দীর লেখকরা সেক্সপীয়ারের কোন-কোন বই অনুবাদ করেছিলেন। আরো ঢের বই অননূদিত রয়েছে তাঁর। মিণ্টনের মহাকাব্য, মলেয়ারের বা গ্যেটের নাটকের কোন বাংলা অনুবাদ আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। শেলী, কীটস, ব্রাউনিং, টেনিস, সুইনবার্ণ, রসেটি এবং ভার্লেন, ভ্যালেরী, দ্য-মুসে, ভেয়ারহার্ণ, বদলেয়ার প্রভৃতির অল্প-স্বল্প কাব্য-নিদর্শন বাংলায় পরিবেষণ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর পর কিছু পরিমাণে করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রও। কিন্তু হায়েনে থেকে রিল্কে পর্যন্ত জার্মাণীর এবং পুস্কিন থেকে মায়াকোভস্কী পর্যন্ত রাশিয়ার রাশি-রাশি কবিকেই এখনো পরিচিত করাতে বাকী আছে। আছে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মাণ, রুশ প্রভৃতি জাতির বিরাট ও বিচিত্র গদ্য সাহিত্যের প্রায়

সবটাই। তারপর আছে এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাহিত্য। আছে এ-দেশের ও অপরাপর দেশের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, পুরাণ ও কাব্য-নাটকাদি। অর্থাৎ অনুবাদের বিষয়ও যেমন অফুরন্ত, প্রয়োজনও তেমনি অসীম। ইংরেজ, ফরাসী ও রুশরা এটা বোঝেন বলেই, আপন আপন ভাষার ভাণ্ডার ভরে ফেলেছেন তাঁরা সর্বতোমুখী অনুবাদের ঐশ্বর্যে। আমরা তা জানি না বলেই, শুধু সাম্প্রতিক কালের খানকতক বিদেশী নভেল নিয়ে টানাটানি করছি, আর ভাবছি খুব কাজ করছি।

এই সূত্রে একটা কথা উঠবে হয়ত: কাব্যের অনুবাদ এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় হতে পারে কিনা? কথাটা পুরানো। বহুদেশে বহুজন এ-কথা বার বার তুলেছেন। সম্প্রতি তুলেছেন সেক্সপীয়ার স্মৃতিসভায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সালারও। বলা দরকার, কাব্যের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ হতে পারে না, কেন না কাব্যের বক্তব্যই ত সব নয়, তার ছন্দ ও বাক-ভঙ্গীমাটাও সমান মূল্যবান। বরং তারই মূল্য বেশী। সেই শব্দ-শিল্পের প্রাণ-রস ভাষান্তরে অল্পই বজায় থাকে, যার সর্বোত্তম নিদর্শন হল রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত গীতাঞ্জলির অনুবাদ। কিন্তু এই অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও সব দেশেই বরাবর কাব্যের অনুবাদ হয়েছে এবং হয়েছে অনিবার্য কারণেই—মানুষের ভাষাজ্ঞান সীমাবদ্ধ, কিন্তু সে জানতে চায় সব দেশের সব সাহিত্যের বার্তা। সে-পথে অনুবাদ ছাড়া কি তার সম্বল? তবে সুখের কথা যে দুনিয়ার সেরা কবিরাও অনেক সময় কাব্যানুবাদ করেছেন। তাই সব সাহিত্যের সব অনুবাদই নিষ্প্রাণ ভাষান্তর মাত্র হয়নি, কোন-কোনটা জন্মান্তরও লাভ করেছে, যেমন ইংরাজীতে ড্রাইডেন ও পোপের ভার্জিল এবং হোমর, ফিটজেরাল্ডের ওমর খৈয়াম, সাইমন্সের ফরাসী কবিতানুবাদ, গিলবার্ট মারের অনূদিত গ্রীক্ ট্র্যাজেডীগুলি।

এই রকম স্বচ্ছন্দ অনুবাদ বাংলা ভাষায় করেছেন বিদেশী কবিতার কেউ কেউ। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান অবশ্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, তাঁর পর উল্লেখযোগ্য নবীনচন্দ্র দাস, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাবেকী লেখকরা এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, মোহিতলাল মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্র দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ আধুনিক লেখকরা। আসলে কবিতা অনুবাদে মূল কবিতার ভাষা ও ভঙ্গীর আক্ষরিক অনুসরণ সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। মূল কবিতার সুরের অনুরূপ সুর বসাতে হয়, অনুরূপ

শব্দ-সম্ভার ও মেজাজ দিয়ে তার রূপান্তর ঘটাতে হয়। এই জন্যেই কবিতার অনুবাদ কবি ছাড়া করতে পারেন কম লোকই।

অবশ্য নাটক এবং কথা-সাহিত্য সম্বন্ধেও চিন্তার দিক আছে। প্রত্যেক দেশে বিশেষ বিশেষ সমাজভুক্ত মানুষের কথা-বার্তা ও চিন্তা-চর্চার এমন নিজস্ব কতকগুলি ধরণ থাকে, যা ভাষান্তর করা দুষ্কর। এই জন্যেই স্পেনের বা নরওয়ের নাটক, ফিনল্যাণ্ড বা ল্যাটভিয়ার নভেল বাংলা ভাষায় পূরাপূরি সার্থক ভাবে অনুবাদ করা যায় কিনা সন্দেহ। এ ক্ষেত্রেও ঐ অনূদিত ভাষায় মূল ভাষার প্রাণ-ধর্মটি অনুরূপ শব্দ-সম্ভার ও প্রকাশ-ভঙ্গীর দ্বারা জীবন্ত করে তুলতে হয়। এ কাজও সহজ নয়। তবু গদ্যের ক্ষেত্রে লেখকের আছে কতকটা পর্যন্ত স্বাধীনতা, যা কবিতার ক্ষেত্রে দুর্লভ। তবে সুখের কথা যে বাংলা ভাষায় এবং পৃথিবীর সব ভাষাতেই কবিতার অনুবাদ হয়েছে, মধ্যযুগেও হয়েছে, আজও হচ্ছে এবং হবে ভবিষ্যতেও। এই পথে আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টা কি ভাবে সংহত করা যেতে পারে ভেবে দেখা দরকার।

॥ ২ ॥

শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনের শেষ দিকে স্বরচিত বইগুলির, অন্তত উল্লেখযোগ্য পাঁচ-সাত খানির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশে আগ্রহশীল হয়েছিলেন এবং দিলীপ-কুমার রায় ও ডাঃ কানাই গঙ্গোপাধ্যায় এ বিষয়ে তাঁকে যথাশক্তি সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যত নিষ্কৃতি ছাড়া আর কোন বইয়েরই অনুবাদ লিখিত বা প্রকাশিত হয়নি। অথচ একটি বিদেশী প্রকাশক সঙ্ঘ নিজে থেকে এগিয়ে এসেছিলেন এবং শরৎ-সাহিত্যের অনুবাদ পেলে, তাঁরা সানন্দে তা ছাপাতেন ও বাইরে প্রচার করতেন। এত বড় একটা সুযোগ খোয়া গেছে, শুধু শরৎচন্দ্রের অনুরাগীদের মধ্যে কেউ বিষয়টির ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেন নি বলে। শরৎচন্দ্র একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, যত লোক সুখ্যাতি করেন তার একভাগও যদি ভালোবাসতেন আমাকে, তাহলে কাজটা হয়ত সার্থক হত।

হত কি না জানি না, কারণ এক দেশের গল্প-উপন্যাস আর এক দেশের ভাষায় অনুবাদ করা কাজ খুব সোজা নয়। প্রথমত থাকে সব ভাষার কথোপকথনের নিজস্ব ধরণ, যা শুধু ভাষান্তরিত করলে হয় না, ভাবান্তরিত

করতে হয়। দ্বিতীয়ত থাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি, যা জাতির মননশীলতা ও চিত্ত-বৃত্তিতে পরিব্যাপ্ত থাকে জন্মগত অধিকার হিসাবে। তাকে পরের ভাষায় প্রাণবন্ত করে তোলা সহজ নয়। এই কারণেই গল্প-উপন্যাসের অনুবাদ শুধু আক্ষরিক পুনর্লিখন হলে চলে না, তাকে পুরানো বনিয়াদের ওপর নূতন রচনা হিসাবে দাঁড় করাতে হয়। আর সেজন্যে চাই দুই জাতি ও সংস্কৃতির মর্ম-পরিচয় সম্যক ও সমগ্র করে জানা এবং দুই ভাষাকেই মাতৃভাষার মতো অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে আয়ত্ত করা। সে শক্তি ক-জনের আছে?

ফরাসী, জার্মাণ, ইটালীয়ান, স্প্যানিশ, নরওয়েজীয়, রুশ প্রভৃতি ভাষা থেকে নাটক, উপন্যাস ও গল্প ইংরেজীতে অজস্র অনূদিত হয়েছে এবং সে অনুবাদ স্বচ্ছতা ও হৃদ্যতায় ঠিক মূলের মতো লাগে, এই কথার উল্লেখ করে হয়ত অনেকে বলবেন, ওঁরা পারেন কেমন করে? এ কথার উত্তরে আমি আগেই বলেছি যে ব্যাপারটার সঙ্গে শক্তির, মানে লিখন-শক্তির প্রশ্ন জড়িত। তাছাড়া ইউরোপীয় জাতি-গোষ্ঠীগুলির নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্য মোটামুটি এক—তাঁরা বিভিন্ন ভাষাভাষী ও রাজনৈতিক সংস্থিতির অধীন হলেও, এক গ্রীকো-রোমক বনাম খৃষ্ট সভ্যতার প্রভাবে প্রায় একই ধাঁচে গড়া। কাজেই তাঁদের পরস্পরের গার্হস্থ্য ঐতিহ্য পরস্পরের চেনা এবং একে অন্যকে তাঁরা সহজেই আত্মসাৎ করে নিতে পারেন। তা সত্ত্বেও রুশ এবং ফরাসী উপন্যাসের ইংরেজী তর্জমাকারীরা যে প্রচুর হয়রান হয়েছেন ও হন, ঠিক ঠিক মূলের রস বজায় রাখতে গিয়ে তা তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন।

যাই হক, থিওডোসিয়া টমসন ও ক্ষিতীশ সেন অনূদিত প্রথম ভাগ শ্রীকান্ত (যা আগেই বেরিয়েছিল) এবং নিষ্কৃতি ছাড়া শরৎচন্দ্রের কোন বই আর অনুবাদ হয়নি। শরৎচন্দ্রের পর আর একজন কথা-সাহিত্যিকও তাঁর উল্লেখ-যোগ্য রচনাবলীর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশে উৎসুক হয়েছিলেন। তিনি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। আমি যখন শান্তিনিকেতনে, সেই সময়ে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা চেয়ে তিনি কবিকে এক চিঠি দেন। তিনি লিখেছিলেন, নিজের কয়েকখানা বই তিনি অনুবাদ করেছেন, সেই অনুবাদ কবি বিদেশী প্রকাশকদের দ্বারা ছাপানোর ব্যবস্থা করে দিতে পারেন কি না?

কবির পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব হয় নি। ফলে নরেশচন্দ্রের রচনাও অনুবাদ আকারে বাইরে পৌঁছতে পারেনি। অথচ এই দু-জন কথা-সাহিত্যিক বাইরের দুনিয়ায় প্রচার লাভ করলে, বাংলা দেশ ও বাংলা সাহিত্য তাতে সম্মানিত হত এবং বিদেশীরা হয়ত বাংলা ভাষা শিখতে এবং বাংলা ভাষার অন্যান্য বই অনুবাদ করতে আগ্রহান্বিত হতেন। বাংলা বইয়ের ব্যবসাও তার বন্ধ্যা দশা থেকে মুক্তি পেয়ে দুনিয়ার অপরাপর ভাষার মতো সাহিত্য-সেবীদের সমৃদ্ধি ঘটাতে পারত।

মাঝে মাঝে ইংরেজ, মার্কিন, ফরাসী ও রুশ সাহিত্য-সেবীরা কলকাতায় আসেন। তাঁরা এসে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই এখানকার সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং এ-দেশের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সোজা উপায় কিছু আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন। সকলকেই রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত বাংলা ভাষার ইংরেজী ব্যাকরণটি দেখিয়ে দিতে হয় এবং রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য রচনার যা ইংরেজী অনুবাদ আছে, সেগুলির সন্ধান বলে দিতে হয়। এ ছাড়া স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের Literature of Bengal নামক পুরানো বই, যা আজ আর পাওয়া যায় না, তার নাম উল্লেখ করেই দায় সারতে হয়। ফলে তাঁদের ধারণা হয় যে রবীন্দ্রনাথের আগে এ-দেশে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কিছু হয় নি এবং রবীন্দ্রনাথের পরে যা হয়েছে ও হচ্ছে, তা-ও এখনো বিশিষ্ট স্বীকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয় নি। দুঃখের বিষয়, এ দুরবস্থার প্রতিকারে যা করা উচিত এবং করা যেত, তা আমরা করিনি। করার কথা মনেই হয় নি।

অথচ অনেকেই জানেন আশা করি যে বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত সঙ্গীতগুলির চমৎকার কাব্যানুবাদ হয়েছিল ইংরেজীতে। রমেশ দত্ত, অরবিন্দ, অতুল ঘোষ, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, শেখর প্রমুখের বেশীর ভাগ ভালো পদের অনুবাদ করে গেছেন। তাছাড়া চাপম্যান ও টমসন দু-খণ্ডে বৈষ্ণব ও শাক্ত সঙ্গীতের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। স্বর্গীয় অধ্যক্ষ কাউয়েল কবিকঙ্কণ চণ্ডী এবং ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরের পদ্যানুবাদ করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন করেছিলেন পূর্ববঙ্গ গীতিকার। ঠিক স্মরণ নেই, কিন্তু চর্যাপদেরও অনুবাদ দেখেছি ইংরেজীতে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পরিচায়ক হিসাবে এই অনুবাদগুলি সংগ্রহ ও পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করতে পারেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পারেন বিশ্বভারতী।

মাইকেলের সমগ্র মেঘনাদ বধের ইংরেজী অমিত্রাক্ষরে অনুবাদ করেছিলেন লালমোহন ঘোষ। স্বয়ং মাইকেল অনুবাদ করেছিলেন দীনবন্ধুর নীলদর্পণের। এছাড়া অনুবাদ হয়েছিল স্বর্ণলতার, সীতার বনবাসের, বিল্বমঙ্গলের এবং বঙ্কিমচন্দ্র রচিত কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ ও আনন্দমঠেরও অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও দেবী চৌধুরাণীর অনুবাদ করেছিলেন এবং রমেশ দত্তকে বিলাতী প্রকাশক সংগ্রহ করে দিতে অনুরোধ করেছিলেন, এ কথা লিখেছেন শচীশ চট্টোপাধ্যায়। জানিনা সে-অনুবাদের কি হয়েছে। মোটের ওপর এই পুস্তকগুলিও সংগৃহীত এবং প্রকাশিত হতে পারে, আর এই সঙ্গে এ-কালের লেখক-লেখিকাদের বিশিষ্ট রচনাবলীও অনুবাদ করা এবং ছাপানো যেতে পারে। দেশের কোন-কোন প্রকাশক যদি বাংলা সাহিত্য বহির্বিশ্বে প্রকাশের জন্যে পূর্বোল্লিখিত বইগুলি সংশোধন ও পরিমার্জিত করে ছাপান এবং ইউরোপীয় পুস্তক বিক্রেতাদের সঙ্গে চুক্তিতে ব্যবসা করেন, তাহলে লোকসান ত হবেই না, জাতির মর্যাদাও তাতে বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এ জন্যে সাহস চাই, দূরদৃষ্টি চাই, আর চাই সাহিত্যানুরাগ ও স্বদেশপ্রেম।

অন্যান্য দেশে এ কাজ করেন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকার থেকেও বিদেশী মুল্লুকে জাতীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে জাতির সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি ধারাবাহিকভাবে প্রচার করা হয়ে থাকে। জাতির প্রকৃত পরিচয় তার সামাজিক শক্তিতে নয়, রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক কৃতিত্বেও না। সাহিত্যে, শিল্পে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানেই যথার্থ ক্ষমতা। ইউরোপীয়রা তাই প্রাচ্যে প্রচার করেছেন দান্তেকে, সেক্সপীয়ারকে, ভলেতেয়ার, গ্যেটে, কাণ্টকে, হেগেল, নিউটন, লাপলাস, আইনষ্টাইনকে। করেছেন লিওনার্দো, টিসিয়ান, রেমব্রাণ্ডকে, বেঠোফেন, মোজার্টকে। ইংরেজ ফরাসীর সাহিত্য, জার্মাণীর বিজ্ঞান ও দর্শন, ইতালীয়ান, ওলন্দাজ, স্প্যানিশের চিত্রকলা, রাশিয়ার নৃত্য-গীত আমাদের চিত্তে গভীর শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছে এবং করেছে ইউরোপীয় সাহিত্যের বৈদেশিক প্রচারের ফলেই। সে-প্রচার সম্ভব হয়েছে একমাত্র অনুবাদ বিষয়ে ওঁরা বরাবর তৎপর বলে।

এই তৎপরতা ওঁদের শুধু ইউরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধেই নয়, সর্ব-জগতের সংস্কৃতি সম্বন্ধেই। বেদ, উপনিষদ, আবেস্তা, বাইবেল, কোরাণ,

তালমুদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ বলুন, গ্রীক কাব্য-নাটক, আরবী-ফার্সী, সংস্কৃত, হিব্রু ও চীনা ক্লাসিক্যাল সাহিত্য বলুন, আর হিন্দী তুলসী রামায়ণ, শিখ গ্রন্থসাহেব বা তামিল কুরল গ্রন্থ বলুন, কি নেই ইংরেজীতে ? চরক, সুশ্রুত, পানিনি, ভরত, বাৎসায়ন, কৌটিল্য ও মনুর সঙ্গে অসংস্কৃতজ্ঞ আমাদের পরিচয়ই হত না, ইংরেজী অনুবাদ না থাকলে। ইংরেজী ভাষার সম্পদ প্রাচুর্য, তার বিশ্বগ্রাসী গ্রহণ-শক্তি শুধু শুধু গড়ে ওঠেনি। সারা দুনিয়ার ভাষা-সমুদ্র মন্থন করে তাঁরা মাতৃ-ভাষার উন্নতি সাধন করেছেন। ইংরেজ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুনিয়ায় যে বৃহৎ সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছে, তার ভাষা-সাম্রাজ্যের মূল্য বা মর্যাদা তার চেয়ে কম নয়। এত বড় সমৃদ্ধি জার্মাণ ও ফরাসী ভাষারও নেই, গগনস্পর্শী জ্ঞান-সম্পদের অধিকারী রাশিয়ান ভাষারও নেই। ইংরেজের সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়বে আর কয়েক বছরের মধ্যেই, কিন্তু তখনও ইংলণ্ড গ্রেটবৃটেন থাকবে তার ভাষার জোরে।

এখান থেকে আমাদের কি কিছু শেখার আছে ? মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য রচিত হয়েছে যে-ভাষায়, সে-ভাষার ওপর পূর্ববঙ্গে উর্দুর এবং পশ্চিমবঙ্গে হিন্দীর দৌরাত্ম্য সুরু হয়েছে। এই ভাষা ও সাহিত্যের সেবক আমরা বসে বসে তাই দেখছি, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হবে ? একটা কথা আমার বরাবর মনে হয়, তা হল এই যে আমরা অনেকেই যা পারি না, তাই করি এবং যা পারতাম ও পারি, সে দিকে মন দিই না! দেশসুদ্ধ সবাই কোমর বেঁধে গল্প-উপন্যাস ও কবিতা না লিখে. আমরা অনেকে যদি অন্য ভাষা থেকে বাংলায় এবং বাংলা ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদের কাজ করি, আর এই কাজ বৈজ্ঞানিক ধারায় সুষ্ঠু ভাবে করানোর জন্যে দেশে যদি একটি বা দুটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, তাহলে ভাষা ও সাহিত্যের সত্যিই উন্নতি হয়।

তাকিয়ে দেখি হিন্দীর দিকে। নাগরী প্রচারিণী সভা, রাষ্ট্রভাষা প্রসার সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁরা এক দিকে ভারতব্যাপী প্রচার চালাচ্ছেন হিন্দীর পক্ষে, অন্য দিকে গুজরাটী, মারাঠী, বাংলা. ওড়িয়া, তামিল ও তেলেগু থেকে বিখ্যাত বই-পুঁথির রাশি রাশি অনুবাদ করছেন। গিরিশ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের সমস্ত নাটক, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের ত বটেই, তারাশঙ্কর ও বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবগুলি উল্লেখযোগ্য

গল্প-উপন্যাস, এমন কি মাইকেল, নবীন সেন, বিহারীলাল প্রভৃতির প্রধান প্রধান কাব্যও হিন্দীতে অনুবাদ হয়েছে। নামা-অনামা এমন লেখক কমই আছেন, যার কোন-না-কোন বইয়ের হিন্দী অনুবাদ নেই। পক্ষান্তরে প্রেমচাঁদ ছাড়া আর কোন হিন্দী লেখকই আমরা আজ পর্যন্ত বাংলার আসরে নামাতে পারিনি। আসলে আমরা আত্মোন্নতি চাই, কিন্তু আত্ম-রক্ষা ও আত্ম-প্রকাশের আর্ট জানি না।

॥ ৩ ॥

বাংলা দেশের যাঁরা শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, তাঁদের অনেকেরই বিদ্যা-বৈদগ্ধ্যের স্পর্শে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হতে পারেনি। ইংরেজ আমলে ইংরেজীতে লিখলে, লেখকের রাজ-দরবারে সম্মান হত। তাছাড়া বাইরের দুনিয়ায় ইংরেজীর মারফৎ রচনা পৌঁছে দিয়ে সহজে যশ অর্থ আহরণ করা যেত। তাই সেদিন কেউ কোন পাণ্ডিত্যের কাজ করতে হলে ইংরেজীতে কলম ধরতেন।

জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরালাল হালদার, যদুনাথ সরকার, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ সরকার, মানবেন্দ্রনাথ রায়, কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের শ্রেষ্ঠ বা স্মরণীয় কাজ যা, তার সবটুকুই রয়েছে ইংরেজীর কারাগারে আবদ্ধ। দেশের লোক তাঁদের নাম জানেন, তাঁদের মহা-পণ্ডিত ব্যক্তি বলেও স্বীকার করেন, কিন্তু কোন বিষয়ে পণ্ডিত তাঁরা, কি-কি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, তার খবর ইংরেজী না-জানা পাঠকরা রাখেন না মোটেই।

স্বামী বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের রচনাগুলি ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেছেন তাঁদের অনুগামীরা। তাই প্রথমের কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, বেদান্ত দর্শন এবং দ্বিতীয়ের দিব্য জীবন, গীতাচর্চা ও ভারতের নবজন্ম সাধারণ বাঙালী পাঠকের পড়ার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের Positive Sciences of the Hindus, জগদীশচন্দ্র বসুর Response of the Living and the Non-living, প্রফুল্লচন্দ্রের History of Hindu Chemistry, বিপিনচন্দ্রের Who Is Sri Krishna, হীরালাল হালদারের Hegel and the neo-Hegelians প্রভৃতি বই বেশীর ভাগ বাঙালীর কাছেই অপঠিত ও

অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে। যেমন থেকে গেছে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের Subject As Freedom নামক অতুলনীয় দার্শনিক গ্রন্থটি, বা যদুনাথ সরকারের বিদ্যাভূয়িষ্ঠ ঐতিহাসিক রচনাবলী, আওরংজেব, পরবর্তী মুঘল প্রভৃতি, বা মানবেন্দ্র রায়ের Reason, Romanticism and Revolution এবং মহেন্দ্রনাথ সরকারের Eastern Light, অথবা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ভারতীয় দর্শন এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিরাট গ্রন্থগুলি।

ভারতের নদ-নদী ও তাদের বিচিত্র গতি-পরিবর্তন সম্বন্ধে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় যে মূল্যবান বই লিখেছেন, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র-শাসন সম্বন্ধে এবং নৌবিদ্যা সম্বন্ধে, সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় যে মৌলিক গবেষণা করেছেন বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন নিয়ে, সুশীল দে হিন্দু অলঙ্কার শাস্ত্র এবং বৈষ্ণব রসতত্ত্ব নিয়ে, তার বার্তা জেনেছেন ক-জন বাঙালী? ক-জন পেয়েছেন মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন বসুর সত্যকার বৈদগ্ধ্যের খবর, যার জন্যে তাঁরা বাইরে খ্যাত? অথচ এঁরা আমাদেরই মধ্যে রয়েছেন, অন্যের কাছে গর্ব করতে হলে আমরা এঁদের নিয়ে গর্বও করি। লজ্জা ও দুঃখের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু এ জন্যে দায়ী কে? যে-দেশে শতকরা নব্বুই জন ইংরেজী জানেন না, সে-দেশের মানুষরা ইংরেজীর পাথর ভেঙে স্বাদেশিক পাণ্ডিত্যের গোপন উৎস খুঁজে বের করেন নি কেন, এ প্রশ্ন ওঠে কি? আসলে আমাদের পণ্ডিতসমাজই বরাবর দেশবাসীর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে করেছেন পাণ্ডিত্যের চর্চা।

বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে চিরদিন একটা অভিযোগ ওঠে এবং সেটা অহেতুক নয় যে আমরা একাগ্র নিষ্ঠায় খালি কবিতা ও গল্প লিখেছি এবং লিখি। অবিস্মরণীয় উপন্যাস বা নাটক বিশেষ কিছু সৃষ্টি হয় নি আমাদের ভাষায়। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে মৌলিক বলে বিবেচিত হতে পারে এবং বিশ্ববাসী তার সংস্রবে না এলে তাঁদের জ্ঞানের দুনিয়া অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, এমন গদ্য ত কিছু লেখা হয়ইনি বলতে গেলে। কিন্তু কেন? এ-দেশে কি প্রথম শ্রেণীর বিদ্বান ও চিন্তাশীল মানুষ কম জন্মেছেন? তা যে নয়, তার প্রমাণই ত পূর্বোল্লিখিত বইগুলি। এ জন্যে দায়ী আমাদের বিজাতীয় শিক্ষা, যা শিক্ষিতে ও অশিক্ষিতে, ধনী ও দরিদ্রে দুরপনেয় ভেদের

গণ্ডী সৃষ্টি করেছে এবং যার ফলে দেশের জ্ঞান বৃদ্ধি অপেক্ষা বিদেশের করতালি লাভকে আমরা বড় করে দেখেছি।

ওপরে যাঁদের কথা বলেছি এবং যে-যে বইয়ের নাম উল্লেখ করেছি, যদি তাঁরা সেই বইগুলি বাংলায় লিখতেন, অথবা ইংরেজীতে লিখলেও বাংলায় অনুবাদ করতেন, তাহলে বাংলা ভাষা যে বস্তু-সম্পদে যথেষ্ট ঋদ্ধ হত, এ কে না স্বীকার করবেন? এঁদের মধ্যে কেউ কেউ যে চমৎকার বাংলা লিখতে পারতেন এবং পারেন, তার প্রমাণ আছে অরবিন্দের 'কারা কাহিনী' ও 'গীতার ভূমিকা'য়, বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে', বিপিন পালের 'জেলের খাতা'য়, 'সত্য ও মিথ্যা'য় জগদীশ বসুর 'অব্যক্তে' প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও প্রবন্ধে, সুরেন দাশগুপ্তের 'দার্শনিকী'তে, মহেন্দ্র সরকারের 'উপনিষদের আলো'য় এবং সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নানা সময়ের লেখা ছোটখাটো প্রবন্ধে। প্রকৃত পক্ষে বাংলা লেখাটাই অনাবশ্যক ও অনভিজাত মনে হয়েছে এঁদের, তাই সখ করে কেউ হয়ত বাংলায় একখানা উপন্যাস লিখেছেন, নয়ত গোটা কতক কবিতা রচনা করেছেন, কিংবা উদ্যমী পত্রিকা-সম্পাদকের তাগাদায় বাধ্য হয়ে দু-চারটি প্রবন্ধ লিখেছেন, যা নগণ্য ছাড়া কিছু নয়। মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের পরে এ জিনিষ সম্ভব হয়েছে, এ ভাবতেও লজ্জা করে। সংস্কৃতিমানের এ রকম উদভ্রান্তি কোন দেশেই দেখা যাবে না।

অবশ্য সুখের কথা যে কিছু সংখ্যক বিদ্বান, পণ্ডিত ও মনস্বী ব্যক্তি বাংলা ভাষাকে তাঁদের বিদ্যা-বৈদগ্ধ্য সংরক্ষণের অনুপযুক্ত ভাবেন নি। সারা জীবনটাই নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁরা মাতৃ-ভাষার চর্চা করেছেন এবং প্রভূত প্রজ্ঞা ও পরিশ্রমের সম্পদ মাতৃ-ভাষার ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে গেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রজনীকান্ত গুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দুর্গাদাস লাহিড়ী, নগেন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, দীনেশচন্দ্র সেন, বিনয়কুমার সরকার, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি।

বাংলার বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা ও বাঙালীর জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এবং দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও বস্তু-বিজ্ঞান সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাবলী যে বাংলা ভাষার অতি মূল্যমান সামগ্রী, এ বলাই বাহুল্য। হীরেন্দ্র

দত্তের বেদান্ত, উপনিষদ ও গীতা বিষয়ক আলোচনাগুলি, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাণ্টীয়দর্শন ব্যাখ্যা, দুর্গাদাস লাহিড়ীর বহু-খণ্ডে বিভক্ত পৃথিবীর ইতিহাস, নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বিশ্বকোষ' রজনীকান্তের 'সিপাহী যুদ্ধ', রাখালদাস ও অক্ষয়-কুমারের ঐতিহাসিক রচনাবলী, বিজয় মজুমদারের সভ্যতার ইতিবৃত্ত ও সমাজ-বিজ্ঞান ব্যাখ্যা, বিনয় সরকারের ধন-বিজ্ঞান প্রসঙ্গ, উমেশ বটব্যালের পুরাবৃত্ত আলোচনা, দীনেশ সেনের বৃহৎ বঙ্গ ইত্যাদি বাংলায় না হয়ে ইংরেজীতে লিখিত হলে, পূর্বোল্লিখিত পণ্ডিতদের চেয়ে এ-সবের রচয়িতারা বাইরে মোটেই কম খ্যাতি লাভ করতেন না। কিন্তু দেশের পক্ষে সুখের কথা যে সে-খ্যাতির লোভ তাঁরা সম্বরণ করেছিলেন।

দুঃখের কথা, আধুনিক সাহিত্যে এই ধারাটি আজ উপেক্ষিত। বাংলা ভাষায় আজ উল্লেখযোগ্য গল্প, কবিতা নিশ্চিতই অনেক লেখা হয়েছে, কিন্তু বৃহৎ, মহৎ বা অবিস্মরণীয় কাজ বিশেষ কিছু হচ্ছে না। তার কারণ হিসাবে আমি মনে করি, কতকগুলি সীমাবদ্ধ সমস্যা ও ভাবের আওতায় আমরা দীর্ঘ দিন আটক রয়েছি। বিচিত্র সঙ্ঘাত, সংগ্রাম ও অনুভূতি যেমন আমাদের ভাবের দিগন্ত প্রসারিত করছে না, দীর্ঘ, গভীর ও বহুমুখে-ব্যাপ্ত বিদ্যা তেমনি আমাদের চিন্তাকে পুষ্ট করছে না। ফলে বাংলা সাহিত্যে আজ পরম্পরানুকরণই প্রধান উপজীব্য হয়ে পড়েছে। কেউ কোন নূতন পথের সন্ধানও পাচ্ছেন না, আর পেলেও, তাতে হাঁটার সাহস নেই কারো।

এই অবস্থার অবসান ঘটাতে হলে চাই ভাষার ভাণ্ডারে চিন্তা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি বাড়ানো। নিছক ভাবের পথ্যে জীইয়ে না রেখে, পাঠককে ভাবানো চাই। তার উপায় হল বস্তু-সমৃদ্ধ গদ্যের চর্চা। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সঙ্গীত, চিত্রকলা, চিকিৎসাবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, অলঙ্কারশাস্ত্র, এ-সবের ওপর প্রামাণ্য বই-পুঁথি লেখা ও প্রকাশ করা চাই। সব প্রকাশকই পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উপন্যাস ও রম্য রচনা না ছাপিয়ে, কেউ-কেউ এ-সবের দিকে মন দিলে দেশের উপকার হবে। তাঁরাও বোধ হয় শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। এই রকম কোন ভাবী প্রকাশকের উদ্দেশেই আমি পূর্বোল্লিখিত ইংরেজী বইগুলি বাংলায় অনুবাদের এবং বাংলা বইগুলি পুনর্মুদ্রণের ভার ন্যস্ত করছি।

মোটের ওপর বাংলা দেশের সাধারণ মানুষকে তাঁদের শোচনীয় অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত করতে হবে। তাঁদের মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে দেশ-দুনিয়ার সব জিনিস শেখাতে হবে। শুধু গল্প ও কবিতা পড়িয়ে, অজ্ঞানতার ওপর আবেগ চাপিয়ে, আরো অলস, আরো বস্তু-বোধ হীন করছি আমরা তাঁদের। এ জন্যে স্বদেশের বিদ্বান, পণ্ডিত ও মনস্বীরা যে বিদ্যা রেখে গেছেন, তা তাঁদের হাতে পৌঁছে দিতে হবে। আবার নূতন যুগ ও জীবনের মননশীলতাও নূতন পণ্ডিতদের মারফৎ যুক্ত করে দিতে হবে সেই সঙ্গে, নইলে সাম্প্রতিকতা-বোধ শূন্য সাবেকিয়ানা ঘিরে ধরবে তাঁদের।

আশার বিষয় যে বাংলা ভাষায় সাহিত্য-সমাজের বাইরে আজ-কাল দর্শনের ইতিহাস, বিশ্ব রাজনীতি, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, যৌনবিদ্যা, মার্কসবাদ, সাহিত্যতত্ত্ব, সমষ্টি গণিত, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, এ-সব সম্বন্ধে বই-পুঁথি লেখা হচ্ছে। এ প্রচেষ্টা অবশ্য খুবই কম। তাছাড়া প্রকৃত লেখক যাঁরা, তাঁরা কেউ এখনো এ-সব জিনিষ লেখার কথা ভাবেন না। তাই এদিকের লেখার ভারটা চলে গেছে অলেখক পণ্ডিতদের হাতে। অর্থাৎ স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, এদেশে যাঁরা লেখক, তাঁরা কিছু পড়ার দরকার বোধ করেন না। যাঁরা পড়েন, তাঁরা আবার পারেন না লিখতে। এই অবস্থার প্রতিকার হবে, প্রকৃত জ্ঞানী ও সাহিত্য-শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা আসরে নামলে এবং তাঁদের আবির্ভাবকে দেশের জ্ঞানী-গুণীরা স্বাগত করলে।

রবীন্দ্রনাথ ও বহির্বিশ্ব

রবীন্দ্র শতবর্ষ উপলক্ষে পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশেই কবির উদ্দেশে আজ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত হচ্ছে। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য ও মতবাদের মহত্ত্ব বিজ্ঞ ব্যক্তিদের আলোচনায় উদ্ঘাটিত হচ্ছে। ভারতবাসী হিসাবে এতে নিশ্চিতই আমাদের গর্ববোধ করার কারণ আছে।

পুরাণ-প্রকীর্তিত নাম যাঁদের, যেমন বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, এস্কিলাস, ফেরদৌসী, তাঁদের বাদ দিলে, দান্তে, সেক্সপীয়ার, মলেয়ার, গ্যেটে, ভলতেয়ার, টলষ্টয় ও রলাঁ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের মতো সার্বভৌম খ্যাতি ও স্বীকৃতির অধিকারী সাহিত্য-স্রষ্টা কোন দেশে এবং কোন যুগে জন্মান নি। ইংরেজ শাসিত ভারতে জন্মগ্রহণ করে এবং যে-ভাষা ভারতবর্ষেও শতকরা দশজনের বেশী পড়তে বুঝতে পারেন না, সেই ভাষায় সাহিত্য রচনা করে রবীন্দ্রনাথের এই জগৎজয় একটা অভাবনীয় ঘটনা, তাতে আর সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ কথা কি ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের নাম ও খ্যাতি পৃথিবীতে যতটা পরিব্যাপ্ত ও প্রচারিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যও সেই পরিমাণেই মানুষের ঘরে-ঘরে ছড়িয়েছে? অর্থাৎ আমরা যতখানি গভীর করে জানি ও বুঝি ওপরের তালিকায় উল্লিখিত শিল্পীদের জীবন এবং সাহিত্য, রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্যও অন্যান্য দেশের মানুষ কি ঠিক ততখানিই জানেন, বোঝেন?

মনে করার কারণ আছে যে তা নয়। বেশীর ভাগ বিদেশীর কাছেই রবীন্দ্রনাথ একজন প্রাচ্যদেশীয় মানবাত্মবাদী প্রচারক, যিনি ভৌগোলিক জাতীয়তার ঊর্ধ্বে সর্বমানবিক একত্ব চেয়েছেন, যিনি কেবলমাত্র বিজ্ঞান ও রাজনীতি-অর্থনীতি-সর্বস্ব ঐহিকতাকে প্রিয় বলেন নি, চেয়েছেন মানুষের অন্তর্নিহিত বিবেক, বৈরাগ্য ও প্রেমবৃত্তির জাগরণ, যিনি ভাবুক, নায়ক, পর্যটক এবং শিক্ষা সংস্কারক!

এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁরা গ্রহণ ও বিচার করেছেন রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি। তাই তাঁর মহৎ সাহিত্য-ধর্ম তাঁদের চোখে ধরা পড়েছে অল্পই। তাঁর কবিতায় তাঁরা খৃষ্টীয় মরমিয়া সাধকদের ভজনাদির একটা নিকট-প্রতিধ্বনি শুনেছেন। তাঁর বক্তৃতা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধে তাঁরা ইউরোপীয় হিউম্যানিষ্টদের

মতবাদের প্রতিচ্ছায়া দেখেছেন। তাঁর রূপক-নাট্যগুলির মধ্যে পেয়েছেন প্রাচ্য দেশীয় মুক্তিতত্ত্ব, যা বস্তুকে তথা বিজ্ঞানকে বন্ধন মনে করে।

এর বেশী নিবিড় ও অন্তরঙ্গ পরিচয় রবীন্দ্রনাথের জানেন না কোন বিদেশীই। অবশ্য এই যে পরিচয়, এ-ও ভুল নয়। রবীন্দ্র-মনীষার ভালো একটা দিকই উদ্‌ঘাটিত করে দেখায় এ-ও। কিন্তু তবু এ অসম্পূর্ণ। এমন কি, সার্থক ও সামগ্রিক রবীন্দ্র-পরিচিতির স্বাক্ষর বহনই করে না এ সিদ্ধান্ত। ভেবে দেখুন ত, বিশ্বমৈত্রী ও মানব-কল্যাণবাদের প্রচারক একজন ওরিয়েন্টাল মিষ্টিক মাত্র বললে, রবীন্দ্রনাথের মতো বিশাল বনস্পতির কতটুকু মহত্ত্ব উন্মোচিত হয়? আদৌ কিছু হয় কি না?

রবীন্দ্রনাথ এ-দেশে একই সঙ্গে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক, গীতিকার, সুরস্রষ্টা, গায়ক, অভিনেতা ও চিত্রকর, সংস্কারক, শিক্ষা-নায়ক, দার্শনিক ও পর্যটক। একই সঙ্গে তিনি দেশপ্রেমিক ও আন্তর্জাতিকতা বাদী, বিজ্ঞানবিৎ ও অধ্যাত্মবাদী। এত বড় এবং এমন সহস্রশীর্ষ মহান পুরুষকে তাঁর সমস্ত রচনা তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে না পড়লে, তাঁর জীবনকে আদ্যোপান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে যাচাই করে না দেখলে, বোঝা যায় কি?

দেশেই আজ পর্যন্ত এ-পথে কাজ অতি সামান্য হয়েছে, বিদেশে ত কিছুই হয়নি। এ কথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ-নিবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ হয়েছে। তার কিছু কবি করেছেন, কিছু করেছেন অন্যেরা। আর ইংরেজী থেকেই দুনিয়ার বেশীর ভাগ ভাষাতে পুনরনুবাদ হয়েছে রবীন্দ্র সাহিত্যের। কিন্তু এই সব অনুবাদের অনেকটাই বিশেষ ভালো নয়, আর কোনটাই ঠিক নির্ভরযোগ্য ভাষান্তর নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের অসামান্য সাহিত্য-প্রতিভার খুব সামান্য অংশই ধরা পড়েছে এতে। রবীন্দ্রনাথের সম্মানিত ব্যক্তিত্বের দিকে চেয়ে নানা দেশ এগুলিকে মর্যাদা দিয়েছে। নিছক মহৎ সাহিত্য হিসাবে নিশ্চয় দেয়নি।

কবির ইংরেজী গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার ও ক্রেসেণ্ট মুন কবিতার বই তিন খানার কথা ধরুন। নিঃসন্দেহে সুরেলা সরল গদ্য-কবিতা হিসাবে এদের রচনাগুলি সুন্দর। কিন্তু বাংলা গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যের গানগুলির, অথবা খেয়া, নৈবেদ্য, সোনার তরী ও শিশুর কবিতাগুলির সেই অতুলনীয় শব্দ-সঙ্গীত, সেই চিত্র-ধর্মের নিজস্ব মহত্ত্ব কতটুকু এতে আছে? তাছাড়া আক্ষরিক অনুবাদ

ত নয় এরা, মূল আশ্রয় করে লেখা স্বাধীন ইংরেজী রচনা। আসলে প্রতিধ্বনির বেশী কিছু নয় তাই কোন কবিতাই, অনেক ছাড়-ছুট ও অদল-বদল আছে।

মালিনী, চিত্রাঙ্গদা, বিসর্জন প্রভৃতির কবি-কৃত সংক্ষিপ্তানুবাদে এই ছাঁট-কাট ও অদল-বদল আরো প্রবলাকার ধরেছে। ফলে মূলকে প্রায় চেনাই যায় না কোন কোন অনুবাদের মধ্যে দিয়ে। অথচ এই সব কবিতা ও নাটকের অনুবাদই ত হয়ে রয়েছে বাইরে রবীন্দ্র-পরিচিতির মুখ্যতম মাধ্যম। এ ছাড়া অবশ্য আছে ডাকঘর, রক্তকরবী, গোরা, ঘরে বাইরে, ছিন্নপত্র ও জীবন-স্মৃতির অনুবাদ। আছে নির্বাচিত গল্পের অনুবাদও। এগুলি সবই অন্যকৃত এবং সাহিত্য-গুণ বর্জিত নিছক অনুবাদ। কোন-কোনটা ভুল-প্রমাদ পূর্ণও।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব যে-সব রচনায় সর্বোত্তম রূপে ফুটেছে, সেই রকম গান, কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ মূলের সঙ্গে আগাগোড়া সঙ্গতি রেখে সত্যিকার নিপুণ সাহিত্যিক হাতে নূতন করে অনুবাদের প্রয়োজন রয়েছে। আর সে অনুবাদ ইংরেজীতে হলেই ভালো হয়, কারণ তাহলে দেশের ও বিদেশের সব ভাষায় তার ভাষান্তর সহজ হবে।

বলা বাহুল্য এ-অনুবাদে শুধু ইংরেজী জানলেই চলবে না। রবীন্দ্র-সংস্কৃতির মর্ম-লোকে গভীর ভাবে অনুপ্রবিষ্ট মানুষ হতে হবে। গিলবার্ট মারের অনুবাদে ইস্কিলাস, সফোক্লিস বা আর্থার সাইমন্সের অনুবাদে ভার্লেন, ভেলেরী ও বদলেয়ার যাঁরা পড়েছেন, কিংবা মড-দম্পতির অনুবাদে টলষ্টয় যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন সত্যিকার অনুবাদ কাকে বলে। অমনি বোদ্ধা রসিক ও লিখন-তৎপর লোক চাই, যার খুবই অভাব এ-দেশে!

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সত্যিকার পরিচয় বাইরের দুনিয়ায় অনুদ্ঘাটিত রয়েছে, তার কারণ তাঁর সুনির্বাচিত প্রধান প্রধান রচনাগুলি আজও সার্থক অনুবাদের সাহায্যে জগতের সাম্নে তুলে ধরা হয়নি। তাছাড়া রবীন্দ্র-জীবন ও মননের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেও এমন প্রামাণ্য বই আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি, যা থেকে বাইরের লোক কোন নির্ভরযোগ্য আলো পাবেন। এখনো পর্যন্ত তুচ্চি, ফর্মিকি, লেজনী, লেভী, জিদ, য়েটস, টমসন, রীজ ও রোটেনষ্টাইনের ছিটে-ফোঁটা লেখা থেকেই বাইরের লোক রবীন্দ্রনাথকে বোঝেন। তার মানে প্রায় কিছুই বোঝেন না। আধ্যাত্মিকতা, মিষ্টিসিজম বা বিশ্বমৈত্রীর গোঁজামিল দিয়ে রবীন্দ্র-ব্যাখ্যার মূলই হল এইখানে।

আমরা এই গলদের মূল অপসারিত করার চেষ্টা করিনা। বরং অপরিমিত আহাম্মকী বশে এই বিদেশী ধ্বনির বিকৃত প্রতিধ্বনি দিয়েই আমরা রবীন্দ্র-বন্দনা করি। সময় এসেছে, যখন এই দুরবস্থার প্রতিকারে আগুয়ান হতে হবে আমাদের। নীরস বিবৃতি-সর্বস্ব পর্বত-প্রমাণ রবীন্দ্র-জীবনী নয়, সুন্দর সংক্ষিপ্ত সাহিত্য গুণান্বিত ব্যাখ্যা লিখতে হবে রবীন্দ্র-জীবন ও মননের এবং নির্বাচিত রবীন্দ্র রচনাবলীর মতো তা-ও যোগ্য অনুবাদে পৌছে দিতে হবে দুনিয়ার দরবারে।

এই বিশেষ কাজটাই ছিল বিশ্বভারতীর প্রধান করণীয়। কিন্তু তাঁরা এ পর্যন্ত এ-দিকটায় বিন্দুমাত্র নজর দেননি। অবস্থার চাপে ভবিষ্যতে হয়ত দেবেন। এখানে সেই প্রয়োজনের কথাটাই শুধু আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম, সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি নিয়ে আমরা দাপাদাপি করি, তার ভেতরের রূপটা কি, তা-ও দেখাতে চেষ্টা করলাম।

অনুরূপা দেবী

মা, পোষ্যপুত্র, মন্ত্রশক্তি প্রভৃতি উপন্যাসের রচয়িত্রী অনুরূপা দেবী শুধু বাংলার ইদানীন্তন মহিলা সাহিত্যিকদের অগ্রগণ্যা নন, সমগ্র ভাবে বাংলা সাহিত্যেরই তিনি একজন বিশিষ্ট লেখিকা। হয়ত উপন্যাসের মাধ্যমে রস-সৃষ্টির চেয়ে উন্নত জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করার দিকেই তিনি অধিকতর মনোনিবেশ করেছেন এবং সে-আদর্শ হয়ত বর্তমান সময়ের পটভূমিকে অস্বীকার করে, অতীত ভারতের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীকেই সমধিক নিষ্ঠায় অনুসরণ করেছে। তবু বিশুদ্ধ শিল্প-ধর্মের বিচারে তাঁর রচনা যে অনুপভোগ্য হয়নি, তার প্রমাণ তাঁর রচনার দেশব্যাপী সমাদরের মধ্যেই মূর্ত।

আমাদের মনে রাখতে হবে, অনুরূপা দেবী যখন প্রথম সাহিত্য-সাধনা সুরু করেন, তখন বাংলা দেশের সমাজ-চেতনায় নারীশিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রতিকূল ভাবেরই প্রাধান্য ছিল। অধিকাংশ মহিলাই ছিলেন অক্ষর-জ্ঞান বঞ্চিতা। যাঁরা কোন মতে বর্ণপরিচয়ের সোপান অতিক্রম করেছিলেন, তাঁরা কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্রের সঙ্গেই দীনবন্ধু, বঙ্কিম ও দামোদরের সঙ্গে কিছু-কিছু আলাপ করতেন। এটুকুও অনেক সময় অনুচিত বেয়াদপী রূপে গণ্য হত এবং তার দণ্ড বহু শুদ্ধান্তঃপুরেই অপ্রতিবাদ অশ্রু-পাতের কারণ হত। একমাত্র ব্রাহ্মসমাজই সেদিন প্রকাশ্যে নারীশিক্ষার সমর্থন করতেন। শুধু তাই নয়, গীতবাদ্য ও নাট্যকলা অনুশীলন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্য-কলাপে নারীর অংশ গ্রহণ, সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে নারীর লেখনী ধারণ, এ-সবেরও তাঁরা সমর্থক ছিলেন। এই পৃষ্টপোষকতার ফলেই অল্পসংখ্যক মহিলা সেদিন অন্তঃপুর থেকে ভীরু পায়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে জ্ঞান ও কর্মের জগতে আসতে সাহস পেয়েছিলেন। সেদিনের নায়ক ও লেখকরা অবশ্য তাঁদের উচ্চকণ্ঠেই সম্বর্ধিত করেছিলেন, কিন্তু দেশের জনসাধারণ তাঁদের সমুচিত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি। সমাজ-মনস্তত্বের এই ব্যাপ্ত বিরূপতাই সেদিন নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল।

এমন দিনে নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের কন্যা অনুরূপা দেবী শুধু সম্পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা লাভই করেন নি, সেই শিক্ষাকে সুচিন্তিত রচনার মাধ্যমে প্রকাশ

করেছেন—প্রচলিত সমাজের দুঃখ-বেদনা ও সঙ্কট-সমস্যাকে ভাষা দিয়েছেন, আবার সুন্দরতর, উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতেরও পথ-নির্দেশ করেছেন, এ তাঁর অতুলনীয় কৃতিত্বের পরিচয়। আজকের আলোতে বিচার করতে বসলে, হয়ত এই কৃতিত্বের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করা যাবে না। কিন্তু ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে সাহিত্যের বিচার যদি বা সম্ভব, সাহিত্যিকের বিচার যে কোন দিনই হতে পারে না, এ আজ আর আশা করি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই।

অবশ্য অনুরূপা দেবীর আগেও বঙ্গমহিলারা সাহিত্য-সাধনা করেছেন এবং তাঁদের কারো কারো রচনা এখনো জন-মন থেকে একেবারে স্খলিত হয়ে যায়নি। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য-স্রষ্টার স্বাক্ষর স্বর্ণকুমারী দেবী ছাড়া আর কেউই রাখতে পারেন নি বোধ হয় ইতিহাসের পাতায়। কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রসন্নময়ী দেবী প্রমুখের কবিতা, কুসুমকুমারী দেবী ও শরৎকুমারী চৌধুরাণীর উপন্যাস এবং রেখাচিত্র, রাসসুন্দরী সরকারের আত্ম-জীবনী প্রভৃতি যতটা প্রথম আমলের মহিলাদের রচনা হিসাব গণনীয়, সার্থক সাহিত্য হিসাবে তা ততটা বরণীয় নয়, এ হয়ত না বললেও চলবে। এর পরের ধাপেই অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, সরলা দেবী ও ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী প্রমুখের আবির্ভাব এবং তাঁরা কেউ নিছক অধ্যবসায়ী নন, সবাই কুশলী সাহিত্য রচয়িত্রী। এঁদের মধ্যে নিরুপমা দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, সরলা দেবী লোকান্তরিতা হয়েছেন। সৌভাগ্যবশত এখনো আছেন অনুরূপা দেবী এবং ইন্দিরা দেবী। অনুরূপা দেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে আজ তাঁকেও আমার শ্রদ্ধাভিবাদন জানাচ্ছি।

অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী শুধু একই সময়ে লেখার সুরু করেন নি, আবাল্য একে অন্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং কি পারিবারিক জীবনে, আর কি সাহিত্য-জীবনে পরস্পরের মধ্যে সারা জীবনই অন্তরঙ্গ আদান-প্রদান ছিল। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে উভয়ের রচনা-ধারা সম্পূর্ণ আলাদা জাতের। নিরুপমা দেবীর সমাজ-দৃষ্টিতে যেমন একটি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর গল্পের ব্যবস্থাপনাতে পাওয়া যায় একটি উদার মমতাময় নারী-হৃদয়ের স্পর্শ। এ দুটি গুণের জন্যেই তাঁর দিদি ও শ্যামলী হৃদ্য উপন্যাস হিসাবে আজও ঔজ্জ্বল্য রক্ষা করছে। অনুরূপা দেবী প্রজ্ঞাশীলা,

তাঁর রচনায় বাদ-বিতর্ক, বিশ্লেষণ এসে পড়ে পদে-পদেই এবং ব্যক্তি-চরিত্র-গুলি তার ফলে অনেক সময় নিরুপাধিক তত্ত্বের বাহন হয়ে দাঁড়ায়। বিশুদ্ধ গল্পকার হিসাবে এ হয়ত কিছুটা অসফলতারই নির্দেশক। কিন্তু এ যুগের শ্রেষ্ঠ কোন উপন্যাসই ত খালি গল্প বলে না, গল্পের সাজে কাজের কথাকেই পৌঁছে দেয় পাঠকের কাছে। সেদিক থেকে অনুরূপা দেবী নিরুপমা দেবীর মতো নিপুণা শিল্পী না হতে পারেন, কিন্তু তিনি যে বিশিষ্টতর লেখিকা, তাতে আর সন্দেহ নেই। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে, কাজের কথা উপন্যাসে বলা হবে ঠিকই, কিন্তু সে কতটা পর্যন্ত, আর যে-কথা একদিন অত্যন্ত কাজের বলে ধরা হয়েছে, আর এক দিন তা বাজে হয়ে যেতে পারে কি না ?

এই সব কূট-তর্কের এত অল্প পরিসরে মীমাংসা হবে না, আর তা করার উপলক্ষ্যও এ নয়। সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে তত্ত্ব, তথ্য, তর্ক, বিচার, উপন্যাস-সাহিত্যে সবই থাকতে পারে, কিন্তু সে গল্পকে অতিক্রম করে নয়। গল্পের প্রাণবন্ত প্রবাহের সঙ্গেই অন্তঃপ্রবাহী ধারা রূপে তা বয়ে চলবে। যেখানেই কথাটা মুখ্য হয়ে পড়বে, সেখানেই গল্প মার খাবে এবং বহু মূল্যবান প্রসঙ্গের আলোচনা দিয়েও তাকে আর দাঁড় করানো যাবে না। এই সুসংবদ্ধ গল্পই সমাজ-সমস্যা বদলে গেলেও এবং বক্তব্য বিষয় বাসি হয়ে গেলেও, উপন্যাসকে সজীব রাখে। কৃষ্ণকান্তের উইল, স্বর্ণলতা, চোখের বালি, পল্লীসমাজ, বামুনের মেয়ে কোন দিনই সাহিত্য হিসাবে উপেক্ষিত হবে না। পক্ষান্তরে অনেক এক দিনের জনপ্রিয় বই যে ইতিমধ্যেই প্রাত্নিক অনুসন্ধানের বস্তু হয়ে পড়েছে, এ আমরা সকলেই দেখতে পাচ্ছি। এখন কথা উঠবে, এই নিরিখে অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের ধর্ম বিচার করে কি পাওয়া যাচ্ছে ? পাওয়া যাচ্ছে যে তাঁর উপন্যাস এখনো জনসাধারণের উত্তপ্ত অনুরাগের মধ্যে জীবিত আছে। কাজেই বৈদগ্ধ্যের সঙ্গেই তাতে যে সাহিত্য-ধর্মের সুষ্ঠু সমীকরণ হয়েছে, এতে আর সন্দেহ কি ?

এখানে একটা কথা প্রসঙ্গক্রমে আলোচনীয়। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা অনুরূপা দেবীর বান্ধবী ছিলেন। এই সূত্রে কবির সান্নিধ্যে তিনি বহুবার যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। শরৎচন্দ্র যখন ছন্নছাড়া ভবঘুরের জীবন যাপন করতেন, তখন তিনিও বেশ কিছুদিন অনুরূপা দেবীর আশ্রয়ে থেকেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্র-শরৎ সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য হলেও, লিখন ও

মননের ক্ষেত্রে কিন্তু অনুরূপা দেবী এই দুই জাদুকরের দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হননি। তাঁর নিজস্ব চিন্তা, দৃষ্টি ও আঙ্গিককেই একাগ্র নিষ্ঠায় আঁকড়ে থেকেছেন তিনি। স্বধর্মানুরাগ ও শিল্পীর স্বাধিকার বোধ হিসাবে এ জিনিষকে দুর্লভ শক্তিই বলতে হবে, গণ্ডী এর ছোট হলেও, যেহেতু এ-যুগে আর কেউ এটা পারেন নি।

সবাই জানেন, স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী তিনি। আচারনিষ্ঠ পিতামহের প্রদর্শিত পথকেই তিনি জীবনের পথ রূপে গ্রহণ করেছেন, অন্তত সাহিত্যে। তা থেকে কোন কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। তাই গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংঘাতে আমাদের সামাজিক সত্তায় যে পরিবর্তন অনিবার্যভাবে প্রকাশমান হয়েছে, তার মধ্যে তিনি স্বীকৃতির বা সৃষ্টির কোন উপাদান পান নি। তাই তাঁর লেখনী বরাবর যুগ-ধর্মের প্রতিকূলে চলেছে! এ ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, সে বিচার ইতিহাস করবে। আমরা তাঁর লেখা পড়ে আনন্দ পেয়েছি, লেখার আড়ালে রয়েছেন যে প্রবীণা লেখিকা, তাঁর মধ্যেও বিশিষ্টতার পরিচয় পেয়েছি, এই কথাটাই আজকের উপলক্ষ্যে খুশী মনে জানিয়ে রাখছি।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য

॥ ১ ॥

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগ বলে সত্যি সত্যি কোন যুগ এসেছে কি না এবং এসে থাকলে, সে-যুগে কোন মহৎ বা স্মরণীয় সাহিত্য রচিত হয়েছে কি না, তা নিয়ে সাহিত্য-বিচারকদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। এক দল বলেন, রবীন্দ্রনাথের পর গল্পে প্রভাতকুমার, উপন্যাসে শরৎচন্দ্র, প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী, আর খুব যদি উদারভাবে দেখেন ত কবিতায় সত্যেন দত্ত কিছুটা নূতনত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সে নূতনত্ব রবি-রশ্মিরই প্রতিফলন মাত্র, কাজেই তাকে স্বতন্ত্র একটা যুগ বলা চলে না। আর এঁদের পর যাঁরা দেখা দিয়েছেন, তাঁরা সাহিত্যের বস্তু ও বাচন-ভঙ্গী নিয়ে যতই কেন না পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান, সার্থক সাহিত্য তাঁরা সৃষ্টি করেছেন সামান্যই। অর্থাৎ এঁদের মতে বাংলা সাহিত্যে অদ্যাবধি রবীন্দ্র-যুগেরই অনুবৃত্তি চলছে।

আর এক দল বলেন, রবীন্দ্রনাথ মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন ঠিকই, কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি যা-কিছু লিখেছেন, তাই মহৎ নয়। যুগ ও জীবনের প্রবণতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শেষের অধ্যায়ে দীর্ঘদিন তিনি নিজের গড়া একটি ভাব-জগতের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থেকেছেন। এই অধ্যায়ে তিনি প্রভূত পরিমাণে আত্মানুকরণ করেছেন। ভক্তি-বিমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই অংশকে খুব উঁচু মূল্যে চিহ্নিত করা হয়ত যায় না। কাজেই এই সাহিত্যের অনুসরণে অন্যেরা যা লিখেছেন, তার দাম প্রায় কানাকড়িও দাঁড়ায় না। এই গতানুগতিকতা থেকে বাংলা সাহিত্যকে মুক্ত করেছেন ১৯২৫ থেকে '৫৫ সালের মধ্যে আবির্ভূত সাহিত্যিকরা। তাঁরা শুধু নূতন বিষয় এবং আঙ্গিক নিয়েই পরীক্ষা করেন নি—তাঁরা সমগ্র ভাবে রূপ দিয়েছেন একটি নূতন জীবন-দর্শনকে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁরা প্রবর্তন করেছেন একটি নূতন মূল্যমান, যা রবীন্দ্র-মান থেকে স্বতন্ত্র। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ নিজে যেমন একটি যুগ, রবীন্দ্রোত্তর লেখকরা তেমনি সকলে মিলে একটি যুগ।

এই পরস্পর-বিরোধী দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে আমি দ্বিতীয়টির পক্ষে। যদিও এ কথা আমি পুরোপুরি স্বীকার করি না যে শেষ জীবনে লেখা রবীন্দ্রনাথের

'মহুয়া', 'বনবাণী', 'চার অধ্যায়', 'মালঞ্চ' ইত্যাদির, বা তারও পরের 'বীথিকা', 'প্রান্তিক', 'ছেলেবেলা', 'গল্পসল্প' ইত্যাদির কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই। আর এটাও আমি স্বীকার করি না যে, রবীন্দ্রাদর্শের সঙ্গে সংগ্রাম করেই আধুনিকরা নূতন একটা সাহিত্যাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমার বিবেচনায়, জৈব-প্রকৃতির মতো মানস-প্রকৃতিও অভিব্যক্তির নিয়মাধীন। একদিন যে-সব চিন্তা বীজাকারে সুপ্ত থাকে পূর্বসূরীদের লেখায়, আর একদিন তাই অনুকূল আবেষ্টনীতে অঙ্কুরিত হয়ে নব বনস্পতির আবির্ভাব সম্ভবপর করে তোলে। রবীন্দ্র-চিন্তার মধ্যেই আধুনিক সাহিত্যের বেশীর ভাগ প্রাণ-বীজ বিক্ষিপ্ত ছিল। সহানুভূতির উত্তাপে তারা পরিস্ফুট হয় নি, কেন না কবির মনোধর্ম তার অনুকূল ছিল না। আধুনিকদের বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তাঁরা সেই উপেক্ষিত বীজগুলিকে সাহিত্যের মৃত্তিকায় নূতন ফসলে রূপ দিয়েছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে অভিব্যক্তি এমনি করেই হয়। রাত্রি-প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে হুট করে হঠাৎ হয়ে যায় না কিছু!

॥ ২ ॥

১৯২৫ থেকে '৫৫ সালের মধ্যে দেশে যাঁরা নূতন সাহিত্যিক রূপে দেখা দিয়েছেন, একদা তাঁদের পক্ষ থেকে দাবি করা হত অনেক বেশী। অনুরাগীরা বলতেন, বাংলা সাহিত্যে তাঁরাই প্রথম উপেক্ষিত, নিগৃহীত এবং সমাজ-সৌধের নীচু-তলায় অবস্থিত মানুষদের সসম্মান স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর অনন্ত, অসীম ও অরূপের কারাগারে বন্দী মানুষদের বাস্তব ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে, তার প্রাত্যহিক আঘাত-অভিঘাতকে তাঁরাই প্রথম ভাষা দিয়েছেন। অর্থাৎ এক কথায়, যুগোচিত বাস্তবতাবাদ বনাম নব্য মনুষ্যত্ববাদের তাঁরাই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ দাবি একেবারে আজগুবি বা অসমর্থনীয় এমন কথা বলব না, যদিও এই সিদ্ধান্তের উত্তর-দক্ষিণ একটু চেপে নিতে হবে। কারণ আগেই বলেছি যে, এই সব 'বাদে'র আদি উপাদান অল্প-বিস্তর সবই পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথে এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে তথাকথিত 'কল্লোল'-যুগে আসতে মাঝখানে পড়েন যে সাহিত্য-স্রষ্টারা, তাঁদের রচনায়ও এই সব বাদের কতকটা পর্যন্ত রূপায়ণ স্পষ্টতর হয়েছে দেখা যাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করছি মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুলের কবিতার এবং সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও জগদীশ গুপ্তের

উপন্যাস-গল্পের। কথা-সাহিত্যে রবীন্দ্র-শরৎ পর্বের পর এই শেষোক্ত তিন জনের, বিশেষত জগদীশ গুপ্তের অগ্রগামী ভূমিকা স্বীকার করতেই হবে আধুনিকদের। আর কবিতার রাজ্যে প্রথম তিন জনের অনুপ্রেরণাও অস্বীকার করতে পারবেন না কেউ।

অবশ্য একদিন সত্যেন্দ্র গুপ্তের 'কমলের দুঃখ' বা নরেশ সেনগুপ্তের 'রক্তের ঋণ' প্রভৃতি বইকে একাধারে জোলা, ফ্লবেয়ার, গোর্কী ও হামসুনের লেখনীর যোগ্য বলে গলাবাজি করা হত। ভার্লেন, মালার্মে ও বদলেয়ারের সঙ্গে যতীন সেনগুপ্ত বা নজরুলের কবিতার তুলনা করা হত এবং প্রকারান্তরে সেই সুযোগে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে বাস্তব-বিমুখ, স্বপ্ন-বিলাসী ও অযুগসিদ্ধ সাহিত্যিক বলে ব্যঙ্গ করা হত। আজ পরিবর্তিত কালের বিচারে দেখা যাচ্ছে, এ-সব অত্যুক্তি শুধু অর্থহীন নয়, হাস্যোদ্দীপক। তবু এঁরা যে বাংলা সাহিত্যের যুগ-বিবর্তন তথা দৃষ্টি-বিবর্তনের পথে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, এবং শুধু যুগ-সন্ধির লেখক বলে নয়, সার্থক সাহিত্যিক রূপেই যে এঁদের কয়েক জন গ্রহণীয় ও স্মরণীয়, তা নিয়ে মতদ্বৈধ নেই।

দুঃখের বিষয়, সাহিত্যবোদ্ধা অনেকেই আজ আর মাঝখানকার এই দলটিকে ন্যায্য মূল্যে স্বীকার করতে চান না। তাঁরা নরেশ সেনগুপ্ত, সত্যেন্দ্র গুপ্ত ও জগদীশ গুপ্তকে ভুলেই গেছেন। মোহিতলালকে কবি রূপে নয়, রক্ষণশীল শিবিরের একজন দুর্মুখ প্রাবন্ধিক বলেই মনে রেখেছেন। নজরুলের প্রতি তাঁদের দয়া ও দরদ আছে, কিন্তু তাঁর সাহিত্য দেশবাসীর অনুরাগভ্রষ্ট হয়েছে। অধুনা লোকান্তরিত হওয়ায় যতীন সেনগুপ্তের কথা মাঝে মাঝে আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু তাঁর কবিতা পঠিত হয় কোথায়? মানুষ অনেক সময় অকৃতজ্ঞ হয় এবং ইতিহাসও তার ফলে অসত্যে কলুষিত হয়।

কিন্তু যাক এ কথা। রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে এক দিন নালিশ উঠেছিল, তাতে বাস্তবের বার্তা নেই। অব্যক্তিক ভাব-কল্পনার পাখায় ভর করে উড়ে গেছেন কবি বস্তু-সংসারের ওপর দিয়ে, কোনদিন কোন দৈন্য, মালিন্য, ব্যর্থতা ও পরাভব স্পর্শ করে নি তাঁকে। সাহিত্যে তাই তিনি চিরসুখবাদকেই ব্যক্ত করেছেন বরাবর। গানে ও কবিতায় এই অপার্থিবতা হয়ত মানিয়ে গেছে, কিন্তু নাটকে ও গল্প-উপন্যাসে এই নিরবলম্ব বিশ্ব-বোধ অসার্থকতার

দ্যোতক হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মানুষরা তাই আসলে রক্ত-মাংসের মানুষ হয়নি। হয়েছে এক-একটি ভাবের মানবায়িত বাহন। শরৎচন্দ্র এখান থেকে অনেক পথ অগ্রসর হয়েছেন। সত্যিকার জীবনের পরিচয় তাঁর ছিল, সে-জীবনকে ফুটিয়েছেনও তিনি। কিন্তু তাঁর সেই নিরাসক্ত শিল্প-দৃষ্টি নেই, যা থাকলে জীবনকে যথাযথ আঁকা যায়। দেশে দরদী কথা-শিল্পী বলে তিনি সম্মানিত হয়েছেন। দরদী তিনি ঠিকই। কিন্তু এই দরদের প্রাবল্যেই তাঁর সাহিত্যে পতিতা বক্তৃতামতী বিদুষী হয়েছে, হোটেলের ঝি ভদ্রমহিলার ওপর আসন নিয়েছে বিদ্যা-বৈদগ্ধ্যের জৌলুষ দেখিয়ে। এই যে অবাস্তব কারুকলা, এ থেকে বাংলাসাহিত্যকে মুক্ত করল কল্লোল যুগ, এই হল সে-যুগের দাবি।

॥ ৩ ॥

গোড়াতেই বলেছি, এ দাবি আমি মোটামুটি স্বীকার করি। কারণ সাহিত্যিকের মননশীলতা যে ধনী থেকে দরিদ্রের, সুখী থেকে অসুখীর এবং আদর্শ থেকে বাস্তবের পথে স্পষ্ট ভাবে মোড় ফিরেছে এই জায়গায় এসে, এটা ইতিহাসের সত্য। তাই সেদিন বস্তির ছেলে, কয়লা-খাদের ও চা-বাগানের কুলি-কামিন, চোর, ডাকাত, জুয়াড়ী, গাঁজাখোর, পতিতা, ভিক্ষুক প্রভৃতিদের নিয়ে সাহিত্য লেখা সুরু হয়েছে। বেরিয়েছে 'কয়লাকুঠি', 'নারীমেধ', 'কলরব', 'পাঁক', 'বেদে', 'চৈতালী ঘূর্ণি'। শুধু ভদ্রলোক, ভদ্রসমাজ ও ভদ্রচিন্তার দুনিয়া এড়িয়ে নূতন এবং সাধারণের অপরিজ্ঞাত মানুষদের মুল্লুকেই চলে যান নি লেখকরা, সেই সব তৃষ্ণা, দাবি ও বেদনাকে নির্ভয়ে রূপ দিয়েছেন তাঁরা, যা দিবালোকে দেখলে আঁতকে উঠতেন অনেকেই। এই অভিনবতার স্বীকৃতি তাঁদের অবশ্যই আছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই 'সাহিত্য-ধর্ম' নামক প্রবন্ধে এই সব রচনার নোংরা আবেষ্টনী ও জৈব অতিশয়তার নিন্দা করে এঁদের ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। কিন্তু মজা এই যে, এই সব রচনার কোনটাই অমর ত দূরস্থান, দীর্ঘজীবীও হয়নি। কেন?

তার উত্তরে বলতে হবে নূতন আদর্শ ও চিন্তা-ধারা প্রবর্তনের যে গরজ সাহিত্যিকরা অনুভব করেছিলেন, সেটা খাঁটি, কিন্তু সেই অনুভূতিকে সৃষ্টির মধ্যে রূপায়িত করার জন্যে চাই যে নিজস্ব জাগ্রত জীবন-বোধ, যে ব্যাপক সত্য উপলব্ধি, তা তাঁদের ছিল না। তাঁরা প্রয়োজনেই আন্দোলন করেছিলেন,

কিন্তু তার মাল-মসলা নিয়েছিলেন বিদেশী বই থেকে, দেশের মাটি থেকে নয়। তাই অপরিণত বয়সের ফেনা কেটে গিয়ে যখন লিখন-শক্তি পরিপক্ক হল তাঁদের, তখন দেখা গেল, তাঁরা আর সেই বিপ্লবারক্ত পথের পথিক নন। সবাই পরিচিত জীবনের ভেতর থেকেই সাহিত্য-সৃষ্টি করছেন এবং তার জন্যেই সর্বজনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। 'পথের পাঁচালী', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'উপনায়ন', 'জননী', 'কাক জ্যোৎস্না', যা-কিছু ভালো লেখা হয়েছে এই ধাপে, প্রাণ-ধর্মে তা কল্লোল-যুগের রচনা থেকে সম্পূর্ণ তফাৎ। তাহলেই দাঁড়াচ্ছে, কল্লোল নূতন সাহিত্য-সম্ভবের পথ করে দিয়েছিল, কিন্তু সার্থক নূতন সাহিত্য-সৃষ্টি করতে পারে নি। সেই লেখকরাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন কল্লোলের জীবনাবসান হবার পরে এবং কল্লোলী ধারা সম্পূণ পরিহার করে।

আসলে বাংলা সাহিত্যে সেদিন ফ্রয়েডবাদ ও মার্ক্সবাদের প্রতিধ্বনি এসেছে। লেখকরা পেয়েছেন তার অনুপ্রেরণা। তাছাড়া ইংরেজী অনুবাদের ভেতর দিয়ে পেয়েছেন তাঁরা সমসাময়িক ফরাসী, জার্মাণ, রুশ ও নরওয়েজিয়ান সাহিত্য। এ দিয়েই তাঁরা গড়তে গেছেন রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের ইমারত। তাই জিনিষটা সত্যিকার প্রাণ পেতে পারে নি, যদিও তা সত্ত্বেও, বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টি এবং চিন্তার প্রসার ঘটিয়েছে তা প্রচুর পরিমাণে, আর ভাষাকেও সংহত, সাবলীল ও সকল রকম ভাব প্রকাশের উপযুক্ত করেছে। আমার দুঃখ হয়, নিছক নূতনত্ব সন্ধানের জন্যে নয়, প্রকৃত জীবন-বোধের প্রেরণায় যদি তাঁরা তথাকথিত অবহেলিত জীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হতেন এবং সেখান থেকে গল্প, উপন্যাস ও নাটকের মাল-মসলা আহরণ করতেন, তাহলে আজ তাঁরা সত্যি সত্যি কি মহান ও অভিনব সাহিত্যই সৃষ্টি করতে পারতেন! সে নিষ্ঠা ছিল না বলেই, ও-জীবন থেকে সরে আসতে হল তাঁদের এবং তার ফলেই যে বিরাট সম্ভাবনীয়তার স্বপ্ন আশান্বিত করেছিল অনেককে, তা কোনদিন সত্য হল না।

সেই লেখকরাই আজ কেউ রাজনীতি করছেন, কেউ ছায়াচিত্র-পরিচালনা করছেন, কেউ ধর্মগ্রন্থ রচনা করছেন। আর সবাই নিজের নিজের সেরা গল্প, নির্বাচিত রচনা ইত্যাদি প্রকাশ করে পুরানো পুঁজির ওপর নূতন স্থিতির আশানীড় তৈরী করছেন। এ অনক্ষয় ও পরাভব ছাড়া আর কিছু নয়।

॥ ৪ ॥

আমি শুধু কথা-সাহিত্যের কথাই বলেছি। তার কারণ রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে আসলে গল্প-উপন্যাসই লেখা হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং সেই বিভাগেই নূতনত্ব বলুন, উৎকর্ষ বলুন, যাহোক কিছু দেখা যাবে। উপন্যাস বললাম বটে, কিন্তু বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি ও তারাশঙ্করের দু-এক খানি ছাড়া পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লেখা হয়নি বিশেষ এ-যুগে। ছোট ও বড় গল্পই লেখা হয়েছে এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের দান এই বিভাগে অল্প নয়। গল্পের পরে বলা দরকার কবিতার কথা। কবিতায় যুগের বাণী, জীবনের বাণী, মানুষ ও মনুষ্যত্বের বাণী যতটা পর্যন্ত আশা করা উচিত ছিল এ-যুগে, তার অতি সামান্যই এখনও পর্যন্ত পূর্ণ হয়েছে। জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কবিদের রচনা দেশে সমাদৃত হয়েছে। এঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব জনপ্রিয় কবি, যদিও সর্বাধিক রবীন্দ্র-প্রভাবিত, প্রেমেন্দ্র মিত্র সর্বাধিক প্রজ্ঞানুগামী, আর জীবনানন্দ সর্বাধিক দুর্বোধ্য।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের এঁরাই মুখ্য কবি। এঁদের পর কবিতার ক্ষেত্রে যে-সব পরীক্ষা সুরু হয়েছে, তার সম্বন্ধে একটা মোটা কথা শুধু বলা আবশ্যক যে যে-যুগে সর্বজনের উন্নয়নে এবং সর্ব-মানবের মধ্যে শিল্প-সংস্কৃতির পরিব্যাপ্তিতে মানুষের মুক্তি বলে স্বীকৃত হচ্ছে, সে-যুগে শিক্ষিত মানুষেরও কিছুমাত্র বোধগম্য হয় না, এমন সব রচনাকে মহৎ কবিতা বলা এবং সেই সব কবিদের প্রগতিশীলরূপে চিহ্নিত করা হচ্ছে, এটা কি সাহিত্যের সঙ্গে শঠতার মতো নয়?

প্রকৃত পক্ষে এ-যুগে খণ্ড খণ্ড দৃষ্টি ও টুকরো টুকরো চেষ্টার ভেতর দিয়ে একটা নূতন চেতনা, একটা নূতন জীবন-দর্শন জন্মগ্রহণ করেছে ও করছে, কিন্তু সেই সৃষ্টিকে আশ্রয় করে কোন বৃহৎ স্রষ্টা আজও দেখা দেন নি। যে দিন দেবেন, সে দিন এই সব দর্শন, মনন, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তির ওপরই গড়ে উঠবে তাঁর সর্ব-স্বীকৃত কীর্তির ইমারত এবং আজকের এই সব খণ্ড-প্রতিভার অধিকারী কবি ও গল্পকাররা এক অখণ্ড সাহিত্য-নায়কের ভেতর হারিয়ে যাবেন। অবশ্য সাহিত্য সেদিন কি রূপ নেবে, এখনই সেটা অনুমান করে লাভ নেই। তবু এঁদের স্থান ও দানের মূল্য যে কম নয় এবং ভাবী

দিনের সাহিত্যকে যে এঁরাই এগিয়ে দিয়ে গেছেন। এ কথা আজ অন্তত আমরা স্বীকার করে রাখি। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগ সত্যি সত্যি একটা যুগ রূপে এসেছে, সে-যুগের জীবন ও মনন তার নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী চলতেও চাইছে, কিন্তু তা চালাবার মতো শক্তিশালী প্রতিভা এখনও ওঠেন নি।

তাই এ-যুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কি বলতে হলে, কোন একজন সাহিত্যিকের রচনার কথা বলা যায় না। বলতে হয় এক রাশ নাম। কেননা, as individuals they are not very much significant or important, but as a composite fraternity, they have produced a mass of poetry and story, that one can mark, not merely as good compositions, but as definite departure from the trodden path of our elders! অর্থাৎ এক-এক জন করে ধরলে, আধুনিক লেখকরা হয়ত বা খুব বড় খুব বেশী বিশেষত্বের অধিকারী হবেন না। কিন্তু সমগ্রভাবে একটা গোষ্ঠী হিসাবে তাঁরা যে-সব গল্প-কবিতা লিখেছেন, তা শুধু ভালো লেখা নয়, আমাদের পূর্বতনদের চলা পথ থেকে তা সম্পূর্ণ পৃথক পথের সৃষ্টি বলেও গণ্য হবার যোগ্য। বর্তমান ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরেজ সমালোচকের এই উক্তি দিয়েই রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের আলোচনার ওপর আপাতত উপসংহার দিচ্ছি। ভবিষ্যতে সময় ও সুযোগ হলে বিষয়টি নিয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করব, যার প্রাথমিক ভিত্তিটাই মাত্র স্থাপন করা রইল এই প্রবন্ধে।

জগদীশ গুপ্ত

জগদীশ গুপ্ত লোকান্তরিত হলেন। বয়স তার একাত্তর হয়েছিল। অভাব ও অস্বাস্থ্যে জীর্ণও হয়ে পড়েছিলেন তিনি খুব। তবু তাঁর মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না তাঁর বন্ধু ও গুণানুরাগীরা।

থাকবেন কি করে? এই সেদিনও যাঁর হাত থেকে 'বিষাক্ত বন্দরে'র মতো জোরালো লেখা বেরিয়েছে, তাঁর প্রাণের পুঁজি যে এত দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, এ ত ভাবা সম্ভব নয়। কিন্তু অভাব্য হলেও মৃত্যু হয়েছে জগদীশ গুপ্তের এবং বিধবা পত্নী ও স্বরচিত বইগুলি ছাড়া আর কিছুই পিছনে রেখে যাননি তিনি।

গৃহহীন, সম্বলহীন, সন্তানহীন জগদীশ গুপ্ত ছিলেন সর্ববন্ধন-বিমুক্ত সন্ন্যাসীর মতো। ব্যাধি তাঁকে কাতর করেনি, দারিদ্র্য বিচলিত করেনি। যে সম্মান ও স্বীকৃতি তাঁর চেয়ে অনুপযুক্তেরাও পেয়েছেন, তিনি পান নি, তার জন্যে কোন অনুযোগ করেন নি। নির্লোভ নির্লিপ্ত চরিত্র তাঁর। চোখে-মুখে ছিল এমন একটা সংযত প্রসন্নতা, যা দেখলে মন তৃপ্ত হত।

অথচ মানুষটি অন্তরে অন্তরে ছিলেন মহা বিদ্রোহী। সেই দুর্দান্তপণা, সমাজ, সংসার ও সংস্কারকে ভেঙে-চুরে মুক্ত মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা করার সেই পৌরুষ ফুটেছে তাঁর রচনায়। আজও মনে আছে, তাঁর দুঃসাহস-দৃপ্ত গল্পগুলি প্রথম বয়সে একদিন কি চাঞ্চল্যই সৃষ্টি করেছিল আমাদের চিত্তে। প্রাত্যহিক সংসারের সাজানো শালীনতা ও বিধি-নিষেধের গণ্ডী দিয়ে ঘেরা সামাজিক সম্পর্কের আড়ালে মানুষের জান্তব প্রকৃতি যে কি করতে, আর কতদূর যেতে পারে, তা উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন জগদীশ গুপ্ত তাঁর সেই সময়ের অধিকাংশ গল্পে।

এই জায়গায় অপরিসীম দুঃসাহসের সঙ্গেই ছিল তাঁর শিল্পী-সুলভ নিপুণ কারুকর্ম, যার ফলে কঠিন, রূঢ়, বিরস বা বিকৃত বিষয়-বস্তুকেও তিনি উঁচু আর্টের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। এটা পারেন নি সেই সময়ের অধিকতর খ্যাতিমান আর কোন কথা-সাহিত্যিকই। এই যেমন একটা দিক, তেমনি ছিল আর একটা দিকও। বাংলা কথা-সাহিত্যে তখনো ছিল মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক

শ্রেণীর প্রাধান্য। দীনহীন দেহশ্রমী মানুষদের, নিরক্ষর নির্বিত্ত কৃষক-কারিগরদের কথা বলেছিলেন বটে শরৎচন্দ্র। কিন্তু সে-বলায় দরদ এবং দাক্ষিণ্য থাকলেও, ব্যাপ্তি ছিল না, পরিমাণও তার কম। জগদীশ গুপ্তই আসরে নামালেন সেই সব মানুষকে, যাঁদের উঁচুতলার মানুষরা বলেন ছোটলোক, অথচ যাঁদের কাঁধে পা রেখেই জাঁকিয়ে উঠেছে সমাজের সমৃদ্ধির ইমারত, বড় হয়েছে সংস্কৃতি ও সভ্যতা।

এই সমস্ত আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত মানুষরাই দেশের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ, অথচ ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়, কামে-ক্রোধে, দুঃখে-সুখে, তাঁদের যে-জীবন তথাকথিত ভদ্রসমাজের চোখের আড়ালে বয়ে চলেছে দিনের পর দিন, তার বার্তা সেদিন রাখতেন খুব কম লোকই। এদের সঙ্কট-সমস্যা স্খলন-পতনকে সজাগ জহুরির মতো কুঁদে কুঁদে গল্পে রূপ দিয়েছেন জগদীশ গুপ্ত এবং এখানে তাঁর জুড়ীদার সেদিন ছিলেন না দেশে। হয়ত আজও নেই।

তৃতীয় দশকের যুবক মহলে সেদিন ফ্রয়েডবাদ ও মার্ক্সবাদের ব্যাপক চর্চা চলেছে, তা নিয়ে ভেবে-চিন্তে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসও করেছেন অনেকে। করেছি আমরাও। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত পড়ুয়া মানুষ ছিলেন না, যুগের হাওয়া হুজুগের পাখায় ভর করে এসে পৌঁছায়নি তাঁর কাছে। ভূয়িষ্ঠ অভিজ্ঞতা ও জীবন-বোধের সহজ প্রেরণাতেই তিনি ফ্রয়েডতত্ত্ব ও মার্ক্সতত্ত্বের মর্ম-লোক গভীর ভাবে স্পর্শ করেছিলেন তাঁর রচনায় : কিন্তু এখানেও তাঁর বিশেষত্ব ছিল, তিনি কোন বাদ-বিবাদের সঙ্গে আপাদমস্তক জড়িয়ে যাননি, নির্মল নির্মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন তাঁর শিল্প-দৃষ্টিকে চিরদিন। তাই নগ্নতম ক্ষুধা ও জঘন্যতম হিংস্রতাকে যেমন তিনি অকপট কলমে ফুটিয়েছেন, তেমনি ফুটিয়েছেন বর্বরতম অত্যাচার ও নির্মমতম শোষণকেও। অথচ কোথাও তিনি তথাকথিত প্রজ্ঞাবাদী নন, কোথাও পেশাদার প্রচারকের ভূমিকা নিয়ে বসেন নি। সবত্র তিনি শিল্পী, হয়ত একটু বেশী মাত্রায় বস্তু-সচেতন শিল্পী।

প্রকৃত বিপ্লবী ও প্রকৃত দার্শনিক ছিলেন বলেই, ঢোল-সহরতে তা প্রচারের দরকার হয়নি তাঁর। তবু বাইরের উদ্বেগশূন্য শান্ত আবরণটির তলায় তরঙ্গিত ছিল কি দুঃসহ আগ্নেয়গিরির দাহ, তা যখন ভাবি তখন সত্যিই অবাক লাগে আমার। দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব অল্প-বিস্তর থাকে সব মানুষেরই। কিন্তু জগদীশ গুপ্তের বাইরের মানুষ আর ভেতরের মানুষে গরমিল ছিল আগাগোড়াই।

এই ভেতরের মানুষটিকে চিনেছিলেন খুব কম মানুষই, আর এর স্বাক্ষর ফুটেছে যে-সাহিত্যে, তা-ও বুঝেছিলেন তাই খুব কম মানুষই। তাই তাঁর রচনা যতটা সমাদর পাওয়া উচিত ছিল, তা পায় নি দেশে। চটকদার বা মনোহারী কোন জিনিষ বের হয়নি তাঁর কলম থেকে। তিনিই আমাদের যুগে একমাত্র সাহিত্যিক, যাঁর সাহিত্য-সাধনার পুরোপুরি লক্ষ্য ছিল সমাজকে ভেঙে গড়া এবং মানুষের নূতন মূল্যায়ন করা। এই কাজে অদোসর এগিয়ে গেছেন তিনি এবং মুষ্টিমেয় দরদী ছাড়া সহযাত্রী বা সমব্যথী ছিলেন না তাঁর কেউ। তাঁর কোন বই কোন বিত্তশালী বা বিজ্ঞাপন-বদান্য প্রকাশক ছাপান নি। শ্রেষ্ঠ গল্প, স্বনির্বাচিত গল্প, গল্পপঞ্চক, অষ্টক বা দশক ছাপানেওয়ালারা কেউ কোনদিন কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নি তাঁর দিকে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারী বাংলায় যাঁরা সাহিত্য-ব্যাখ্যার নামে মোটা মোটা বর্ণনাত্মক গ্রন্থপঞ্জী লেখেন, সেই 'বিদ্বজ্জন' তাঁর লেখা কখনো পড়ে দেখেন নি। সিনেমা রাজ্যের শিল্প-প্রভুরা কোন দিন তাঁর বইকে রূপ দেননি। উপেক্ষিত এবং প্রায়-অপরিচিত থেকেই বিদায় নিয়েছেন তিনি পৃথিবী থেকে। অথচ ভাবুন ত, এ-দেশে কত অকিঞ্চিৎকরদের মাথায় নিয়ে নাচা হয়েছে এবং হচ্ছে আজও!

কতক মফস্বলের, কতক বা কলকাতার ছোট-খাটো প্রকাশকরা বের করেছিলেন তাঁর বই-পত্র, যার প্রায় সবই প্রথম সংস্কারণান্তে আর আলোর মুখ দেখেনি। জানি না, ক-জন তাঁর 'রতি ও বিরতি', 'স্মৃতিনী', 'লঘু-গুরু', 'মেঘাবৃত অশনি', 'গতিহারা জাহ্নবী,' 'অসাধু সিদ্ধার্থ', 'দুলালের দোলা', 'পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক', 'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা', 'শ্রীমতী বিনোদিনী', 'তৃষিত সৃক্কণী' প্রভৃতি বই দেখেছেন বা পড়েছেন! সুখের কথা যে বসুমতী এর কিছু অংশ নিয়ে বছর দুই হল একখানি গ্রন্থাবলী বের করেছেন। নইলে সবই লুপ্ত হয়ে যেত হয়ত এবং যাঁর সন্তান নেই, দল নেই, শক্তিশালী প্রকাশক নেই, তাঁকে জীইয়ে রাখার গরজ কার এ-দেশে? প্রতিভার কথা বলছেন? প্রতিভার সম্মান যখন এ-দেশে পণ্ডিতরাই দেন না, তখন প্রকাশকরা দেবেন কোন দুঃখে? তাঁরা ত পরোপকার করতে বসেন নি!

তবু আশা রইল, কোন উদ্যোগী প্রকাশক জগদীশ গুপ্তের রচনার মধ্যে যা নিঃসংশয়িত রূপে প্রথম শ্রেণীর, এমন সমস্ত গল্প-উপন্যাসের একখানি সংগ্রহ প্রকাশ করবেন। রবীন্দ্র-শরৎ অধ্যায়ের পর বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট একজন

স্রষ্টা নর-নারীর সম্পর্ককে, দেশের দারিদ্র্য ও সামাজিক ব্যাধিকে, মানুষের জৈব-কামনা এবং জীবনাতীত অনন্ত তৃষ্ণাকে কি চোখে দেখেছিলেন, কি ভাষায় ও কোন মূর্তিতে এঁকেছিলেন, তার নিদর্শন রূপে সে-বই বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হবে। স্মরণীয় হবেন জগদীশ গুপ্তও।

পঁচিশ বছরের অধিক কাল আমার বান্ধবতা জগদীশ গুপ্তের সঙ্গে। বয়সের বিচারে আমি প্রায় পুত্র হতে পারতাম তাঁর। কিন্তু আত্মভোলা উদার শিল্পী প্রিয় বয়স্য রূপে গ্রহণ করেছিলেন আমাকে। আজ সে-কথা স্মরণ করে সত্যিই কান্না আসছে। আজ মনে পড়ছে তাঁর সেই কটি কথা, যা তিনি একখানি পোষ্টকার্ডে একবার লিখেছিলেন—

দুঃখ কষ্ট এ জীবনে চিরস্থায়ী নয়,
আজ হক কাল হক হবে তার ক্ষয়।
তবু সেই ভাগ্যবান, যার যথাকালে,
দুঃখ-অন্তে সুখোদয় সম্ভব কপালে।
আমি নয় সেই দলে তাতে নেই ক্ষতি,
অশ্রুর কমলে পূজি দুঃখ-সরস্বতী।

যতীন সেনগুপ্তের কবিতা

॥ ১ ॥

বহুদিন আগে যতীন সেনগুপ্তের 'কাব্য-পরিমিতি' বইয়ের সমালোচনা উপলক্ষে লিখেছিলাম, রবীন্দ্র-যুগে শক্তিমান কবির সংখ্যা কম নয়, প্রকৃত প্রতিভাধর কবিও আছেন কয়েকজন। কিন্তু বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা চিহ্নিত কবির সংখ্যা বেশী নয়। সেই বিরলদর্শন কবিদেরই একজন যতীন সেনগুপ্ত। তাঁর ভাষা নিজস্ব, বিষয়-বস্তু ও বাচন-ভঙ্গী নিজস্ব, কোন অবস্থাতেই তা রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবিতার অরণ্যে হারিয়ে যায় না।

প্রায় বাইশ বৎসর পরে আজ যখন তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন, তখনও তাঁর সম্বন্ধে সর্বাগ্রে ও সব চেয়ে বড় গলায় এই কথাটাই বলা চলে। যদিও এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাংলা দেশে কবিতার বিষয়, ভাষা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পুরানো দিনের নিরিখ গেছে আগাগোড়া পাল্টে এবং একদিন যে-সব কবিতা জনপ্রিয়তার হাটে চড়া দামে বিকাত, আজ তার বেশীর ভাগই প্রবহমান জন-রুচি থেকে স্খলিত হয়ে বকেয়ার তালিকাভুক্ত হয়েছে। এই যুগ-বিপর্যয়ের ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যেও যতীন সেনগুপ্তের কবিতা টিঁকে গেছে এবং তাতেই প্রমাণ হয় যে তা সত্য বস্তু।

আমাদের কৈশোর কালে রবীন্দ্রানুবর্তী কবিদের মধ্যে যাঁরা সামনের সারির লোক ছিলেন, তাঁদের চোখও এমন ভাবেই রবীন্দ্র-প্রভায় ধাঁধিয়ে গিয়েছিল যে তাঁরা নিজের চোখে দুনিয়াকে, দুনিয়ার সুখ-দুঃখকে দেখতেই পারতেন না। সে-দর্শনকে নিজের মতো ভাষায় ব্যক্তও করতে পারতেন না। ফলে আমাদের কাব্যের দুনিয়াটাই যেন বিরাট একটা রবীন্দ্র-সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। এই আবেষ্টনীতে কবিতা-সৃষ্টির ব্যর্থতা জয় করার প্রয়োজন কবিরা অনুভব করেছিলেন এবং সেই অনুভূতি থেকেই এসেছিল সত্যেন দত্তের ছন্দো-বৈচিত্র্য, কালিদাস রায়ের ক্ল্যাসিকানুরাগ, করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন ও যতীন বাগচীর পল্লী-প্রীতি। এ সবই যে রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে পাশ কাটিয়ে কাব্য-সৃষ্টির প্রয়াস এবং সার্থক প্রয়াসই, তাতে আর সন্দেহ নেই।

তবু নূতন ও নিজস্ব জীবন-দর্শন নিয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ কবির স্বাধিকারে দেখা দেননি তাঁরা কেউ। সেই নূতন কবি হলেন মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম ও যতীন সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়াতীত শাশ্বত প্রেমবাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে, মোহিতলাল শোনালেন জাগ্রত জৈব-কামনার বাণী, তাঁর পৌরুষদীপ্ত ভাষায়। নজরুলও প্রেরণা সংগ্রহ করলেন এই বলিষ্ঠ ভোগাত্মবাদের দর্শন থেকেই, যদিও তাঁর দৃষ্টি ক্রমে আদিরসের জগৎ থেকে সমাজ ও রাজনীতির জগতে এসে মুক্তির আদর্শ খুঁজে পেল। যতীন সেনগুপ্ত এ দুই কবি থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর কবিতায় মোহিতলালের মতো প্রচণ্ড জীবন-পিপাসার স্পর্শ নেই, নজরুলের মতো যৌবন-চেতনার উত্তাপ নেই, তবু তিনি এ দু-জনের সঙ্গে এক বন্ধনীভুক্ত এবং নিজস্ব দর্শন ও বাগ-বৈদগ্ধ্যের বিচারে তিনিই হয়ত তিন জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

॥ ২ ॥

কিন্তু সে-বিচার বর্তমান প্রসঙ্গে বোধহয় অনাবশ্যক। আমরা শুধু কবি হিসাবে যতীন সেনগুপ্তের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলছি।

বলা বাহুল্য যতীন্দ্রনাথও বিদ্রোহী কবি। জীবনের সমস্ত বেদনা, ব্যর্থতা, অপচয় ও অসমন্বয়কে তিনি দেখেছেন বিরাট একটা প্রহসন রূপে। প্রচণ্ড একটা খাম-খেয়াল, একটা দায়িত্বহীন, মমতাহীন, দূরদৃষ্টিহীন অব্যবস্থা যেন এই বিশ্ব-ব্যাপারের স্তরে স্তরে ফুটে রয়েছে! সংসারের সমস্ত দুঃখ, সব-কিছু দুর্যোগ ও বিপদ উৎসারিত হচ্ছে যেন সেই আদি-সূত্র থেকে। অতএব বুদ্ধির তূণে তাঁর যতগুলি শাণিত যুক্তির তীর ছিল, এক এক করে প্রত্যেকটা তিনি নিক্ষেপ করেছেন এই খাম-খেয়ালীপনার আধারকে হুঁশিয়ার করার জন্যে। কিন্তু সেটা কি বা কে? বলা নিষ্প্রয়োজন যে তা ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কিছু নয়। যতীন সেনগুপ্তের সারা জীবনের কবিতাতেই আছে এই সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে বিরামবিহীন বোঝাপড়ার প্রয়াস।

কখনো ন্যায়ের তুলাদণ্ডে তিনি তার বিচার করছেন, কখনো ব্যঙ্গের ছুরিকাঘাতে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করছেন, কখনো রূঢ় অভিমানের ইষ্টকাঘাতে

তাকে খেদিয়ে দিচ্ছেন দূরে, অনেক দূরে। অর্থাৎ তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ত বটেই, ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বেও বিশ্বাসী। কিন্তু সেই মঙ্গলময়ত্ব পার্থিব সংসারে কোন সময় পরিস্ফুট হয় না বলেই, তিনি ব্যথাহত এবং সে-ব্যথাই মূর্ত হয়েছে তাঁর বৈরিতা ও বিপরীতমুখী মনোভাবের মধ্যে দিয়ে। চলতি অর্থে যাকে নাস্তিক বলে, তা তিনি ছিলেন না। কিন্তু কেন ছিলেন না, সেটাই বিস্ময়ের কথা। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র, পেশাতেও ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। মনের গঠনও ছিল তাঁর ষোল-আনা যুক্তিমুখী। অথচ বস্তু থেকেই প্রাণের উদ্ভব এবং চেতনা প্রাণেরই স্বধর্ম, অতএব তা প্রাকৃতিক, পরমার্থিক নয়, এ কথা তিনি কোন দিন বলেন নি। ঐতিহাসিক বাস্তবতার দিক থেকে যাচিয়ে মানব-সংসারের বেদনা, দুঃখ ও দুর্ভাগ্যকে তিনি বুঝতে ও বোঝাতেও চাননি কোন দিন। এই জন্যেই তাঁর বিদ্রোহ হল বিশ্বামিত্রের বিদ্রোহ, চার্বাকের বিদ্রোহ নয়। তা সনাতনতার বিরোধী বটে, কিন্তু সনাতন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নয়।

এটা ভালো করে বোঝার দরকার এই জন্যে যে কেউ-কেউ তাঁকে ঈশ্বরাস্তিত্বে অবিশ্বাসী ও বস্তুবাদী বলে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, যা তিনি মোটেই ছিলেন না। সংসারের যেখানে যা আছে, তারই মূল্যমান কষেছেন তিনি দুঃখের কষ্টি-পাথরে এবং খাঁটি সোনা বলে পরিচিত অনেক কিছুই হয়ে পড়েছে নিছক ধুলো-মাটি তাঁর সেই বিচারের কাছে। এ-ই হল তাঁর দুঃখবাদ, যা রাবীন্দ্রিক আনন্দবাদের বৈমাত্র বোন। এই দুঃখবাদ কবির হৃদয় থেকে উৎসারিত, না এ তাঁর মস্তিষ্ক-প্রসূত, সে-প্রশ্ন তুলেছেন কেউ-কেউ এবং তা তোলার কারণ তাঁর ভাষার পেলবতাহীন, প্রসাদগুণ-বর্জিত রুক্ষ গ্রান্থিল রূপ। সহজ ও স্বয়ং-প্রবাহিত অনুভূতির রূপ এমন হয় না, এই কথাই বলেছেন তাঁরা। কিন্তু মসৃণ সহজতাই যে কবিতার একমাত্র কুললক্ষণ, তার প্রমাণ কি? আমি ত বরং যতীন সেনগুপ্তের নিজস্ব দর্শন ও মননের সঙ্গে তাঁর ভাষার এই বক্র কঠিন ভঙ্গীটাই তাঁর বিশিষ্ট শক্তির পরিচয় বলে মনে করি এবং এ জন্যেও তাঁকে প্রতিক্রিয়া যুগের মুখ্য কবি বলে গণ্য করি।

॥ ৩ ॥

যতীন সেনগুপ্ত তাঁর কবিতায় নিগৃহীত ও বঞ্চিত মানুষকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিয়েছেন। হাড়ি মুচি ডোম চামার, চাষী ঘরামি কুমার কামার, সমস্ত

দেহশ্রমী মানুষই ন্যায্য মানুষের অধিকারে তাঁর কাব্য-লোক আলো করে আছেন, রবীন্দ্র-সৃষ্ট সৌন্দর্য, প্রেম ও বিশ্ব-কল্যাণাত্মিক আদর্শবাদের আবহাওয়ায় এ বড় কম কথা নয়। প্রথম বয়সে তাই এ জন্যে স্বাভাবিক কারণেই একটু অতিশয়োক্তি করেছি আমরা যতীন সেনগুপ্ত সম্বন্ধে। আজ বুঝি, যতীন সেনগুপ্তের কাছে এটা অভাবনীয় ছিল না। তাঁর মতো জীবন-সচেতন কবি, যিনি মৃদঙ্গ ধ্বনির মধ্যে মৃত পশুর (যার চামড়া দিয়ে মৃদঙ্গ তৈরি) আর্তধ্বনি শোনেন, তাজমহলের শুভ্র সুষমার আড়ালে দেখেন প্রেমহীন পুরুষের উদ্ধত আত্মাভিমানের তাজা লাল রং, মানুষ যাঁর মতে অফুরন্ত জীবন-বেদনার বুদ্বুদ মাত্র, তিনি যে সংসারের সর্বাধিকার বঞ্চিত সমস্ত হতভাগ্যের প্রতিনিধি রূপে মাথা তুলে দাঁড়াবেন, এ-ই ত স্বাভাবিক!

মানুষকে বাদ দিয়ে ত দুঃখের অস্তিত্ব কোথাও নেই। কাজেই দুঃখবাদী যিনি, মানব-বাদী তাঁকে হতেই হবে, আর মানব-বাদের মানেই হল সর্ব-মানবিক মমত্ব। কাজেই এখানে যতীন সেনগুপ্ত তাঁর আপন মনোধর্মকেই অনুসরণ করেছেন। অবশ্য তা করেছেন কতকটা সত্যেন দত্ত এবং নজরুলও। কিন্তু এই মূক মানুষদের অসীম দুঃখ-দুর্দশার প্রতিবাদে আদা-জল খেয়ে বিধাতার সঙ্গে বিবাদ করার দ্বারা কবি কি এই কথাই প্রতিপন্ন করছেন না যে এই ভেদ, এ দুর্ভাগ্য তাঁর মতে অনতিক্রম্য? বস্তুময় সংসারের বাস্তব বিধি-বিধানের ভেতর তিনি এর কোন সমাধানই খুঁজে পাচ্ছেন না কোথাও?

বিংশ শতাব্দীর মানুষ কিন্তু এই বিভেদ ও বঞ্চনাকে অপসারিত করার উপায় দেখেছে অন্য পথে। সে-পথ বুদ্ধিবাদী যতীন সেনগুপ্তকে আকৃষ্ট করেনি পুরোপুরি। বোধহয় রবীন্দ্র-গান্ধী প্রভাবের মধ্যাহ্নে সেটা সম্ভবও ছিল না। তবু অহেতুক দরদে বাস্তবকে সমাচ্ছন্ন করে, মূল সমস্যা এড়িয়ে যান নি তিনি। অকপট কঠিন ভাষণে বরং অন্তরের সত্য-বোধকে বার বার অনাবৃত করেই দেখিয়েছেন, যা তাঁর সম-সাময়িকরা আর কেউ করেন নি। যে-ক্ষুধা-তৃষ্ণা জীবন থেকে জন্মায়, তাকে জীবনাতীতের হেঁয়ালি দিয়ে অস্বীকার করার বা অরূপ অসীমের পরমান্নে তৃপ্ত করার ছেলেমি তাঁর কলমে প্রশ্রয় পায় নি। পৃথিবীকে তিনি দেখেছেন সাদা চোখে, তাঁর অনুভূতি ও বক্তব্যের মধ্যে তাই জাগ্রত পৃথিবীর কথাই প্রতিফলিত হয়েছে। তাই তিনি মানুষের কবি,

বাস্তবের কবি। বাংলা কাব্যের সাম্প্রতিক পরিণতির পথে তাঁর এই ভূমিকার দাম যে অনেক, এইটুকু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি—

হেরো গো হেথায় হাপর হাঁপায়,
হাতুড়ি মাগিছে ছুটি।
ক্লান্ত নিখিল এবার শিথিল
করো গো বজ্রমুঠি॥

নজরুল কথা

প্রতি বৎসর নজরুল ইসলামের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁর বাড়ীতে ছোটখাটো একটা উৎসব হয়। অনেকে যান কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে। আমি কোনদিন যাইনি। আমার মনশ্চক্ষে স্বাস্থ্যদীপ্ত প্রাণবন্ত যে নজরুল জাগরুক আছেন, তাঁর স্থানে আজকের এই হৃত-চেতন ব্যাধি-বিকল নজরুলকে বসার আসন ছেড়ে দিতে আমার ব্যথা লাগে।

ঢের দিন হয়ে গেল, বোধহয় ত্রিশ-বত্রিশ বছরই হবে। স্বর্গীয় হেমন্তকুমার সরকার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন নজরুলের সঙ্গে। নজরুল তখন থাকতেন বিবেকানন্দ রোড থেকে নিষ্ক্রান্ত ছোট্ট একটি রাস্তায়, তার নাম জেলেটোলা। তাঁর বাসা ছিল একটু ভিতরের দিকে। আর ঠিক বড়-রাস্তার মুখের ওপর ছিল তাঁর বুলবুল সঙ্গীত বিদ্যালয়। বুলবুল তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র, তার অকাল মৃত্যুর বেদনাই পরিস্ফুট হয়েছিল এই বিদ্যালয়ের নামকরণের মধ্যে।

এই বাড়ীতে আমি মাসে একবার দু-বার, কখনো কখনো তিনবারও যেতাম। সাধারণত যেতাম বিকালের দিকে। দুপুরে আহার ও অল্প একটু দিবানিদ্রার পর উঠে নজরুল দোতলার ঘরে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করতেন, তারপর কখনো একলা, কখনো সদলবলে, গ্রামোফোন কোম্পানীতে যেতেন।

স্কুলের পড়ানো শেষ হলেই সরাসরি চলে আসতাম আমি তাঁর কাছে। কথা-প্রসঙ্গে হঠাৎ একদিন নজরুল বললেন, আচ্ছা, যখনি আসো, ঠিক এক সময়ে আসো। ব্যাপারটা কি বলো ত?

বললাম, স্কুলে পড়াই ত। ছুটি হলেই সোজা বাসে উঠে পড়ি। এক দৌড়ে কালিঘাট থেকে বিবেকানন্দ রোড চলে আসি।

আর কোথায় যাবে? হাঁক-ডাক করে তখনি জল খাবার আনিয়ে, টেনে বসালেন তিনি থালার সামনে। বললেন, খালি পেটে কাব্য-চর্চা হয় না হে ভায়া!

এই থেকে রেওয়াজ হয়ে গেল, আমি গেলেই এক থালা খাবার। কখনো কবি-পত্নী স্বয়ং দিয়ে যেতেন, কখনো তাঁর জননী।

কবি-পত্নী বৈদ্যকন্যা, আমিও বৈদ্য। এটা ছিল নজরুলের একটা নিয়মিত কৌতুকের বিষয়। গৃহিণীকে বলতেন, গোপাল তোমার ভাই, অতএব আমার কে হল বলো ত?

এই আসরে নজরুল তাঁর সদ্যরচিত গান গেয়ে শোনাতেন। সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম, নানা বিষয়ে তাঁর মতামত বলতেন। হো-হো করে হাসতেন, কৌতুকে কোলাহলে চারদিক মাতিয়ে তুলতেন।

আলোচনা তাঁর খুব গভীর বা অন্তর্ভেদী হত না। ধারালো শব্দ এবং অধিকতর ধারালো ব্যঙ্গের সাহায্যে তিনি প্রতি-পক্ষকে ঘায়েল করতে চাইতেন। তবে তর্কে হারলে, উদার ভাবে পরাভবও স্বীকার করতেন তিনি। হেসে বলতেন, যানে দেও কণ্ডাক্টর!

রবীন্দ্র-ভক্তিতে তিনি ছিলেন সবার ওপরে। কবিতা-প্রার্থী জনৈক সাপ্তাহিক-সম্পাদক একদিন তাঁকে বলেন, গানে আপনিই রাজা। বোলপুরী ভক্তরা যাই বলুন···

এক ধমক দিয়ে উঠলেন নজরুল। বললেন, আমরা যদি কেউ না জন্মাতাম, যদি এক লাইনও কেউ না লিখতাম, বাংলা দেশের কোন ক্ষতি হত না। ঐ একটি মানুষই চিরদিনের মহড়া রাখতেন।

বলেই এক-তাড়া কবিতা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, যেটা ইচ্ছে নিয়ে যাও। কিন্তু ও রকম অপরাধের কথা আর কোনদিন মুখে আনবে না। রবীন্দ্রনাথের গান···ও বেদমন্ত্র!

সে-সময় তিনি একটি গ্রামোফোন কোম্পানীর একমাত্র সঙ্গীত-লেখক ছিলেন। প্রতিদিনই তিনি গান লিখতেন, একটা, দুটো, তিনটে। গান লেখায় একদিনের জন্যেও যেমন বিরাম ছিল না তাঁর, বৈচিত্র্যের তেমনি অন্ত ছিল না সে-সব গানে। কখনো কীর্তন, কখনো শ্যামা-সঙ্গীত, কখনো গজল, কখনো বা আধুনিক ধারার প্রেম-সঙ্গীত। মাঝে মাঝে লিখতেন জাতীয় সঙ্গীতও। তবে তার ঝোঁকটা তখন কম।

সব গানেরই তিনি নিজে সুর দিতেন। টেবিল বাজিয়ে বা উরুত চাপড়ে গুন-গুন করে ভাঁজতেন গানের পদগুলি, তারপর সবটা তৈরি হয়ে গেলে, গাইতেন গলা ছেড়ে। আর তখনি কাগজ-কলম নিয়ে খস খস করে লিখে ফেলতেন গানটি। পরিষ্কার ঝকঝকে গোটা গোটা অক্ষর, কোথাও

কাটাকুটি হত না লেখায়। লিখতে দেরী হয়ে গেলে হয়ত দু-এক কলি ভুলে যেতেন। তার ফলে খণ্ড গানটিকে অনেক সময় আর খাড়াই করতে পারতেন না। হতাশ হয়ে বলতেন, যাঃ পালাল!

এই পলাতক গানের কলি নিয়েই একদিন বেঁধে ফেললেন এক গান: পালাল, পালাল, ধর, আমার চপল গানের পরী! আর একদিন ফরমায়েস এসেছে কীর্তন বাঁধতে হবে। মনে সুরও এসেছে। গলায় কিন্তু কথা আসেনি তখনো। ইতিমধ্যে হাজির হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠলেন, চির আনন্দে নন্দিত, ওগো নন্দগোপাল...

চব্বিশ ঘণ্টা এমনি একটা গানের মৌজে আবিষ্ট থাকতেন তিনি। গুন-গুন করে সুর ভাজতেন, আর পান চিবুতেন। কখনো ভাবতে হত না, সুর বা শব্দের জন্যে কোন সময় থামতে হত না। পাখীর গলায় যেমন অনায়াসে গান আসে, নজরুলের গলায়ও ঠিক তাই আসত।

বেলঘরিয়ার এক বাগান-বাড়ীতে কবি যতীন বাগচীর সম্বর্ধনা হল। অনেকের সঙ্গে নজরুলও এলেন তাতে নিমন্ত্রিত হয়ে। সবাই আমরা টুকিটাকি লেখা পড়লাম, না-হয় বক্তৃতা দিলাম। নজরুল সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করলেন এক গান এবং দরাজ গলায় তা গেয়ে মাৎ করে দিলেন আসর:

তোমার চলা শ্যাম বনপথ
কদম-কেশর কীর্ণ,
কেয়ার বনের খেয়াঘাটে হলে
গোপনে কি অবতীর্ণ?

মাথা-ভরা অজস্র ঘন কালো চুল, প্রচুরায়ত উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, মুখ-ভরা পান, তারি সঙ্গে অফুরন্ত হাসি, অফুরন্ত গান...এই ছিলেন সেদিনের নজরুল। তাঁর বাড়ীর দরজা যেমন, হৃদয়ের দরজা তেমনি, অবারিত ছিল সকলের জন্যে। অনেক উঁচু-দরের মানুষেরও দেখেছি, হিন্দুর মনে মুসলমান সম্বন্ধে এবং মুসলমানের মনে হিন্দু সম্বন্ধে যেন একটু কেমন-কেমন ভাব থাকে। সেটা ছিল না তাঁর মোটেই। হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব অতিক্রম করে সার্থক মনুষ্যত্বে উন্নীত হয়েছিলেন তিনি, এটা বেশ ভালো ভাবে যাচাই করেছি। নজরুলের উপদেশেই আমি কোন বিখ্যাত নেতার মোহম্মদ-জীবনী বিষয়ক বইটি পড়ি।

বইটির আলোচনা করতে করতে একদিন বলি, এত বড় পণ্ডিত শেষপর্যন্ত কি করে অমন কাঠমোল্লা হলেন?

নজরুল হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, কাঠ না, কাঠ না, অকাঠ মোল্লা। রাজনীতি, রাজনীতি! রাজনীতি মানুষকে ঐ রকম টেনে নামায় রে ভাই!

একদিন গোপেন নামে এক অটোগ্রাফ-সন্ধানী বালককে নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। তার হাত থেকে খাতাখানি নিয়ে তিনি ঝাঁ-ঝাঁ করে লিখে চললেন,

গোপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য,
করেন বহু মহৎ কার্য।
পূজা-আহ্নিক, গঙ্গাস্নান,
ঘি-সৈন্ধব আতপ খান!
গোপেন কিনা, তাই অবিশ্যি,
গোপনেতে হয় হবিষ্যি
সীতা-পতি পক্ষী যোগে,
কেউ জানে না পাড়ার লোকে…

এমনি একটা লম্বা কবিতা। কি হিন্দু, আর কি মুসলমান, ধর্মের ব্যাপারে কোন তরফেই ছিল না তাঁর অণুমাত্র গোঁড়ামি বা পক্ষপাত। দু-দলকেই বেদম ঠাট্টা করতেন, কথায়, কবিতায়, গানে।

কিন্তু কি যে হল, হঠাৎ কালী-সাধক হয়ে পড়লেন নজরুল। একদিন শুনলাম, কোন বিখ্যাত মজুমদারের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন তিনি এবং গলায় জবা ফুলের মালা ও কপালে সিঁদুরের টিপ পরে তিনি নাকি শ্মশানে বসে ধ্যান করেন।

শুনে ভালো লাগল না। কৌতূহল নিয়ে দেখতে গেলাম তাঁকে। দেখলাম যা শুনেছি, একেবারে মিথ্যে নয় তা। এরপরই হু-হু করে বদলে গেল তাঁর সমস্ত ধরণ-ধারণ। হাসি-খুসী কমে গেল। কথা-বার্তার মাঝখানেই কেমন যেন এক-এক সময় আনমনা হয়ে থাকতে সুরু করলেন। এক-আধটা কথাও তাঁর যেন অসংলগ্ন ঠেকতে লাগল। অর্থাৎ ধর্ম-বাতিকে পেল তাঁকে।

একদিন বললাম, কাজীদা, তুমি কবি। কাব্য-সরস্বতী ছাড়া আর কোন দেবতার কাছেই বিবেক বন্ধক দিও না।

হঠাৎ রেগে উঠলেন। বললেন, পড়া-শোনা বিস্তর করেছ ভাই। কিন্তু পড়া-শোনায় সব জিনিষের নাগাল পাওয়া যায় না। এমন ঢের বস্তু আছে, যা সারা জীবন তপস্যা করেও হাতে পাওয়া যায় না।

অবাক লাগল। আস্তে আস্তে ব্যবধানের পর্দা পড়ে গেল এখানেই। সে পর্দা সুদীর্ঘ কালেও আর সরাতে চেষ্টা করিনি। আমার মানস-কল্পনায় তাই জাগ্রত জীবন্ত গায়ক-কবি নজরুলই অক্ষয় হয়ে আছেন এবং আছেন তাঁর যৌবন মূর্তিতে। এ মূর্তির রূপান্তর হতে দিইনি আমি। হতে পারে এ আমার একটা দুর্বলতা। কিন্তু মানুষ ত দুর্বলতার উর্ধ্বে নয়!

বাস্তবিকই আমি মনে কবি, নজরুলের যদি কোন পরিচয় সত্যি হয় ত সে তাঁর যৌবন-পরিচয়। এমন জলজ্যান্ত জোয়ান দুই-তিন দশকের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে আর কেউ ছিলেন না! অমন অকারণ অবারণ হাসি কারোকে হাসতে দেখিনি। অমন দরাজ দিল-দরিয়া ধরণ, অমন অনায়াসে অন্যায় করার সাহস এবং তা অকপটে স্বীকার করার অধিকতর সাহস, এ-ও কারো দেখিনি।

সেদিন দেশে যাঁরা তরুণ সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন জন্ম-প্রবীণ। জগৎ ও জীবনকে তাঁরা সুরু থেকেই দেখতে আরম্ভ করেন কেমন এক বিষণ্ণ ধূসর মূর্তিতে। সে-দৃষ্টিতে তৃষ্ণা ছিল, নৈরাশ্য ছিল, দার্শনিকতা ছিল, ছিল না বাস্তবতা। ছিল না এতটুকু রৌদ্রোজ্জ্বল সত্য-উপলব্ধির দীপ্তি, যা সমস্ত বেদনা-বঞ্চনার উপর জয়ী হয়ে ওঠে। আসলে বইয়ের পাতা থেকে ফ্রয়েডীয় অবচেতনা বাদ ও মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে সাহিত্যের আসরে এনে পত্তন করেছিলেন তাঁরা। জীবনের উত্তাপে সত্যি হয়ে ওঠেনি এই নূতনের পত্তন, যদিও তা-ই সৃষ্টি করেছিল সেদিন বাংলা সাহিত্যে প্রবল একটা বাঁধ-ভাঙার আন্দোলন।

এই জায়গায় নজরুল কিন্তু আশ্চর্য ব্যতিক্রম। তাঁর উপলব্ধির দুনিয়া সীমাবদ্ধ, অনুভূতির গণ্ডীও অগভীর। কিন্তু তার ভিত্তি অকৃত্রিম। সত্যিকার উপলব্ধি ও সত্যিকার জীবন-বোধকেই তিনি প্রচুরায়ত প্রাণের আবেগে ব্যক্ত করেছেন। সে-প্রকাশে কোথাও হয়ত অহেতুক দৌড়ানোর, কোথাও বা প্রত্যাশিত কারণেই খুঁড়িয়ে চলার চিহ্ন ফুটেছে। কিন্তু জিনিষটা মেকী নয়।

এর দুটো কারণঃ এক, নজরুলের ছিল একটা নিজস্ব রাজনীতিক জীবন-দর্শন, দেশকে, সমাজকে, মানুষকে, যার প্রেরণায় তিনি ছোট্ট বেলা থেকে সত্য-রূপে দেখতে শিখেছিলেন। আর, তাঁর ছিল একটা সহজাত কবি-ধর্ম, যা অতি-অধ্যয়ন ও চিন্তনের চাপে আবিল হতে পারেনি।

এ দুইয়ের বর্গফল রূপেই তাঁর লেখায় এসেছিল যেমন পর্যাপ্ত মানবাত্ম-বোধ, তেমনি পর্যাপ্ত পৌরুষ ও প্রাণোচ্ছলতা।

হয়ত তাঁর জোর ও দুর্বলতা দুইয়েরই মূল এখানে। তবু এই ছিল তাঁর বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্বের জন্যেই যদিও বয়সের হিসাবে তিনি মোহিতলাল ও যতীন সেনগুপ্তের প্রায় গা-ঘেঁষা ছিলেন, কিন্তু মনোধর্মের হিসাবে ছিলেন আমাদের সহযাত্রী। চুপি চুপি বলি, নজরুল মার্ক্সবাদ পড়ে রপ্ত করেননি, কিন্তু মননশীলতায় তিনি ছিলেন প্রায় মার্ক্সপন্থী। অবশ্য কবি নজরুল।

আগেই বলেছি, এই কবি নজরুলই আমার কাছে সত্যিকার নজরুল। সেই সময়ের এক জন্মতিথি উপলক্ষে আমি যে-কবিতা লিখেছিলাম তাঁর উদ্দেশে, সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানেও আমার বিচারে সেটাই প্রকৃত নজরুল প্রশস্তি, কারণ তারপরের মানুষটিকে আমি আর দেখি নি। আজকের যে নজরুল, তাঁকে তাই আমি চিনিই না!

জুলাই ১৬, ১৯৬১

জীবনানন্দ দাশ

জীবনানন্দ দাশ লোকান্তরিত হয়েছেন। এত শীঘ্র এবং এমন সাংঘাতিক দুর্ঘটনায় তাঁর জীবনাস্ত হবে, এ কোনদিন ভাবিনি। নির্বিরোধ, উদাসীন, শান্ত প্রকৃতির মানুষ জীবনানন্দকে কার না ভালো লাগত? আজকের মতো বাদানুবাদ ও হৈ-হট্টগোলের দিনেও সব গোলযোগের ওপর দিয়ে তিনি যেন আলতো পায়ে হেঁটে যেতেন। অনেকটা যেন আপন অনুভূতির মধ্যে বাস করতেন। সেই অনুভূতি থেকেই উৎসারিত হয়ে আসত তাঁর কবিতা, তা-ও ছিল তাঁরি মতো উদাসীন প্রকৃতির, শান্ত, স্নিগ্ধ এবং রহস্য-মধুর। যে-যুগে কবিতার রাজ্যে বিষয়-বস্তু নিয়ে, ভাষা-ভঙ্গী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই—রসের আবেদন, না বুদ্ধির সঞ্জীবন, কোনটা কবিতার আসল উপজীব্য, তা নিয়ে যেদিন কবিদের মধ্যে এসেছে দ্বিধা, সেদিন জীবনানন্দ একাগ্র নিষ্ঠায় তাঁর স্বধর্ম আঁকড়ে থেকেছেন, বকেয়া বলে নিন্দিত হবার ভয় করেননি, নগদ করতালির লোভেও প্রলুব্ধ হন নি, এ তাঁর অসামান্য স্বয়ং-সম্পূর্ণতার নিদর্শন। এই জিনিষের অভাবে অনেক প্রতিভাবানই আজ ধর্মচ্যুত হয়েছেন, জীবনানন্দ হননি. তার কারণ এই নির্লিপ্ত, নির্মলচিত্ত মানুষটি আসলে দুর্বল ছিলেন না। তাঁকে ভালোবাসতাম, তাঁর এই অনুপম ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের জন্যে।

বিশ বছরেরও আগে যখন তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়, অন্তরঙ্গ মহলে তখনি তিনি মহৎ কবি বলে স্বীকৃত হয়েছেন, যদিও বৃহত্তর সমাজে তখন তাঁর গুণগ্রাহীর চেয়ে দোষান্বেষীর সংখ্যাই বেশী ছিলেন। বিরোধী সমালোচকরা বলতেন, তাঁর কবিতায় অর্থের সঙ্গতি নেই, ভাবের ধারাবাহিকতা নেই, চিত্রের পারম্পর্য নেই। অর্থাৎ তাঁর কবিতায় কোন বক্তব্যের দিশা পাওয়া যায় না। এই সঙ্গে সুনীতি-প্রতিকূলতার অভিযোগও উঠত সময়-সময়। সুখের বিষয়, এই বিরুদ্ধ সমালোচনা ও অপ-ভাষণের ব্যূহ ভেদ করেই, জীবনানন্দ পাদ-প্রদীপের সামনে এগিয়ে আসতে এবং সার্থক কবির স্বাধিকার স্থাপন করতে পেরেছিলেন। দেশকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে কবিতা শুধু তথা-কথিত অর্থ ও বক্তব্য-নির্ভর নয়, রং ও সুরের মাধ্যমে তা শব্দার্থ অতিক্রম করেও

আশ্চর্য এবং অনির্বচনীয় রসসৃষ্টি করতে পারে। সুরু থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, এই অনুপম রসের পণ্য পরিবেষণ করেই তিনি সর্বজনের কবি হয়েছিলেন। যে-যুগে গণনীয় কবির সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, সে-যুগেও তিনি বিশেষ একজন কবি হিসাবে সাধারণ্যে গৃহীত হয়েছিলেন, এতেই তাঁর কবি-কর্ম ও শিল্প-ধর্মের জয় সূচিত হয়েছে। এতখানি জয় তাঁর সম-সাময়িক অন্য অনেকের হয়নি।

প্রথম বই 'ঝরা পালক' থেকে সুরু করে, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বনলতা সেন' পর্যন্ত, জীবনানন্দের সবগুলি কবিতার বই পরের পর উল্টে গেলে, তাঁর কবি-চেতনার কৈশোর, যৌবন ও পূর্ণ পরিণতি লক্ষ্য করা যাবে ঠিকই এবং তাঁর ভাষা, ভঙ্গী, দৃষ্টি ও জীবন-দর্শন ধীরে ধীরে কি ভাবে ক্রম-বিকশিত হয়েছে, তা-ও বোঝা যাবে ঠিকই, কিন্তু সুরুর ধাপ থেকে শেষের ধাপ পর্যন্ত এসেও, কবি হিসাবে তাঁর আকস্মিক বা অভাবনীয় কোন রূপান্তর চোখে পড়বে না। তাঁর কাব্য-ভুবনের আদি সুর প্রায় সবই পাওয়া যাবে, একেবারে গোড়ার দিকের রচনাগুলিতে, আবার সূচনা কালের গুণপণা এবং অসম্পূর্ণতাগুলো সবই প্রায় অপরিবর্তিত দেখা যাবে সবশেষ পর্যায়ের কবিতাবলীতেও। এই পূর্বাপর একত্বের একটা কারণ অবশ্য, জীবনানন্দের কাব্য-জগৎ ছিল ছোট্ট, সীমাবদ্ধ, যদিও তা রূপ, রস, গন্ধ, গীতে অতুলনীয় একটা জগৎই। আর একটা কারণ, চারিত্র ধর্মে জীবনানন্দ সেই ধরণের সজাগ শিল্পী ছিলেন না, যাঁরা আত্ম-সমালোচনার আঘাতে আপন আদর্শের বেড়া ভেঙে বার বার নব দিগন্তে উত্তীর্ণ হতে পারেন। এ যুগের অনেক প্রখ্যাত ও বিদগ্ধ রূপে প্রচারিত কবি এবং গল্পকারই তা পারেন নি, কাজেই জীবনানন্দকে এ জন্যে একা দায়ী করা সমীচীন হবে না।

সে যাই হক, নিজের নিরূপিত গণ্ডীর মধ্যে জীবনানন্দের মতো পূর্ণাঙ্গ কবি আধুনিকদের ভেতর আর কে ছিলেন? উড়ো পাখীর ঝাঁকের মতো, হঠাৎ গায়ে ঝরে-পড়া একরাশ ফুলের রেণুর মতো, মাঝরাতে বাতাসে ভেসে আসা ষ্টিমারের ভেঁপুর মতো, চলন্ত রেলগাড়ী থেকে দেখা গ্রাম, সহর, মাঠ, নদী, বন, পাহাড়ের দৃশ্যের মতো অজস্র অফুরন্ত ছবির পসরা মেলে ধরেছেন তিনি তাঁর কবিতায়। শাল, সেগুন, মেহগ্নি ও ইউক্যালিপটাসের অন্ধকার অরণ্যে সোনালী পাইথনের কুম্ভ-বেষ্টনে যেখানে ভীরু হরিণ প্রাণ দিচ্ছে, ফসল উঠিয়ে

নিয়ে-যাওয়া ধূসর মাঠের একান্তে যেখানে পড়ে-থাকা খড়ের গাদায় বোকা শালিখ বাসা পেতে ডিম রেখে গেছে, অণ্ডলোভী বেজীর মধ্যাহ্ন ভোজের জন্যে, শিশিরার্দ্র ঘাসের সবুজ ডাঁটায় যেখানে একদিকে ফড়িং বসে বসে অবুঝ উল্লাসে পাখনা নাড়ছে, অন্যদিকে মাকড়সা লূতাজাল ছড়িয়ে ছড়িয়ে কৌশলে তাকে জড়িয়ে ফেলছে, অন্তিম মুহূর্তের অক্টোপাস বন্ধনে, নিঃসঙ্গ নদীতীরের বেতবনে ক্ষুধার্ত চিতা যেখানে গুঁৎ পেতে আছে তৃষাতুর কোন অনাগত শিকারের লোভে…প্রকৃতির সেই জীবন-মৃত্যু অধ্যুষিত বিচিত্র রহস্যপুরীতে নিয়ে গেছেন তিনি 'বন্ধ্যা ও বান্ধবহীন সহরের' বাসিন্দাদের। ট্রয়ের যে আকাশ-ছোঁয়া প্রাচীরে দাঁড়িয়ে হেলেন তার অজস্র স্বর্ণকেশ এলিয়ে দিয়েছিলেন একদিন, কার্থেজের নিঃসঙ্গ প্রাসাদে হাপুস চোখে কেঁদেছিলেন রূপসী ডিডো, মিশরের যে যোজন-বিস্তৃত বালুকার বুকে ফ্যারাও টোটমেস তার রাণী নেফরেতেতির জন্যে বানিয়েছিলেন দম্ভের পিরামিড, সেই প্রাগৈতিহাসিক রোমান্সের গোধূলি-লোকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তিনি আধুনিক কালের বনলতা সেনদের এবং তাঁদের অনুরাগীদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকে।

অবাস্তব, অতি-রোমান্টিক, পলায়নপর, যাই কেন না বলুন এ-সব কবিতাকে, ইজ্‌ম-বিমুক্ত সহজ মন নিয়ে পড়লে, না ভালো লেগেও ত পারে না কারো। এই ভালো লাগাটার সঙ্গেই কাজে লাগার প্রশ্নকেও যুক্ত করা যায় কি না এবং নূতন সাহিত্যিক শ্রেয়-বোধের নিরিখ সেই রকমই হওয়া উচিত কিনা, সে প্রশ্ন ত আছেই এবং তাকে হয়ত অবান্তরও বলা যাবে না। তবু সুর, রং, আর স্বপ্নের দিন দুনিয়া থেকে চলে যায় নি। তাই আজও তথাকথিত রসকে লোকে সন্ধান করে জীবনের সব ক্ষেত্রেই, শিল্পের ক্ষেত্রে ত বটেই। নিছক বুদ্ধির পণ্যে সে-চাহিদা মেটে না। তাই রোমান্টিক কবিতার দিন এখনো আছে, জীবনানন্দ আছেন এবং থাকবেনও তাই, আধুনিক সাহিত্যের এক অধ্যায়ে আপন বৈশিষ্ট্যের গৌরব ও ঔজ্জ্বল্য নিয়ে।

তাঁর কবিতায় চলতে চলতে হঠাৎ পথ হারিয়ে-যাওয়া এবং বুঝতে বুঝতেই হঠাৎ না-বোঝার অন্ধকারে পড়ে যাওয়ার যে-দিকটি নিয়ে একদিন প্রভূত সমালোচনা হয়েছে, আজ আর তা হয় না, হওয়ার সার্থকতাও নেই, কেন না Sur-realistic বা abstract art-এর মতো অবচেতনা-প্রভাবিত কবিতাও খাঁটি জাতের শিল্প কিনা, সে মূলগত তর্কের কোন সমাধান এ পর্যন্ত হয় নি।

তবে আধুনিক কবিতা নামে এক-এক সময় বিরস বাক্যরাশির যে ভগ্নাংশ সমূহ পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়, জীবনানন্দের কবিতা তা কোন কালেই ছিল না। তাতে সুর আছে, ছবি আছে, এ দুইকে অতিক্রম করে জীবনের গভীরকে স্পর্শ করে, এমন সূক্ষ্ম কারুকর্ম, সজীব অনুভূতি ও সুস্থ জীবন-দর্শন আছে। আর এই দর্শনই কবি হিসাবে তাঁকে প্রথম সারিতে স্থান দিয়েছে, যদিও এ কথা স্বীকার্য যে সে-কবি সারা জীবনে অখণ্ড একটি কাব্যই মাত্র রচনা করেছেন, খণ্ড খণ্ড টুকরো-কবিতার মণি-মাণিক্য দিয়ে। জীবনানন্দ চলে গেছেন, তাঁর সে-কাব্য রয়েছে। শুধু আজ রয়েছে তাই নয়, চিরদিনই থাকবে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মাত্র ছে-চল্লিশ বৎসর বয়সে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেহরক্ষা করেছেন। জীবনে সফলতা লাভের পক্ষে এই বয়স নিতান্ত কম, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বয়সেই মাণিক এমন সম্পদ রেখে গেছেন, যা বাংলা সাহিত্যে তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। কাজেই ফলের দিক থেকে বিচার করলে, তাঁর জীবন অবশ্যই অসার্থক হয়নি। তবু তাঁর বন্ধু ও অনুরাগীদের কাছে তাঁর অকাল মৃত্যু প্রকাণ্ড আফশোষের বিষয় হয়েই থাকবে।

পৃথিবীর বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে বাইরণ, শেলী ও কীটস নিতান্ত কম বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। তবু কালজয়ী সাহিত্য-কীর্তি রেখে গেছেন তাঁরা। গ্যেটে, ভিক্তর হুগো, রবীন্দ্রনাথ, ব্রিজেস দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন, যদিও চিরস্মরণীয় হবার মতো সাহিত্য রচনা করেছিলেন তাঁরাও চল্লিশ পূর্ণ হবার আগেই। মাণিকের বয়সে দেহরক্ষা করলেও তাঁরা তাই মুছে যেতেন না মানুষের ইতিহাস থেকে। কিন্তু টলষ্টয়, আনাতোল ফ্রাঁস, র‍ঁলা বা গোর্কী যদি ছে-চল্লিশে গত হতেন, তাহলে চিরকাল থাকার মতো কি সম্পদ রেখে যেতেন তাঁরা?

এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে কবি-প্রতিভার স্ফুরণ হয় অল্প বয়সেই এবং সার্থক কবির স্বাক্ষরও রেখে যেতে পারেন অনেকে যৌবনের অধ্যায়েই। কিন্তু ঔপন্যাসিকের সার্থক স্ফুরণ বয়সের অপেক্ষা রাখে। বলা বাহুল্য, সেটা স্বাভাবিকও। কবিতা জন্মায় জীবন ও জগতের ভাবময় অনুভূতি থেকে। তার আশ্রয় কল্পনা, উপকরণ সুর। কিন্তু উপন্যাস জন্মায় জীবনের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকে, তার ভিত্তি বাস্তবতা। বস্তু-সংসারের স্পষ্ট সত্য রূপটি চেনা এবং আত্ম-নিরপেক্ষ দৃঢ়তায় সেই রূপকে ফোটানো পরিণত মনের কাজ। পৃথিবীর অবিস্মরণীয় উপন্যাস কোনটাই তাই যৌবনের রচনা নয়। মাদাম বোভারী, হিউম্যান কমেডী, ইডিয়ট, ক্রাইম অব সিলভেষ্টার বোনার্ড, ওয়ার এণ্ড পীস, জ্যাঁ ক্রিস্তফ কোনটাই না।

ঠিক এই নিরিখের কাছাকাছি পৌঁছায় এমন কোন উপন্যাস বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে কি-না, তা নিয়ে তর্ক তুলব না। মেনেই নিচ্ছি হয়নি। কিন্তু

বাংলা ভাষার নিরূপিত গণ্ডীর মধ্যেও ভালো উপন্যাস হয়েছে বৈকি। বঙ্কিম-চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উল্লেখ অনাবশ্যক। এ-কালে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক স্মরণীয় উপন্যাস দিয়েছেন, যা নির্ভয়ে চলতি দুনিয়ায় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। পথের পাঁচালী, নাগ্নিনী কন্যা, মহাযুদ্ধের ইতিহাস, উপনয়ন ও পদ্মানদীর মাঝি যদি কোন বিদেশী ভাষায় অনুবাদ হয়, তাহলে বাইরের দুনিয়ায় নিশ্চয় তা অসমাদৃত হবে না। একটা জিনিষ অবশ্য লক্ষণীয় যে এক পথের পাঁচালী ছাড়া এর কোনটাই বৃহৎ রচনা নয় এবং পথের পাঁচালীরও মূল বই অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত-সারটিই (তা-ও বিভূতিভূষণের স্ব-কৃত) বেশী উজ্জ্বল!

এ থেকেই আমার ধারণা যে বহু-বিস্তৃত ঘটনার পটভূমিতে বহু-বিচিত্র জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত আশ্রয় করে, উপন্যাস দাঁড় করানোর মতো মনন-শীলতার প্রসার আমাদের কথা-সাহিত্যিকদের নেই। তাই যেখানেই উপন্যাসে তাঁরা দৈর্ঘ্য এনেছেন, সেখানেই হয় তর্ক-বিতর্ক ও তত্ত্ব-বিচার, নয় নিসর্গ বর্ণনা, নয় পুরাবৃত্তের ভেজাল মিশেল দিয়ে আখ্যায়িকাকে প্রলম্বিত করেছেন। নিছক সাহিত্যিক গুণপণার দিক থেকে দেখলে, এগুলো অনাবশ্যক ত বটেই, অনেক সময় অসার্থকও। তাই বাংলার নিপুণ কথাকার যাঁরা, তাঁরা সবাই হাতে-বহরে ছোট রেখেই উপন্যাসকে রূপ দিয়েছেন। এদিকের আদর্শ রচনা হল রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ এবং শরৎচন্দ্রের বামুনের মেয়ে। এই দুটি বই যদি জোলা বা ফ্লবেয়ার, কিংবা আনাতোল ফ্রাঁস বা টলষ্টয়ের হাতে তৈরি হত, তাহলে এপিক বা মহা-উপন্যাস হত এরাও। এখানেই ওঁদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ।

আমরা খুব বড় করে কিছু গড়তে পারি না, আমাদের নিপুণতা ছোটর মধ্যে। হয়ত বহির্জগতের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ জীবন-বোধ বাড়লে, এ অপূর্ণতা থাকবে না আমাদেরও। তবু সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে যে-সব উপন্যাস হয়েছে, তার দামও যে কম নয়, তা ত আগেই বলেছি। সেই মূল্যবান উপন্যাসমালা বাংলা দেশকে দিয়েছেন যাঁরা, মাণিক তাঁদের মধ্যে প্রধান এক জন এবং মনে রাখবেন, মাণিক সকলের চেয়ে কনিষ্ঠ ছিলেন বয়সে। মাত্র-ত্রিশের কোঠায় তিনি লিখেছিলেন পদ্মানদীর মাঝি। আর দিবা-রাত্রির কাব্য,

পুতুল-নাচের ইতিকথা, শহরতলী, সবই লিখে শেষ করেছিলেন তিনি পঁয়ত্রিশের মধ্যে। এই ক-খানি এবং জননী উপন্যাস ও তিনখানি গল্প সংগ্রহ, প্রাগৈতিহাসিক, মিহি ও মোটা কাহিনী, বৌ, এই তাঁর বিশিষ্ট রচনা।

এত কম বয়সে এমন পূর্ণাঙ্গ ঔপন্যাসিক-প্রতিভার অধিকারী হতে পেরেছিলেন তিনি, এ একটা আশ্চর্য ঘটনা। সলোখব ছাড়া তাঁর মতো তরুণ বয়সী ও শক্তিধর ঔপন্যাসিক এ-যুগে অন্যদেশেও ছিলেন না কেউ। এই জন্যেই দুঃখ হয় যে বাংলা ভাষায় হিউম্যান কমেডী বা ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট বা বভীজ রাপচার পর্যায়ের বই লিখতে পারতেন যিনি, তিনি দীর্ঘ জীবন পেলেন না। কিন্তু দীর্ঘতর জীবন পেলেও আর বেশী স্ফুরণ হত কি তাঁর প্রতিভার? বোধ হয় না, কারণ পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ, এই দশ বছরের রচনায় তাঁর কলমের ধার ক্রমশ ক্ষয়িত হতে দেখেছি। জীবন-বোধের পরিসরও তাঁর আর বাড়েনি। বরং বিকৃতির একটা অন্ধ আবর্তই ঘিরে ধরছিল যেন তাঁর শিল্পী-মন ও দৃষ্টিকে বেশী করে। কেন এটা হল?

এখানেই আসল দুঃখ হয় মাণিকের জন্যে। প্রতিভার সঙ্গেই পৌরুষ ছিল তাঁর, কিন্তু ছিল না সেই আত্ম-প্রীতি, যা থাকলে আপন প্রতিভাকে উন্মার্গে ছুটে যেতে দেয় না মানুষ। নানা বিভ্রান্তি ও বিপাক চার দিক থেকে ঘিরে ধরেছিল তাঁর জীবনকে, দেহের ও মনের স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়েছিল তাঁর তাতেই। এক দিনের উজ্জ্বল প্রাণবান যুবক মাণিককে আর একদিন রোগ ও দারিদ্র্যে জীর্ণ হয়ে তিলে তিলে ক্ষয়িত হতে দেখলাম। দেখলাম তাঁর সাহিত্য-শক্তিও একটু একটু করে অপচিত হতে। এ হতে পারত না, আপন জীবন সম্বন্ধে তিনি আর একটু সজাগ হলে। কিন্তু কেন জানি না মায়াকোভস্কী বা মাণিকদের জীবনে এ সজাগতা আসে না, তাই বহু স্মরণীয় ট্র্যাজেডীর ব্যাপারী এই সব প্রতিভাধরের অনেকের জীবনও বৃহৎ এক-একটা ট্র্যাজেডী হয় শেষ পর্যন্ত। আরো অল্প বয়সে প্রভূত প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন আর একটি প্রতিভাকেও অপচিত হতে দেখেছি, তিনি হলেন কবি সুকুমার সরকার। এই জন্যেই দরকার সফল জীবন-চর্যার, যার আদর্শ হলেন রবীন্দ্রনাথ, রলাঁ ও বার্নার্ড শ।

কিন্তু থাক এ কথা। এ সত্ত্বেও মাণিক যা তাঁর মধ্যপথে-সমাপ্ত জীবনে করে গেলেন, তা অনেক পূর্ণপথ-অতিক্রান্ত সাহিত্যিকও করতে পারেন না। তাই দেহ-বিমুক্ত সাহিত্য-স্রষ্টা রূপে যখন তাঁকে দেখি, তখন এই ভেবে

আনন্দ হয় যে যত দিন না বাংলা ভাষায় আবার একটা রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব হচ্ছে, ততদিন বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র ও মাণিক, এই পঞ্চ প্রতিভার সৃষ্টি সমভাবে উজ্জ্বল থাকবে। যদিও জীবন-যাত্রায় বিভূতিভূষণও পূর্ণপথ পাড়ি দিতে পারেন নি, তবু তিনি পঞ্চাশোত্তীর্ণ হয়েছিলেন। মাণিকের সে সুযোগও হল না। তাই বিভূতি-ভূষণের জন্যে ব্যথা বোধ করি, কিন্তু মাণিকের অভাবে সান্ত্বনা পাই না।

মাণিকের লেখাগুলো আবার পড়ছিলাম। পদ্মানদীর মাঝিই তাঁর সব চেয়ে নাম-করা বই। নাম হবার মতোই তা। যদিও ওতে পদ্মানদী আছে, নেই তার মাঝি, মাঝির ছদ্মবেশে কথা কয়েছে ভদ্র মধ্যবিত্তের মন, তবু কি নিখুঁত তার গল্পের গাঁথুনি, আর চরিত্রের রূপায়ন। দিবা-রাত্রির কাব্য এবং পুতুল-নাচের ইতিকথাও তাঁর বিখ্যাত বই। দুটোই সঙ্কেত-ধর্মী রচনা এবং গভীরতর ও নিপুণতর রচনা। বিশেষত পুতুল-নাচের ইতিকথা, যা বাংলা ভাষায় অতুলনীয়। সহরতলী থেকে তাঁর লেখায় এসেছে উদ্দেশ্যবাদ এবং বঞ্চিত নিগৃহীত মানুষ সম্বন্ধে সেই বেদনা-বোধ, যা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল রাজনীতির রাজ্যে। কিন্তু শিল্প-সমৃদ্ধির পুঁজিতে ভাঙন দেখি তাঁর এখান থেকেই। তারপরের কথা এখন নয়।

আজ মাণিক নেই। ঠিক একই বৎসরে জন্ম আমারও, সাহিত্য-সেবাও সুরু করেছিলাম দু-জনে একই সময়ে। উভয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী মানুষ হলেও, গভীর একটি হৃদ্যতা ছিল তাই আমাদের দু-জনের মধ্যে। কালে-ভদ্রে দেখা হত, কিন্তু অদর্শনে অন্তরঙ্গতার ব্যতিক্রম হয়নি। সব শেষ চিঠি লিখেছিলেন তিনি মৃত্যুর সাত-আট মাস আগে। তাতে অন্যান্য কথার মধ্যে একটা কথা ছিল, যা আজ থেকে থেকে খচ খচ করে ফুটছে মনের ভেতর: 'অভাব, কষ্ট, অসুখ, গ্রাহ্য করি না। শুধু বাঁচার জন্যে বাঁচতেও চাই না। কিছু করার মতো কাজ করতে চাই, আর বাঁচতেও চাই সেই জন্যেই'।

ভাবছি করার মতো কাজ ত করে গেছেন তিনি অনেকই, কিন্তু বাঁচার জন্যে বাঁচতে ইচ্ছা করলেন না কেন? সে কি উল্কার মতো জ্বলতে জ্বলতে নিজেকে ক্ষয় করে ফেলার নেশায়, কিংবা এমন একটা অনাবিষ্কৃত দিক ছিল তাঁর জীবন ও মনের, যা তাঁকে নিয়তির মতোই নিয়ে গেছে চালিয়ে? জানি না এ প্রশ্নের কি উত্তর।